মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ঃ জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা

মোঃ সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী

449931

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ঃ জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা

এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
449931

449931

গবেষক

মোঃ সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ১০৩
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো: আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম. ফিল. গবেষক মোঃ সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য পেশকৃত **"মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ঃ জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমাদের জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে বা এ বিষয়ে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখিত হয়নি। আমরা এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

০৫/১০/২০১১

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

5-10-2011

ড. মো: আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449931

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহঃ) ঃ জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা"** শীর্ষক গবেষণা অভিন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এই অভিন্দর্ভের বিষয়বস্তুর পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও আমি প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোথাও ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

মোঃ সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী

০৫.১০.২০১১

(মোঃ সেলিম-উল ইসলাম সিদ্দিকী)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ১০৩
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। দরুদ ও সালাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি যিনি আল্লাহর প্রিয় হাবীব এবং আমাদের নাজাতের অসিলা। স্মরণ করছি তাঁদেরকে যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে বিচরণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আরো স্মরণ করছি তাঁদেরকে যাঁরা সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করে মানুষের দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

এ গবেষণা কর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য শিক্ষক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারকে বিশেষ শ্রদ্ধা আর কৃতৃজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। অত্র অভিন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ যাঁর আন্তরিকতা, ভালবাসা আর প্রেরণার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় এ অভিসন্দর্ভকে সম্ভব করে তুলেছে। সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি একই বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক মহোদয় সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারকে যিনি শুরু হতেই মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে চির ঋণী করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও বিভাগের মান্যবর শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলকে।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহঃ) এর বড় সাহেবজাদা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, অন্যতম মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষক ড. মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবকে, যিনি আমার প্রতিটি কর্ম ও গবেষণার অনুপ্রেরণা, কর্মব্যস্ততার হাজারো ভীড়ে যিনি আমার গবেষণা পত্রের খোঁজ নিয়েছেন, দিয়েছেন উপযুক্ত ও মূল্যবান তথ্য, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সময়োপযোগী পরামর্শ। এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরঋণী, চির কৃতজ্ঞ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহঃ) এর সহধর্মিনী মোসাঃ নুরুন নাহার সিদ্দিকা এর প্রতি। যিনি অসুস্থতার মাঝেও মাওলানার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য, তাঁর ব্যবহৃত পুস্তক এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মিকদাদ সিদ্দিকীর প্রতি। যিনি তার কর্মব্যস্ততার মাঝেও তাঁর প্রিয় দাদু সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়ে অভিসন্দর্ভটি

Dhaka University Institutional Repository

নিখুঁত করেছেন। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর পরিবারের সম্মানিত সদস্যর্বগের। যারা প্রত্যেকেই নিজ ক্ষেত্র থেকে আমাকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। বিশেষ করে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মানিত প্রভাষক মুনিরা সুলতানাকে, যিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতামহের অনেক অজানা তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। স্মরণ করছি মোঃ আশরাফ হোসেন, জেলা ও দায়রা জজ, নোয়াখালী -কে যিনি এ দুঃসাধ্য সাধনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের প্রতি, যাঁর দু'আ আমার কর্মজীবনের উৎসাহ, উদ্দীপনা স্বরূপ। আরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রিয়াজুল হক ভাই এর প্রতি, যিনি প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ রিদওয়ান ফিরদাউস, যিনি এ কাজের জন্য নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন এবং অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে অভিসন্দর্ভটির পূর্ণতা দিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও মুবারকবাদ।

আন্তরিকতার সাথে ও অক্লান্ত শ্রম ব্যয় করে, রাতের ঘুমকে উপেক্ষা করে, দিবসের ব্যস্ততা ফেলে রেখে অতি অল্প সময়ে এই অভিন্দর্ভটিকে নিখুঁত, ঝকঝকে কম্পিউটার কম্পোজ করার কৃতিত্বের জন্য আমি মোঃ রেজা-ই-রাব্বি ভাই এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে আমি বিভিন্ন লাইব্রেরী, প্রতিষ্ঠান ও সম্মানিত বহু পরিচিত-অপরিচিত গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হতে সহায়তা গ্রহণ করেছি; তাদের প্রতি রইল আন্ত রিক মোবারকবাদ।

পরিশেষে আমার সুহৃদ, শুভাকাংখী ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন যারা অপরিসীম ত্যাগ ও অনুপ্রেরণায় এ গবেষণাকর্মটি ত্বরান্বিত করতে সাহস যুগিয়েছেন, তাদের সবাইকে প্রাণ উজাড় করা শ্রদ্ধা। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার সহধর্মিনী নাজনীন সিদ্দিকার প্রতি যিনি বিভিন্নভাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়ে কাজের গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। অবশেষে মহান আল্লাহর নিকট সকলের উত্তম প্রতিদানের আরয রেখে এবং অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এ অভিসন্দর্ভটি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্যতার ফরিয়াদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ ওয়ালিয়্যুত তাওফীক। আমীন!

- গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

সংকেত	বিবরণ
অনু.	অনুবাদ
খ্রি.	খ্রিস্টীয় সন
হি.	হিজরী সন
আ.	আলাইহিস্ সালাম
র./ রহ.	রাহ্মাতুল্লাহি 'আলায়হি
রা.	রাদিয়াল্লাহু আন্হু
সা.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মৃ.	মৃত/মৃত্যু
জ.	জন্ম
ইং	ইংরেজী
পৃ.	পৃষ্ঠা
খ.	খণ্ড
সং	সংস্করণ
খৃ. পূ.	খৃষ্টপূর্ব
তা. বি.	তারিখ বিহীন
ড.	ডক্টর
ডা.	ডাক্তার
দ্র.	দ্রষ্টব্য
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক/ সম্পাদিত
বাং	বাংলা
Ed.	Edited by
OP. Cit.	Opere Citato
P.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Volume
Pub.	Publisher / Publication

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন সমস্যাটি বহু প্রাচীন। সমস্যাটি এ যাবতকাল কোন সুপরিকল্পিত ও সার্বজনীনভাবে সমাধানের মুখ এখনো দেখেনি। আশা করা যায়, অচিরেই বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ পণ্ডিতদের স্বার্থক পদক্ষেপে এর সমাধানের সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করবে। তবে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গবেষকগণ আরবী বর্ণমালার বৈচিত্রময় উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যিনি যেটাকে যথাপোযুক্ত মনে করেছেন তিনি তার গবেষণাকর্মে সে নিয়ম অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছি। তবে বহুল প্রচলিত আরবী বা উর্দূ শব্দসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে ·

ا -	অ	ط -	ত	ـِــ	ি	يَا -	ইয়া
ب -	ব	ظ -	য	ـُــ	ু	يِ -	য়ি
ت -	ত	ع -	'	ـَـا	া	يِىْ -	য়ী
ث -	ছ	غ -	গ	ـَـوْ	ৌ	يُ -	ইয়ু
ج -	জ	ف -	ফ	ـَـىْ	ৈ	يُوْ -	ইউ
ح -	হ	ق -	ক	ـًا	আ	عَ -	'আ
خ -	খ	ك -	ক	ــا	আ	عَا -	'আ
د -	দ	ل -	ল	ـِـاىْ	ঈ	عِ -	'ই
ذ -	য	م -	ম	ـُـا	উ	عِىْ -	'ঈ
ر -	র	ن -	ন	ـُـاى	উ	عُ -	'উ
ز -	য	و -	ও	وَ -	ওয়া	عُوْ -	'উ
س -	স	ه -	হ	وِىْ -	বী,ভী		
ش -	শ	ء -	'	وُ -	উ		
ص -	স	ى -	য়	وُوْ -	উ		
ض -	দ	ـًــ	--া	يَ -	ইয়া		

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র iii

ঘোষণাপত্র iv

কৃতজ্ঞতা স্বীকার v

সংকেত বিবরণী vii

প্রতিবর্ণনায়ন viii

সূচীপত্র ix

ভূমিকা ১-৪

প্রথম অধ্যায় : **বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও বিকাশ ধারা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা** ৫-২৫

- ভারতবর্ষে ইসলাম ◈ উপমহাদেশে রাজ শক্তিরূপে ইসলাম ◈ বাংলাদেশ পরিচিতি ◈ বাংলাদেশে ইসলাম ◈ প্রাচীন ধর্মপ্রচারকগণ ◈ আলিম, মুজাহিদ সূফীয়া-ই কিরামের ইসলাম প্রচার, ◈ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায় ◈ বাংলার রাজশক্তি রূপে ইসলাম
- মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ও সমকালীন বাংলাদেশ (১৯৩৩-২০০০)
- ধর্মীয় অবস্থা ২০
- শিক্ষা ব্যবস্থা ২১
- সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ২২

দ্বিতীয় অধ্যায় : **মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম** ২৬-৪৫

- মানিকগঞ্জ জেলা : পরিচিতি ও ইতিহাস ২৭
- মানিকগঞ্জ জেলার নামকরণ ২৮
- মহকুমা ঘোষণা ৩০
- জেলা ঘোষণা ৩১
- মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম ও ইসলাম প্রচারে কতিপয় মনীষী ৩৯-৪৫

  ◈ মীর শাহ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী (রহ.) ◈ হযরত গাজীউল মুলক ইকরাম ইব্রাহিম বোগদাদী শাহ (রহ.) ◈ হযরত শাহ রুস্তম ◈ হযরত দানেস্ত শাহ (রহ.) ◈ হযরত হায়দার শেখ (রহ.) ◈ সৈয়দ সুলায়মান বুখারী (রহ.) ◈ হযরত শাহ মুখদম রুপস (রহ.) ◈ সৈয়দ এনায়েত শাহ (রহ.) ◈ হযরত রসূল শাহ (রহ.) ◈ হযরত শাহ সৈয়দ মতিউল্লাহ (রহ.) ◈ শাহ আব্দুল গণি (রহ.) ◈ শাহ্ আব্দুর রহমান (লাল মিয়া) ◈ হযরত শাহ খলিলুর রহমান ◈ শাহ সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ হোসেন ◈ হযরত শাহ্ সৈয়দ মফিজউদ্দিন আহমেদ (রহ.) ◈ খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন খান ◈ হযরত মাওঃ মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)

তৃতীয় অধ্যায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর জীবন দর্শন** ৪৬-৭২

- বংশ পরিচয় ৪৭
- জন্ম ও শৈশব ৪৯
- প্রাথমিক শিক্ষা ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

- উচ্চ শিক্ষা ৫০
- বৈবাহিক জীবন ৫১
- কর্মজীবন ৫২
- মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর ঘটনাবহুল ও কীর্তিমান জীবনের কয়েকটি পরিচিতি ৫২
- স্বর্ণপদক প্রাপ্তি ৫৫
- হজ্জব্রত পালন ৫৫
- ইন্তিকাল ৫৬
- মাওলানা সাহেবের (রহ.) দাফন ৫৬
- ব্যক্তিজীবনে মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ৫৮
- সমাজসেবা ৬২
- জীবন দর্শন ৬২
- ইসলাম ও তাসাউফ অনুপ্রেরণা ৬২
- বস্তুবাদ ও ভাববাদ প্রসঙ্গ ৬৬
- রাজনীতি ভাবনা ৭১

চতুর্থ অধ্যায় : ইসলাম ও তাসাউফ ৭৩-৯৭

- ইসলাম পরিচিতি ৭৪
- তাসাউফ পরিচিতি ৮০
- তাসাউফের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ৮৩
- 'সূফী' ও তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণ ৮৪
- বড়পীর সাহেব (রহ.) কর্তৃক তাসাউফ শব্দটি বিশ্লেষণ ৮৭
- তাসাউফের উৎপত্তি ও সত্য হওয়ার দলিল ৮৭
- তাসাউফের স্বরূপ ও পরিধি ৯২

পঞ্চম অধ্যায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর তাসাউফ চর্চা ৯৮-১৩৬

- তাসাউফের উৎস ও সারকথা ৯৯
- মাওলানা সিদ্দিকী (রহ.)-এর আর্বিভাবের পূর্বাভাস ১০২
- শিশুকালের একটি অলৌকিক ঘটনা এবং পিতার দু'আ ও ভবিষ্যদ্বাণী ১০২
- মাওলানা সাহেবের কিশোর বয়সের একটি অলৌকিক ঘটনা ১০২
- যুবক বয়সে মাওলানা সাহেবের একটি একটি অলৌকিক ঘটনা ১০৩
- 'ইল্‌ম তাসাউফের বুৎপত্তি অর্জন ১০৪
- মাওলানা সাহেবের তাসাউফ চর্চার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্বীকৃতি ১০৫
- প্রখ্যাত সূফী হিসেবে আবির্ভাব ও দরবার প্রতিষ্ঠা ১১৪
- উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে অবদান ১১৪
- শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হককে স্বীয় পীরের নিকট বায়'আত (মুরিদ) করা ১১৬
- তাসাউফ গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

- গ্রন্থ সম্পর্কিত একটি মজার ঘটনা ১১৮
- মাওলানা সাহেব (রহ.) সর্বশেষ তাসাউফের বয়ান ১১৯
- মাওলানা সাহেবের (রহ.) খিলাফত (সনদ) প্রদান ১২৩
- মাওলানা সাহেব (রহ.)-এর চিশতিয়ায়ে সাবিরিয়া তরীক্বার শাজারা শরীফ ..১২৫
- তাসাউফ চর্চায় মাওলানা সাহেব (রহ.)-এর পূর্ববর্তীগণের মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন বিখ্যাত সূফী সাধকের পরিচয় ১২৭
- আধ্যাত্মিক সাধনায় জ্বিনদের উপস্থিতি ১৩৫
- 'ইল্‌ম মা'রিফাত সম্পর্কে তাঁর কিছু অমূল্য বাণী ১৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামত ১৩৭-১৪৯**

- শূন্যে নামায আদায় ◈ পানির উপর নামায আদায় ও আসমানী নূর ◈ মুরিদকে শুন্যে ভাসিয়ে নিয়ে আসা, ◈ আল্লাহর কুতুবের আঙ্গুলের শক্তি ◈ আম গাছ কথা শোনলো ◈ মৌমাছি কথা শোনলো ◈ বড়ই গাছ কথা শোনলো
- মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর 'ইলমে কাশ্‌ফ ...১৪২
- মহান আল্লাহর অসীম দয়ায় মাওলানা (রহ.) এর উছিলায় বিপদ হতে মুক্তিলাভ
- হিদায়েতের পথে আহবান ১৪৫
- দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ১৪৫
- রাসূল (স.) এর খাটি প্রেমিক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ১৪৬

সপ্তম অধ্যায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) কর্তৃক লিখিত গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা ১৫০-১৯৯**

- বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা ১৫২
- তারানায়ে জান্নাত ১৫৫
- মহাস্বপ্ন ১৫৮
- জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব ১৭১
- মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব ১৭৪
- ধূম পিপাসা সর্বনাশা ১৭৯
- মহা ভাবনা ১৮২
- পীর ধরা অকাট্য দলিল ১৯৫

উপসংহার ২০০-২০২

গ্রন্থপঞ্জী ২০৩-২০৮

পরিশিষ্ট ২০৯-২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পরম করুণাময় অসীম দয়ালূ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য সকল প্রশংসা নির্ধারিত ও নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) এর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম। বিশ্বনবী (স.) এর আশিক সাহাবীবৃন্দের (রা:) উপর বর্ষিত হোক অশেষ শান্তি ও রহমত।

"মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ঃ জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা" শীর্ষক গবেষণাটি আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার এক অনন্য সাধারণ প্রশ্নের উত্তর। কেননা আধুনিক যুগে বিজ্ঞান যেখানে মহাকাশের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে সে একই স্থানে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বে সূফীবাদের নামে যে প্রতারণার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তারই সঠিক উত্তর এবং সূফীবাদের পক্ষে বলিষ্ঠ যুগোপযোগী নমুনা প্রদর্শনই হল অত্র অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) তাঁর বর্ণিল কর্মময় জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে আধুনিক বিজ্ঞান ও মহা শান্তির ধর্ম ইসলামের পরশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া জীবনে তীব্র গতি ও চমৎকার ছন্দের সূচনা করেছেন তিনি তাঁর দর্শন ও তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে তিনি অবিশ্বাসী জ্ঞানান্ধদের প্রতি বিজ্ঞানের যুক্তি তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে। পাশাপাশি ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্বকে আত্মস্থ করে তাসাউফকে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্রষ্টাকে প্রাপ্তির অব্যর্থ মাধ্যম হিসেবে। সুতরাং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে তাঁর বর্ণিল জীবনের দর্শন ও তাসাউফ চর্চা সুশিক্ষিত জ্ঞানী মহলকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে। তাই তাঁর জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চার সুক্ষ্ম চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে জ্ঞান পিপাসু মানুষের প্রাণের দাবী।

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) তাঁর দর্শনকে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে; তিনি কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন- জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শন (Philosophy), দেহ বিজ্ঞান (Physiology), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), গণিত (Mathmatics) ইত্যাদির আলোকে আলোচনা করে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব, তাঁর ক্ষমতার ব্যাপ্তি প্রমাণ করেছেন। পাশাপাশি যারা পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস করে না, যারা বিশ্বাস করে মানুষ মরে গেলে পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে তাদের পুনরুত্থান সম্ভব নয়, বিচার হওয়াতো মরুভূমির মরিচিকাতুল্য-তাদের এহেন বিশ্বাস ধ্যান-ধারণা ভুল প্রমাণ করেছেন নিখাঁদ বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ে। আল-কুরআন ও আল-হাসীসের বাণীকে মূল ধরে বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখাকে গবেষণার উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন- আল্লাহ সত্য, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রিসালাত সত্য, কবর ও কবরের আযাব সত্য, পুনরুত্থান দিবস সত্য ও বিচার দিবস সত্য।

Dhaka University Institutional Repository

'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে মানুষের সাথে সকল সৃষ্টির স্রষ্টার নিবিড় সম্পর্ক নির্ণয় করে দেখিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর ইবাদত দাসত্ব স্বীকার না করার বিষয়টি তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন হতে কত নিচে নামিয়ে দেয়। তাই তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের এ যুগে ইসলামী চিন্তাবিদ ও অন্যতম মুসলিম দার্শনিক এর স্থান দখল করেছেন। যার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, নাস্তিক্যবাদের মূলে জ্ঞান দিয়ে আঘাত করে তিনি সময়োপযোগী যে গবেষণা ও আধ্যাত্মবাদের পানে ধাবিত হয়েছেন, তা তাকে বিশ্বের বুকে করেছে চিরস্মরণীয় ও উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান।

পাশাপাশি তিনি বাস্তবজীবনে ইসলামের প্রতিটি নিয়মনীতির বাস্তব অনুসরণ করে ইসলামী জীন্দেগীর জন্য এক অনুসরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। সূধী সমাজে তিনি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করতেন, 'জানার নাম ইসলাম নয়, মানার নাম হল ইসলাম'। যা ইসলামী নিয়মনীতি অনুসরণের বিশাল তাকিদ বহন করে এবং এটাও প্রমাণ করে যে, শুধু জ্ঞান অর্জন ও বহু জ্ঞানের পাণ্ডিত্য অর্জন করায় মানব জীবনের সফলতা নয়, বরং মানব জীবনের পরম সফলতা-সার্থকতা লুকিয়ে আছে সৃষ্টি হিসেবে নিজ স্রষ্টাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও উপলব্ধি করার মাধ্যমে।

মুসলিম সমাজের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে তিনি এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন যে, ইসলাম হল পরম শান্তি। আধুনিক সমাজব্যবস্থার ভয়ানক দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলামকেন্দ্রিক হওয়া একান্ত কর্তব্য। এক্ষেত্রে তিনি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

সুতরাং একথা বলতে আজ বাধা নেই যে, মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) যেরূপ জ্ঞানের গবেষণা ও ইসলামী নীতির আনুগত্য করেছেন, তার ফল স্বরূপ তিনি হয়েছেন বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের মহান ব্যক্তিদের ঝাণ্ডাবাহী মহান পুরুষ।

একজন গবেষক হিসেবে এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, তাঁর জীবন দর্শন ও কর্ম মুসলমানদের মুক্তির পথ প্রদর্শনকারী। তিনি কালজয়ী মহান সাধক পুরুষ। তাঁর কর্মজীবন, চিন্তা-দর্শন ও তাসাউফ চর্চার উপর এ অভিসন্দর্ভটিতে ব্যাখ্যা, তথ্য ও যুক্তি নির্ভর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছেন।

গবেষণাকর্মটি সুন্দর ও পাঠকদৃষ্টি বিবেচনা করে আলোচনাসমূহকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে **বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও বিকাশধারা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা** শিরোনামে ভারতবর্ষে ইসলাম, উপমহাদেশে রাজ শক্তিরূপে ইসলাম, বাংলাদেশ পরিচিতি, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাচীন ধর্মপ্রচারকগণ তথা আলিম, মুজাহিদ সূফীয়া-ই কিরামের ইসলাম প্রচার, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়, বাংলার রাজশক্তি রূপে ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম ছিদ্দিকী (রহ.) ও সমকালীন বাংলাদেশের ধর্মীয় ও শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে- **মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম**। এখানে মানিকগঞ্জ জেলার পরিচিতি ও ইতিহাস, মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম ও ইসলাম প্রচারে কতিপয় মনীষীর জীবন ও অবদান সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে **মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর জীবন দর্শন** সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এখানে তাঁর বংশ পরিচয়, জন্ম ও শৈশব, শিক্ষা জীবন, কর্ম জীবন ও ইন্তেকাল ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ব্যক্তি জীবনে মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় **ইসলাম ও তাসাউফ** শীর্ষক শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে ইসলাম ও তাসাউফ সম্পর্কিত বিষদ বর্ণনা তুলে ধরতে গিয়ে ইসলাম পরিচিতি, তাসাউফ পরিচিতি, তাসাউফের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য, 'সূফী' ও তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণ, বড়পীর সাহেব (রহ.) কর্তৃক তাসাউফ শব্দটি বিশ্লেষণ, তাসাউফের উৎপত্তি ও সত্য হওয়ার দলিল এবং তাসাউফের স্বরূপ ও পরিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে **মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর তাসাউফ চর্চা** সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মাওলানার চিন্তাধারায় তাসাউফের উৎস ও সারকথা, মাওলানা সিদ্দিকী (রহ.)-এর আর্বিভাবের পূর্বাভাস ও এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা, 'ইল্‌ম তাসাউফের বুৎপত্তি অর্জন, মাওলানা সাহেবের তাসাউফ চর্চার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্বীকৃতি, প্রখ্যাত সূফী হিসেবে আবির্ভাব ও দরবার প্রতিষ্ঠা, তা'লিমে যিক্‌র (মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ) প্রতিষ্ঠা, উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান, তাসাউফ জ্ঞানে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা, মাওলানা সাহেব (রহ.) সর্বশেষ তাসাউফের বয়ান, মাওলানা সাহেবের (রহ.) খিলাফত (সনদ) প্রদান, মাওলানা সাহেব (রহ.)-এর চিশতিয়ায়ে সাবিরিয়া তরীক্বার শাজারা শরীফ, তাসাউফ চর্চায় মাওলানা সাহেব (রহ.)-এর পূর্ববর্তীগণের মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন বিখ্যাত সূফী সাধকের পরিচয় এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় জ্বিনদের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। সাথে সাথে 'ইল্‌ম মা'রিফাত সম্পর্কে তাঁর কিছু অমূল্য বাণীও উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে- **মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামত** এখানে তাঁর বেশ কিছু কারামত উল্লেখ করে মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর 'ইলমে কাশ্‌ফ, মহান আল্লাহর অসীম দয়ায় মাওলানা (রহ.) এর উছিলায় বিপদ হতে মুক্তিলাভ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা এবং তাঁর হিদায়েতের পথে আহবান এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ও রাসূল (স.) এর খাটি প্রেমিক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়ে **মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) কর্তৃক লিখিত গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা** শিরোনামে তাঁর ৮টি বিখ্যাত কিতাব- বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা, তারানায়ে

Dhaka University Institutional Repository

জান্নাত, মহাস্বপ্ন, জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব, মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব, ধূম পিপাসা সর্বনাশা, মহা ভাবনা এবং পীর ধরার অকাট্য দলিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা শেষে অভিসন্দর্ভে একটি উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে এবং সবশেষে পরিশিষ্ট শিরোনামে মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর সংশ্লিষ্ট দুর্লভ কিছু ছবি, তাঁর লিখিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ, তাঁর নিজ হাতে লেখা কিছু পৃষ্ঠা, তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহার্য আসবাবপত্র, হাফেজ্জী হুজুর কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠি, প্রাপ্ত পদক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও মসজিদের ছবি এবং তাঁর মাজার শরীফের ছবি ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে।

'মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ঃ জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভে ভাষার দুর্বোধ্যতা পরিহার করার সাথে সাথে চলিতরীতি ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে শিক্ষাবিদ, গবেষক ছাড়াও সাধারণ পাঠক মহল অনায়াসে তা থেকে সম্যক ধারনা লাভ করতে পারেন।

গবেষক মাত্রই জানেন যে, অভিসন্দর্ভে বক্তব্যের পুণরাবৃত্তি দূষণীয়। আমিও অত্যন্ত সচেতনভাবে এ বিষয়টি পরিহার করার চেষ্টা করেছি। তারপরও আলোচনার ধারাবাহিকতা ও অপরিহার্য প্রাসঙ্গিক হিসেবে দু' এক স্থানে পুণরাবৃত্তি হতে পারে।

পরিশেষে মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর পরকালীন মুক্তি ও শান্তি কামনা করছি এবং সেই সাথে মনে এ আশাও পোষণ করছি, এই অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে তাঁর জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বীন-দরদী মুসলিমগণ ইসলামের পথে অগ্রসর হলে আমার সকল শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে দ্বীন ইসলামের পথে কবুল করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও বিকাশধারা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও বিকাশধারা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও বিকাশধারা বিষয়ক আলোচনার পূর্বে ভারতবর্ষে ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন। কেননা, তৎকালীন সময়ে ভূখণ্ডটি ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত ছিল: এটা ঐতিহাসিক সত্য।

ভারতবর্ষে ইসলাম

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ভারতবর্ষে রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায়ই ইসলামের বাণী এসে পৌঁছেছিল। সপ্তম শতাব্দির প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচারিত হয়। শায়খ সায়নুদ্দিন তাঁর 'তুহফাতুল মুজাহিদীন ফী-বাযে আহওয়ালিল বারতাকালীন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ভারতের মালাবার রাজ্যের রাজা চেরুমল পারুমল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে মক্কা গমন করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সময় মালাবারে বহু পৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট উপমহাদেশের জনৈক শাসক কিছু কৃষি দ্রব্য উপহার পাঠিয়েছিলেন বলে একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসটির বক্তব্য এরূপ-

"Sarbatak, king of kunj (India) sent a earthenware full of Ginger to Hazrat Muhammad (Sm.), the prophet (Peace be upon him) as presents according to naration by Abu Sayeed Khudri (R.). It is also reported that Hazrat Muhammad (Sm), the Prophet (Peace be upon him) sent Hudhye Usama and Sohayb to the king inviting him to accept Islam. He had embraced Islam. Sarbatak also said, I saw the prophet's face. First in Macca and then in Medina. He was very handsome faced and middle sized man."[১]

যেমন জলপথে তেমনি স্থলপথেও ভারতবর্ষে অনেক ইসলাম প্রচারকের আগমন হয়। স্থলপথে সাধারণত আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর আমলে হিজরী ১৫ সালের মধ্যভাগ থেকে প্রথমে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহইয়া বালাযুরী (র.) তাঁর 'ফুতুহুল বুলদান' গ্রন্থে সিন্ধু

---

১. Md. Nurul Hoque, *Arab Relationship with Bangladesh*, (M.Phil, Dessertation D.U. 1980, MSS) P.54

Dhaka University Institutional Repository

অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ওসমান ইবন আবুল আবী সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীর সাকাফী, হারীস ইবন মুররা আবাদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধু সীমান্তে অভিযানে আসেন এবং বিভিন্ন এলাকা দখল করেন।

বালাজুরীর মতে, হিজরী ৩৮ সনের শেষ ও ৩৯ সনের শুরুতে আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর অনুমতিক্রমে হারীছ ইবন মুররা আল আবদী উক্ত এলাকায় (সিন্ধুর সীমান্তবর্তী এলাকা) অভিযান চালান। তিনি এটা করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে। তিনি এ অভিযানে জল লাভ করেন। ... তারপর 'কীকান' নামক স্থানে তিনি সদলবলে শহীদ হন। তাঁর মাত্র কয়েকজন সঙ্গী প্রাণে রক্ষা পায়। এটা হিজরী ৪২ সনের কথা। 'কীকান' হচ্ছে খুরাসানের সংলগ্ন সিন্ধুর অন্তর্গত একটি স্থানের নাম।[২]

৪৪ হিজরীতে আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসন আমলে সেনাপতি মুহাল্লাব আবূ সুফুরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী 'বান্না' ও 'আহওয়াজ' নামক স্থানে পৌঁছেন। মুহাল্লাবের পর আবদুল্লাহ ইবন সাওয়ার, রাশিদ ইবন আমর জাদীলী, সিনান ইবন সালমাহ, আব্বাস ইবন যিয়াদ ও মুনযির ইবন জারুদ- 'আবদী কয়েকবার হিন্দুস্থান সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন। তারা কোথাও জয় লাভ করেন। আবার কোথাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।

এসব মহান ত্যাগী পুরুষদের অভিযান কোন কোন স্থানে ব্যর্থ হলেও আরেকদল ধর্মপ্রচারক শুধু তাদের মোহনীয় ব্যবহার ও ইসলামের মর্মবাণীর বদৌলতে সিন্ধু এলাকা ও ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে এদেশে আসেন নি। তাঁরা এসেছিলেন কেবল সত্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

"এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়, প্রাথমিক যুগের এ সকল ইসলাম প্রচারক উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সহজ সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাদের প্রচার কার্যের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই ধর্মভেদ জর্জরিত এদেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনসমাজের সম্মুখে এক নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে বিভিন্ন দিকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে এক নীরব সমাজ ও স্বীকৃত বিপ্লবের পরিবেশ গড়ে উঠে।"[৩]

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত আরব বণিকরাও ধর্মপ্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। কেউ এদেশে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে মুসলিম সমাজ গড়ে তুলেন। এসব মহান পুরুষদের হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রচারের পিছনে মূল চালিকা শক্তি ছিল রাসূল (র.)-এর হাদীস। সাহাবী হযরত সাওবান (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, "আমার উম্মতের মধ্যে দুটি সেনাদলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের

---

২. আল্লামা আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বালাযুরী (র.), *ফুতূহুল বুলদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ৪৪৩-৪৪৪

৩. হাসান জামাল, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ১৯৬৭, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

আগুন থেকে নিস্কৃতি দিবেন। তার মধ্যে একটি হল হিন্দ অভিযানকারী সেনাদল। আর অপরটি হল হযরত মারয়ায তনয় ঈসা (আ.)-এর সহযোগী সেনাদল"।[৪]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা,) হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীস শরীফে রয়েছে, তিনি বলেন, "রাসূল (স.) আমাদের হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। সে সময় যদি আমি জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আমি আমার ধন-সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না। সেখানে আমি নিহত হলে শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাব, আর যদি আমি মঙ্গল মত ফিরে আসি তাহলেও আমি হব জাহান্নাম হতে মুক্ত"।[৫]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এভাবে মুসলিমদের ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ করায় সাময়িক ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের অভিযান প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি নিরলসভাবে সূফী সাধক ওলীগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

উপমহাদেশে রাজ শক্তিরূপে ইসলাম

সপ্তম শতাব্দীতে সিন্ধুর রাজা ছিলেন সহিরস। তার রাজধানী ছিল আলোর নগর। উক্ত রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল ঐতিহাসিক 'দেবল'। সিন্ধু রাজ্য চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তা হল ব্রাহ্মণাবদ, সিস্তান, ইস্কান্দা ও মুলতান। রাজা সহিরস পারস্য রাজ্যের সাথে যুদ্ধ নিহত হলে তাঁর পুত্র সইসি সিংহাসনে বসেন। তার মৃত্যুর পর চাচ নামক জনৈক প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করেন। চাচের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে আত্মকলহ শুরু হয়। উক্ত আত্মকলহে তার পুত্র দাহির সিংহাসন দখল করেন।

৭১০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াকূব দ্বীপের (বর্তমান শ্রীলংকা) রাজা কর্তৃক হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইবন হাকাম ইবন আবূ আলী ছাকাফী বরাবর বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান। সাথে ছিল সেখানে নিহত আরববণিকদের স্ত্রী কন্যা ও আত্মীয় পরিজন। তৎকালীন ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ রাজা দাহিরের কাছে লুট হওয়া পরিবার পরিজন দস্যুদের হাত হতে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। সিন্ধু রাজা দাহির অক্ষমতা প্রকাশ করলে তিনি নিজেই পদক্ষেপ নেন। এ সিন্ধু অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ এ কারণ ঐহিতাসিক বালাযূরী (রহ.) তার 'ফুতূহুল বুলদান' গ্রন্থে চমৎকার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন।

তৎকালীন উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবন আব্দুল মালিক এর সম্মতিতে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ৭১০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে যথাক্রমে সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ইবন

---

৪. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শুআইব আন-নাসায়ী, *সুনানু নাসাঈ*, কিতুবুল জিহাদ; *মুসনাদ-ই- আহমদ*; সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীস অধ্যায়।

৫. ইমান নাসায়ী, *সুনানু নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ

Dhaka University Institutional Repository

নাবাহান ও পরে বুদায়ল ইবন তাহফা আল-বাজালীকে (রহ.) দেবল যাত্রার নির্দেশ দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উভয় সেনাপতিই নিহত হন।

'হাজ্জাজ এরপর মুহাম্মদ ইবন কাসিম (ইবন হাকাম ইবন আবূ 'আকীল)-এর প্রতি এ কাজের দায়িত্ব অর্পন করেন।' এটা ছিল ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিকের আমল। মুহাম্মদ ইবন কাসিম সিন্ধু আক্রমণ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি পারস্য এলাকায় নিযুক্ত ছিলেন। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম তৃতীয় বারের মত সিন্ধু অভিযানে আসেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেবল এসে উপস্থিত হন। দেবল বন্দরে দেবল দুর্গটি ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইসলাম বিজয় লাভ করে। একে একে নিরুন, সিওয়ান ও সিসাম মুসলমানদের দখলে আসে।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু রাজা দাহির পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে রাওয়ারের দিকে রওয়ান হন। তিনি মুসলিম বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে ২০ জুন ৭১২ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। এরপর মুহাম্মদ বিন কাসিম একে একে ব্রাহ্মণবাদ, আলোর ও মুলতান অধিকার করেন। মুহাম্মদ ইবন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের এ কাহিনী খুটিনাটি সবিস্তারে ঐতিহাসিক বালাযূরী (রহ.) তাঁর 'ফুতুহুল বুলদানে' বর্ণনা করেছেন।[৬]

৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশের ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন আরবীয় মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ ইবন কাসিম। তিনি একটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাস ও জীবনধারার অনুসারী জনগণকে আপন ইসলামী চরিত্র ও সংস্কৃতি দ্বারা ইসলামের প্রতি অনুরাগী ও শ্রদ্ধাশীল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবন কাসিমের অপসারণ ও মৃত্যুর পর খলীফা সোলাইমান ইয়াযিদ ইবন মুহাল্লাবকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁর ভ্রাতা হাবীব শাসনভার প্রাপ্ত হন। খলীফা হিশামের শাসন আমলে আল জুনাইদ হাবীবের স্থলাভিষিক্ত হন; তাঁর সময় বহু সংখ্যক সিন্ধুবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসনের পতন হলে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। খলীফা মনসুরের সময় আরব আধিপত্য বেলুচিস্তান এবং বর্তমান ভাওয়ালপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ৮৭১ খ্রিস্টাব্দের পর মুসলমানরা আত্মকলহে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে মুলতান ও মানসুরায় দুটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১০১০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কর্তৃক মুলতান অধিকৃত হলে ঐ অঞ্চল হতে আরবদের অপসারণ করা হয় এবং সিন্ধু অঞ্চলের উপর আরব শাসনের অবসান হয়।

সুলতান মাহমুদ গজনভী (৯৭১ খ্রি.-১০৩০ খ্রি.) ১০০০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের খাইবার গিরিপথের সীমান্তবর্তী কয়েকটি শহর আক্রমণ করেন। ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ সপ্তদশ ও সর্বশেষ বারের মত দুর্ধর্ষ জাইদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ

---

৬. আল্লামা আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বালাযুরী (র.), *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৭-৪৫৪

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সুলতান মাহমুদের ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণের ফলে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে স্বেচ্ছায় অনেক পীর দরবেশ এদেশে আসেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক এস. এম জাফর বলেন, মুসলমান যোদ্ধা ও সেনাপতিদের সাথে এমন অনেক পীর দরবেশ এবং পণ্ডিতগণ এদেশে আগমণ করেন। যাঁরা ভারতীয় সমাজের গভীরে প্রবেশ করে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেগ বলেন, "তিনিই (মাহমুদ) প্রথম যিনি ভারতবর্ষের অনেক অভ্যন্তরে ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে যান।"[৭]

মুহাম্মদ ঘুরী (১১৭৩-১২০৬ খ্রি.) ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে রাজপুতদের নেতৃত্বদানকারী দিল্লী ও আজমীরের চৌহান রাজা পৃথিরাজ এর উপর বিজয়ী হলে পুণরায় ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কুতুবুদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.) মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম অভিযানকে গতিশীল করেন। তিনি দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের ইতিহাস শুরু করেন।

শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ভারতকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করেন। মুসলিম জাহানের খলীফা তাঁর সাহস, বীরত্ব ও ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির পুরস্কার স্বরূপই 'সুলতানুল হিন্দ' খেতাবে ভূষিত করেন।

সূফী সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.) একজন সুলতান অপেক্ষা অধিক সূফী সাধক ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর সাদামাঠা জীবন যাপন করতেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবান (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.) সূফী নাসির উদ্দিন মাহমুদের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। তাঁর সময় দিল্লি ছিল মুসলিম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। ঐতিহাসিক বদায়ূনীর মতে, বলবন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক জামাতে শরিক হতেন এবং সকল সময় অযু সহকারে থাকতেন।[৮]

খলজী শাসক বংশ (১৯২০-১৩২০ খ্রি.)-এর শাসনামলে ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের নেতৃত্ব দেন শায়খ ফরীদুদ্দীন গাঞ্জেশকর (রহ.)-এর শিষ্য সাইয়েদী মাওনা। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলীয়ে কামিল ছিলেন। খিলজী ওমরাগণের চক্রান্তে তিনি শহীদ হন। ঐতিহাসিক বারানীর মতে, যে বছর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সে বছর অনাবৃষ্টির দরুন শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৯]

তুঘলক রাজবংশের (১৩২০ খ্রি.-১৪১৪ খ্রি.)-এর প্রতিষ্ঠাতা হল গাজী মালিক তুঘলক। তুঘলকগণ তুর্কীদের করুণা বংশোদ্ভুত। তুর্কিস্থান ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের পার্বত্য

---

৭. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০৮, পৃ. ২০২

৮. *প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮*

৯. *প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২*

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে তারা বসবাস করতো। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গাজী মালিক ওরফে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক আলিম, সূফী-সাধক ও দরবেশদের সম্মানের চোখে দেখতেন।

সৈয়দ বংশ ১৪১৪ খ্রি. থেকে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার বর্ণনানুযায়ী ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর সঙ্গে তুঘলক শাসনের অবসান ঘটে। অতঃপর ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরলঙ্গের প্রতিনিধি খিজির খান দৌলত খানকে বিতাড়িত করে দিল্লীর উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র লিখক ইয়াহইয়া ইবন আহমদ সিরহিন্দের মতে, 'খিজির খান হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বংশধর ছিলেন। এ জন্যে তাঁর বংশ সৈয়দ বংশ নামে খ্যাতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরবের অধিবাসী ছিলেন একথা সত্য; কিন্তু তাঁরা প্রকৃতই মহানবী (স.)-এর বংশধর ছিলেন কিনা এর নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।'[১০]

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.) ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করে। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক বাহলুল খান লোদী। সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রি.) ছিলেন লোদী বংশের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুলতান।

মুঘল যুগ (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.) ভারতীয় ইতিহাসে বৈচিত্রময় শাসন ব্যবস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসনের সূত্রপাত করেন জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

এ বংশের বেশ কয়েকজন শাসক ইসলামের প্রতি নমনীয় এবং ইসলামী নিয়মনীতির অনুসারী ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নিকট হতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে এবং উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশের ভৌগলিক গড়নটা অদ্ভুত ধরণের। বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান এ তিনটি অঞ্চল ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও বাংলায় মরুভূমি, পবর্তমালা, মালভূমি, উপত্যকার মতো উপমহাদেশের সুপরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় না। উত্তরে এবং পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তজুড়ে উচ্চভূমি ছাড়া এর পুরোটাই সমতল এবং পলিমাটির সৃষ্টি। উত্তর

---

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের প্রায় সব নদী এই ভূভাগ হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। পরিণতিতে এটা বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপে পরিণত হয়েছে।[১১]

বাংলার প্রাচীন জনপদগুলো পুণ্ড্র, বঙ্গ, গৌড় ও রাঢ় নামে পরিচিত ছিল এবং সেগুলো এক এক গোষ্ঠী বা গোত্রের বসতি-অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। তবে এর বাইরেও ছোট ছোট আরও রাজ্য ছিল। সেগুলো ছিল মূলত জনপদ রাজ্য। কোনটার নাম পাওয়া যায়, কোনটির ভৌগোলিক অবস্থান জানা যায়, কতগুলো সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। নিচু অঞ্চলকেই কেন্দ্র করে এসব জনপদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা আবর্তিত হতো।[১২]

প্রাচীনকালের শেষ দিকে রাঢ়, পুণ্ড্র, বঙ্গ জনপদ তিনটি বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাঢ় জনপদের সঙ্গে পুণ্ড্র, তমলুক, বঙ্গভূমি প্রভৃতি মিশে যায়; বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গে মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল। বঙ্গ জনপদের সঙ্গে মিশেছে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি। বর্তমানে তা বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল। সমতট ছিল খুলনা, যশোহর জেলার অংশ বা সুন্দরবনের সঙ্গে যুক্ত। হরিকেল ছিল বাকেরগঞ্জ অঞ্চল। ঢাকা, ময়মনসিংহ কুমিল্লা ইত্যাদি অঞ্চল মিলে ছিল বঙ্গ জনপদ।

জনপদ হিসেবে বাংলাদেশ বেশ প্রাচীন হলেও অখণ্ড দেশ হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ খুব বেশী দিনের নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলো থেকে অনেক দূরে এর প্রবল বর্ষণ, নিয়মিত বন্যা, নদ-নদীর বাহুল্য নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ইত্যাদি কারণে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অধিকাংশ সময় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-শতকের খোদাইকৃত শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই এই সময়ের আগে থেকেই এখানে মানব বসতি ছিল বলে ধারণা করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় কৃষিভিত্তিক তথা ধানচাষ ভিত্তিক মানব বসতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। [১৩]

এদেশের আদি অধিবাসী সম্পর্কে তেমন কিছু ধারণা করা যায় না। ধারণা করা হয়; তারা ছিল বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর। সম্ভবত বেশিরভাগই ছিল অস্ট্রিক। তাদের ধর্ম, খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি ছিল উত্তর ভারত থেকে ভিন্ন। এ অঞ্চলটি তখনও সভ্য লোকদের বসবাসের জন্য

---

১১. M. Harunur Rashid, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* " The Geographical Background to the History and Archahacology of South-East Bengal", P. 160

১২. আহমদ শরীফ, "ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি", *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, (সংকলন ও সম্পাদনা: আবুল কাশেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান), ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০০৯, পৃ. ৪০-৪২

১৩. Richard M. Eator. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, 1204-1760, P. 4, p.1997

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত ছিল না। তথাপি জীবন ধারণের মৌলিক উপাদানগুলোর প্রাচুর্যতার কারণে এখানে অভিবাসন অব্যাহত ছিল।

বাংলাদেশে ইসলাম

ইবন খুরদাবা, মাসউদী, আল ইদ্রিসী প্রমূখ ভৌগোলিক ও পর্যটকদের বিবরণ থেকে বঙ্গ ব-দ্বীপ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। বিশেষত এ অঞ্চলের অর্থনীতি, বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ও অন্যান্য। ইবন খুরদাবা (মৃ. ৩০০ হি.) তাঁর 'আল মাসালিক ওয়া মামালিক' নামক গ্রন্থে লিখেছেন- কামরু (কামরূপ) থেকে মিঠা পানির মাধ্যমে (নদীর মাধ্যমে) পনের বিশ দিনের মধ্যে সমন্দরে (চট্টগ্রাম) সন্দল বা চন্দন কাঠ নিয়ে আসা হয়।

আল ইদ্রিসী- (মৃ. ৫৪৯ হি.) তাঁর 'নুযহাতুল মুতলাক' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সমন্দর একটি বড় জনপদ, বাণিজ্য কেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী নগর। এখানে ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয়। এ বন্দর কনৌজের অধীন। এটি এখন এক নদীর তীরে অবস্থিত যার উৎপত্তি স্থান কাশ্মীর অঞ্চলে। এখানে চাল, গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে সুমিষ্ট পানি বিশিষ্ট নদীপথে পনের দিনের পথ কামরূ (কামরূপ) থেকে চন্দন কাঠ আনা হয়।

অনেকেই এ সমন্দরকে চট্টগ্রাম মনে করেন। কেউ আবার সোনারগাঁও বা সুবর্ণ গ্রাম বলেও মত দেন। ইবনে বতুতা তার ভ্রমণ কাহিনীতে বিভিন্ন স্থানে বাঙালার সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে আরব বণিকদের যাতায়াত প্রাচীনকাল থেকেই ছিল একথা প্রায় সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। এমনকি ঐতিহাসিকদের ধারণা 'চট্টগ্রাম' বন্দরের নামটিও আরবদেরই দেওয়া। গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত বলে শাতিউল গঙ্গা বা শাতগাম এবং তা থেকে চাটগাঁও বহু প্রাচীনকাল থেকেই যোগাযোগের ফলে বাংলাদেশে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে, আরবী ভাষা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রামের ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ অঞ্চলের উপভাষার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শব্দই আরবি মূল শব্দ জাত বা আরবির বিকৃত উচ্চারণ। আরবি ভাষার বাক্য গঠনের নিয়মানুয়ী চট্টগ্রামের ভাষার ক্রিয়াপদে আগে 'ন' তথা না বোধক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম এলাকার লোকদের নৃতাত্ত্বিক আদল বা গঠন বেশিরভাগই আরবিয়দের মত। এর কারণ হিসেবে মনে করা হয় অধিবাসীদের অনেকেই আরব বংশোদ্ভুত। আর বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের অনেকেই এদেশে এসে আর দেশে ফিরে যায় নি। সুতরাং আরবদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং ধর্ম ও রক্তের মিশ্রণে এ এলাকার সমাজ মানসে ইসলামী ভাবধারার বিস্তার ঘটেছিল, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন ধর্মপ্রচারকগণ

রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায়ই ইসলামের সত্যবাণী বাংলায় প্রবেশ লাভ করে। সমুদ্র পথে আগত বণিকদের মাধ্যমে তাওহীদের বাণী বাংলায় আসে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

রাসূল (স.)-এর ইন্তিকালের তিন বছরের মধ্যেই হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত কালে সহাবীগণের একটি দল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসেন নি। তাঁরা এসেছিলেন কেবল সত্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়, প্রাথমিক যুদ্ধের এ সকল ইসলাম প্রচারক উৎসর্গীকৃত প্রাণ ব্যক্তিগণ সহজ-সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের প্রচার কার্যের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই ধর্মভেদ জর্জরিত এদেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত জন সমাজের সম্মুখে এক নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলের দিকে দিকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে এক নীরব সমাজেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিবেশ গড়ে উঠে।[১৪]

অষ্টম শতকের শেষ পাদে ও নবম শতকের প্রথম পদে বঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে সিন্ধুর মুসলিম শাসকদের যোগাযোগ ছিল। তাদের মধ্যে বিনিময়ও হত। আর সিন্ধু রাজ্যের এ শাসক বাগদাদের খলিফা হারুনুর রশীদের নিয়োজিত গভর্ণর হবেন। এম. এ. সুবহান তার *Sufism its Saints and Shrines* শীর্ষক গ্রন্থে উভয় দেশের মনীষীদের পরস্পর পরস্পরের দেশে যাতায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে প্রতীয়মান হয়- এ সময়ে রাজ শক্তির আমন্ত্রণে ইসলামী সূফী-দরবেশ-পকিণ্ডতগণ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তবে এ সময়ের এমন কোন ঐতিহাসিক বিবরণ বা তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, কখন কারা কিভাবে এ সময়ে বঙ্গদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেন।

আলিম, মুজাহিদ, সূফীয়া-ই কিরামের ইসলাম প্রচার

এগার শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সাতশ বছর এ দেশে ইসলামের সুবর্ণ যুগ। এ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশের চারিদিকে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিমের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইসলাম প্রচারের গতিধারার দিক থেকে আমরা এ কালকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. প্রথম পর্যায় : একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দী এবং এয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এ পর্যায় বিস্তৃত।

---

১৪. আব্দুল গফুর, *অগ্রপথিক*, "মহানবীর যুগে উপমহাদেশ", সীরাতুন্নবী সংখ্যা ১৯৮৮, পৃ. ৪৯-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

২. দ্বিতীয় পর্যায় : এয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ।

৩. তৃতীয় পর্যায় : পঞ্চদশ, ষোড়ষ ও সপ্তদশ শতকে এ প্রচারের ধারা অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। ইসলাম প্রচারের পথে নানা বাধা-বিপত্তি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

সূফী ও উলামায়ে কিরাম বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের যে ভূমিকা পালন করেন তা বিস্ময়কর। আরব, ইয়ামান, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে এ সূফী ও আলিমগণ বাংলাদেশে আসেন।

প্রথম পর্যায়ে আলিম ও সূফীগণ এদেশে আসেন সমুদ্র পথে। বাণিজ্যিক কারণে এখানকার বন্দরগুলো তাদের নিকট পরিচিত ছিল। এসব আলিম ও সূফীর সংখ্যা কত ছিল তার সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারবে না। ধারণা করা হয় তাদের সংখ্যা শত শত। তাঁদের মধ্যে অনেকের নামও জানার উপায় নেই।

প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও শাসকরা অনেকে সহজেই তাঁদের আগমণ ও ধর্ম প্রচারকে মেনে নিতে পারে নি। ফলে তাঁরা হয়েছেন নির্যাতনের স্বীকার অনেকে হয়েছেন শহীদ, আবার কেউ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। আবার অনেকে তাদের জীবন, চরিত্র, কর্ম ও চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিপুল সংখ্যক জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সূফী ও দরবেশগণ অনেক সময় অলৌকিক কারামত দেখিয়েও লোকদের মুগ্ধ ও অনুগত করেছেন। বস্তুত ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ একত্ববাদ ও ইসলামের অন্তর্নিহীত অধ্যাত্মিক শক্তির বলেই পৌত্তলিক, আদর্শহীন, নরপূজারী, প্রতিমা পূজারী ও অবতারবাদীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে কয়েকজন ধর্মপ্রচারক বাংলাদেশে আসেন। হযরত মাহমুদ (রা) ওয়ারত মুহায়মিন (রা.) ছিলেন এ দলের নেতা। তারপর এ দেশে ইসলাম প্রচার করতে আসে। যথাক্রমে হযরত হামেদুদ্দীন (রা.), হযরত হুমায়নুদ্দীন (রা.), হযরত মুর্তাজা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ও হযরত আবূ তালিব (রা.) প্রমূখ। এরূপ একের পর এক পাঁচটি দল ইসলাম প্রচারে এদেশে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা কিতাব কিছুই থাকত না। তাঁরা কোন রাজ শক্তির সাহায্য গ্রহণেরও আশা করতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা বাংলাদেশের প্রচলিত ভাষার মাধ্যমে ইসলামের বাণী, আখলাক, সালাত, সিয়াম ও যাকাত ইত্যাদির কথা বলতেন এবং নিজেরা তা পালন করে দেখিয়ে দিতেন। তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রকৃত মুসলমান তৈরী করা, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক। প্রথম পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন[১৫]-

১. মীর শাহ সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সাওয়ার (রহ.),
২. শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (রহ.),
৩. সাইয়েদ শাহ সুরখুল আনতিয়াহ (রহ.),
৪. বাবা আদম শাহ শহীদ (রহ.),
৫. মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ (রহ.),
৬. শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিযী (রহ.),
৭. শাহ নিয়ামত উল্লাহ কুতশিকন (রহ.),
৮. শাহ মাহমুদ রুপোশ ওরফে সায়্যেদ সনদ শাহ দরবেশ (রহ.),
৯. হযরত বায়েজীদ বিস্তামী (রহ.),
১০. ফরীদুদ্দিন শাকরগঞ্জ (রহ.),
১১. মাখদুম শাহ গজনবী ওরফে রাহী পীর। তাঁর সাথে আরও সতের জন এ দেশে এসেছিলেন বলে জানা যায়।
১২. সাইয়েদ শাহ তাজুদ্দিন (রহ.),
১৩. খাজা দীন চিশতী (রহ.),
১৪. শাহ হাজী আলী (রহ.),
১৫. শাহ সিরাজুদ্দিন (রহ.),
১৬. শাহ ফিরোজ (রহ.),
১৭. পীর পাঞ্চতন (রহ.) এবং
১৮. পীর ঘোড়া শহীদ (রহ.)।

বিখ্যাত বার আউলিয়ার প্রচেষ্টায় প্রধানত চট্টগ্রামের সমগ্র এলাকায় ইসলাম ধর্মের প্রসারে ঘটে। এ সকল সাধক মহাপুরুষদের নাম চট্টগ্রাম এলাকার লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। এরা হলেন-

১. সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.)
২. শেখ ফরীদ (রহ.)
৩. শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা বদর পীর বদর শাহ, বদর আউলিয়া বা পীর বদর (রহ.)।
৪. কতল পীর বা পীর কতল (রহ.)। চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জে তাঁর মাযার রয়েছে।
৫. শাহ মুহসীন আউলিয়া (রহ.)।
৬. শাহ পীর (রহ.)। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানায় তাঁর খানকা ও কর্মতৎপরতা ছিল। এখানেই তার মাযার রয়েছে।

---

১৫. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রম বিকাশ"' *অগ্রপথিক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইস্যু: ০২-০২-১৯৮৯-৯০

Dhaka University Institutional Repository

৭. শাহ ওমর (রহ.)। চট্টগ্রাম জেলার ঢাকারিয়ায় তাঁর মাযার রয়েছে।

৮. শাহ বাদল (রহ.)। চট্টগ্রামের তাছার ধুম স্টেশনের কাছে তাঁর মাযার অবস্থিত।

৯. শাহ চাঁদ আউলিয়া (রহ.)। পটিয়া থানার কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি তাঁর মাযার।

১০. শাহ যায়েদ (রহ.)। চট্টগ্রাম জেলা কুন্দেরহাট স্টেশনের কাছাকাছি তাঁর মাযার রয়েছে।

১১. শাহ গরীবুল্লাহ (রহ.)। চট্টগ্রামের উত্তর দিকের দামপাড়া এলাকায় তাঁর মাযার রয়েছে।

১২. শাহ নেয়ামতুল্লা বা নেয়ামত শাহ (রহ.)।

১৩. শাহ আমানতুল্লাহ (রহ.)। চট্টগ্রাম শহরে জেলখানার উত্তর পার্শ্বে তাঁর মাযার অবস্থিত।

১৪. মাওলানা আহমাদুল্লাহ (রহ.)। চট্টগ্রাম জেলার নাজিরহাটে রেল স্টেশনের কাছে তাঁর মাযার আছে।

চট্টগ্রামে কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলমান বসবাস করলেও তারা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি। তাদের কাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার। সপ্তদশ শতাব্দীর শিহাবদ্দীন তালিশ লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায়- "মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক পরে সোনারগাঁয়ের স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রি.) ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করে তা মুসলিম শাসনের অন্তর্ভূক্ত করেন"।[১৬]

বাংলার রাজশক্তি রূপে ইসলাম

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে এদেশে মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় ছিল এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। বলতে গেলে এ মানুষটিই এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। তিনি ছিলেন তুর্কিস্থানের খাল্‌জ বংশোদ্ভুত। তাই তাঁর বংশ পরিচয়ের জন্য তাঁর নামের শেষে 'খাল্‌জী' বা 'খিলজী' শব্দ যুক্ত করা হয়।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে একদল তুর্কি নদীয়া বা নওদীহ্ তথা বাংলায় সফল অভিযান পরিচালনা করেন।[১৭] এর ফলে সেনরাজ দরবারের সেবাদানকারী ব্রাহ্মণ, জ্যোর্তিবিদ, মন্ত্রী, উপদেষ্টা বা অর্থ কর্মকর্তাদের উপর হতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার আকস্মিক অবসান ঘটে। সন্দেহ নেই তাদের অনেকেই ১২০৪ খ্রি. বা এর পরপরই সেন রাজন্যবর্গের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল। বাংলায় সেন

---

১৬. Dr. Md. Enamul Huq, *A History of Sufism in Bengal*, Dhaka: 1980, P. 247-248

১৭. Eaton; *The Rise of Islam and the Bengal Frontier,* op.cit., P. 136

Dhaka University Institutional Repository

বংশের রাজা রায় লক্ষ্মণ সেন এর পতনের পর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল- স্থানীয়রা বড় ধরণের কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলেনি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মত বৃহত্তর বাংলার আত্মপ্রকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা এ বিজয়ের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য।[১৮]

রাষ্ট্র ও ভাষা উভয় থেকেই বৃহত্তর রূপে আত্মপ্রকাশের এ কথা প্রযোজ্য। অবশ্য ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া দখলের সাথে সাথেই তা হয় নি। তিনি শুধু প্রক্রিয়া শুরু করেন। তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়ার (ফিরোজাবাদ) সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁয়ের শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে। তিনি প্রথম বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯] অবশ্য খুলনা যশোর ও ফরিদপুর বরিশাল এলাকা তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না।[২০]

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে মুসলিম রাজ্যের পতন পর্যন্ত পাঁচশত চুয়ান্ন বৎসরে একশত একজন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

"বাংলার মুসলিম শাসনকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. খিলজীদের অধীনে বাংলা (১২০৪-১২২৭ খ্রি.)
২. দিল্লী শাসনের অধীনে বাংলা (১২২৭-১৩৪১ খ্রি.)
৩. ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (১ম) (১৩৪২-১৪১৩ খ্রি.)
৪. গনেশ জালাল উদ্দিনের অধীনে (১৪১৪-১৪৪১ খ্রি.)
৫. ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (২য় পর্যায়ে) (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রি.)
৬. হাবশী শাসনাধীনে বাংলা (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রি.)
৭. হুসেন শাহী বংশের অধীনে বাংলা (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.)
৮. পাঠানদের অধীনে (শের শাহ ও শূর বংশ) (১৫৩৮-১৫৬৪ খ্রি.)
৯. কররানী বংশের অধীনে বাংলা (১৫৬৫-১৫৭৬ খ্রি.) এবং
১০. মোঘল শাসনাধীনে বাংলা (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.)"।[২১]

সাড়ে পাঁচশত বৎসরাধিক কাল যারা বাংলার মসনদে সমাসীন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ছিলেন যাঁরা আপন বাহুবলে বাংলার সিংহাসনে আরোহন করে দিল্লীর

---

১৮. আকবর আলি খান (অনু., আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া), *বাংলাদেশের সত্তরে অন্বেষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪, পৃ. ৩

১৯. কাজী জাফরুল ইসলাম, *মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ১৯৯৯, পৃ.৭

২০. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, *ইতিহাস সন্ধান*, ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনি, ১৯৮৮, পৃ. ১১৯

২১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেন। কিছু সংখ্যক শাসক ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর অবশিষ্টাংশ দিল্লীর দরবারে থেকে নিয়োগপত্র লাভ করে গভর্ণর বা নাজিম হিসেবে বাংলা শাসন করেন। মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে এদেশে আগমন করার পর এ দেশকে তাঁরা মনে প্রাণে ভালবাসেন, এ দেশকে স্থায়ী আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন। শাসক হিসেবে শাসিতের উপর তারা কোন অন্যায় আচরণ করেননি। জনসাধারণও তাদের শাসন মেনে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার বাংলার অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন, মুসলমানদের জন্যে বহু মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন করলেও অমুসলিমদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন তিনি ইচ্ছা করলে পলাতক লক্ষণ সেনের পশ্চাদানুসারণ করে তাকে হত্যা করতে পারবেন। কিন্তু সে কথা তিনি আদৌ মনে স্থান দেননি। যদুনাথ সরকার তাঁর 'বাংলার ইতিহাসে' বলেন, "কিন্তু তিনি রক্ত পিপাসু ছিলেন না। নরহত্যা ও প্রজাপীড়ন তিনি পছন্দ করতেন না। দেশে এক ধরনের জায়গীর প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক সরকার কায়েমের দ্বারা অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও সামরিক প্রধানদের সন্তুষ্টি সাধন করতেন"।[২২]

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গে আগমনের পরে যাঁরা ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. হযরত শাহ তুর্কান শহীদ (রহ.)।
২. হযরত মাওলানা তকীউদ্দিন আল আরাবী (রহ.)।
৩. হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রহ.)।
৪. হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী (রহ.)।
৫. হযরত সায়্যিদ আবদুল্লাহ ওয়ালী হুসায়নী কিরমানী (রহ.)।
৬. হযরত শায়খ আমীর খান লোহানী (রহ.)।
৭. হযরত শাহ সূফী শহীদ (রহ.)।
৮. হযরত জাফর খাঁ গাজী (রহ.)।
৯. হযরত সায়্যিদ আব্বাস আলী মক্কী ওয়াফ পীর গোরচাঁদ (রহ.)।
১০. হযরত সায়্যিদ রওশন আর মক্কী (রহ.)।
১১. হযরত মুহসীন আউলিয়া বা শাহ মুহসিন (রহ.)।
১২. কত্তাল পীর (রহ.)।
১৩. হযরত শরীফ শাহ (রহ.)।
১৪. হযরত পীর সায়্যিদ মুবারক আলী গাজী (রহ.)।
১৫. হযরত সায়্যিদুল আরেফীন (রহ.)।
১৬. হযরত শাহ লঙ্গর (রহ.)।
১৭. হযরত শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (রহ.)[২৩]।

---

২২. Jodunath Sarkar, *History of Bengal*. Vol. 11. Muslim Period, P. 9

২৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রম বিকাশ"' *অগ্রপথিক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইস্যু: ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী' ১৯৮৯-৯০

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ও সমকালীন বাংলাদেশ (১৯৩৩-২০০০)

এ পর্যায়ে ১৯৩৩ খ্রি. হতে ২০০০ খ্রি. পর্যন্ত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর সমসাময়িক কালের ধর্মীয় অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ ও সংস্কৃতি ও উল্লেখ্যযোগ্য ধর্মপ্রচারকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো।

ধর্মীয় অবস্থা

বিশ্বে বাংলাদেশ একমাত্র মুসলিম দেশ যার সীমান্তে কোন মুসলিম রাষ্ট্র নেই। ফলে বিপুলভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ব্যতিক্রমী ঘটনা। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং অন্যতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।

ষোড়ষ, সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতকে বাংলায় সূফিভাবাপন্ন মরমী কবিরা ইসলামের প্রচার প্রসারে নেতৃত্বে ছিলেন।[২৪] ঊনিশ শতকে ইসলামী সূফীবাদের নামে তৎকালীন সাধারণ মুসলমানরা হিন্দু যোগ সাধনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধর্মের মধ্যে অনেক বিদ'আত অনুপ্রবেশ হওয়ায়র কারণ হিসেবে এদেশের পূর্ব পুরুষদের হিন্দু ধর্মের স্পস্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর সাথে যোগ হয় ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য প্রভাব, যা প্রায় দুশত বছরের ইংরেজ শাসনের কুফল। তখন সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারীরাও নামের শেষে মুসলিম পদবী যথা খাঁ, খান, চৌধুরী ইত্যাদি ব্যবহার করতো।

তখন (মুসলিম বিজয়কালে) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে-সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিহীনতা এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার সমাজদেহে দুষ্টক্ষতের মতো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল।[২৫]

স্বাধীন সুলতানী আমল কিংবা মোগল আমলেও বাংলার শাসকগণ ইসলাম ধর্মকে বিভিন্নভাবে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। সুলতানগণ ও তাঁদের পরিবার, পরিজন, তুর্কি সামরিক অভিজাততন্ত্র, সূফী পণ্ডিতশ্রেণী ও তাঁদের সহচরগণ, কিছুসংখ্যক বিদেশি ব্যবসায়ী ও স্থপতি-কারিগরের সমন্বয়ে একটি নগরকেন্দ্রিক সামাজিক স্তর গড়ে উঠেছিল। কিছুটা সরলভাবে বলা যায়- এই স্তরের সংস্কৃতি ছিল নগরভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি।[২৬]

---

২৪. আব্দুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা* ও বাঙ্গালী সমাজ, ঢাকা: তা.বি. পৃ. ১৮৯-৯০

২৫. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বাং., পৃ. ৭১২

২৬. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলার ধর্মজীবন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, খ.১, পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী শক্তির আবির্ভাব-পূর্ব কাল থেকেই এদেশে বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম ছিল। দেশের প্রায় সর্বত্র অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর পূজা হতো। এইসব দেবদেবীর বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যকার অনেকেরই রূপকল্পনায় বহু দেশি-বিদেশি, আর্য-অনার্য এবং সংস্কৃত-লোকজ উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে। দেবদেবীদের মধ্যে প্রায়ই ছিল জাদুশক্তি ও প্রজনন-শক্তির প্রতীক। গ্রামীণ কৃষি সমাজে কতকগুলো পূজা ও ব্রত চালু ছিল। জৈন ও বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল পাল ও সেন আমলে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু বৌদ্ধ তীর্থস্থান এবং দেবমন্দির ছিল। বিষ্ণুর উপাসনাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিল মধ্যযুগেই এছাড়া সমগ্র পূর্বভারতে ছিল শক্তি দেবীর উপাসনা। মুসলমানদের আগমনের ফলে হিন্দু রাজশক্তি ও সামন্তশক্তি ধ্বংস হয়, তবে কৌম সমাজের রূপান্তরিত মুসলমানদের অনার্য দেবদেবী চর্চা ও লৌকিক পার্বণ অব্যাহত ছিল। এ পর্যায়ে ইসলাম ছিল সুন্নি ইসলাম। এই ধর্ম ও ইসলামী সংস্কৃতির পোষকতার উদ্দেশ্যে প্রধানত প্রশাসকদের উদ্যোগে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল। মাদ্‌রাসাগুলোতে স্বভাতই আরবি ভাষা, ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং কোরান হাদিসভিত্তিক ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কয়েকজন বিখ্যাত সুফি ও পণ্ডিতের জীবনবৃত্তান্ত ও জ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে প্রাপ্ত সীমিত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, তাঁদের অনেকেই কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা তথা তাফসীর হাদীস, আইনশাস্ত্র, ধর্মীয় দর্শন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ধর্মীয় বিষয়বস্তু চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সূফি আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন করতেন।

সূফিদের দরবারে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সমাগম হতো। সূফীদের কারামত, তাঁদের জীবনযাত্রার সরলতা এবং আন্তরিক ধর্মপরায়ণতা তাদেরকে অনেক সময়েই মুগ্ধ করতো। তাছাড়া বৌদ্ধ; গুপ্ত বৌদ্ধ বিভিন্ন কোমের লোকজন এবং অন্তজ ও পতিত শ্রেণীর হিন্দু ছিল ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থার বাইরে। তাদের পক্ষে সূফির খানকায় ইসলাম গ্রহণ ছিল খুবই স্বাভাবিক। খানকা ও দরগার রক্ষণাবেক্ষণ ও পোষণের জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নিষ্কণ্টক জমি দান করতেন। এ ধরণের ভূমি বন্দোবস্ত অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচারের বস্তুভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ইংরেজ আমলেও এদেশের মধ্যযুগীয় ইসলাম প্রচার ব্যবস্থার ধরণ ও ইসলাম চর্চার প্রকৃতি একই রকম থেকেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

ইসলাম ধর্মে জ্ঞান অর্জনে এবং বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী ব্যক্তির বহু ফযীলত বর্ণিত আছে। এ দিকে লক্ষ্য করে তৎকালীন স্বচ্ছল মুসলিমরা ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে বহু মসজিদ ও মাদরাসা তৈরী করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য এক ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা, নিম্ন শ্রেণীর জন্যে আর এক ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা,

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা শিক্ষার সহিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সম্পর্কে স্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। এককথায়, ইসলাম শিক্ষা সে যুগে বহুমুখী সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে।[২৭]

সৈয়দ আব্দুল আগফর *'তরফের ইতিহাস'* গ্রন্থে বলেছেন, ইংরেজি ভাষার প্রতি মুসলমানদের পূর্ব হইতে ভয়ানক ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইংরেজি শিখলেই নরকগামী হতে হবে এবং ইংরেজি শিখিয়ে খ্রিস্টীয় ধর্মে দিক্ষিত করা ইংরেজি গভর্নমেন্টের মূখ্য উদ্দেশ্য বলে তাঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বহুকালের সংশ্রবে এবং দেশের প্রচলিত ভাষার গতিকে বাংলার প্রতি বিশেষত লাঘব হওয়াতে অনেকেই বাংলা শিখছেন।[২৮]

সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য

কালক্রমে মুসলমানদের মধ্যেও জাত্যাভিমান এসে উপস্থিত হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকট থেকে অনেক আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড আয়ত্ত করে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন 'কুলিন' আছে, মুসলমানদের মধ্যেও সেরূপ 'শরীফ'-এর আবির্ভাব হয়। সে সময় বঙ্গদেশের অনেকস্থলে এইরূপ শরীফদের অন্যায় ব্যবহার চরমে উঠে। এই সকল হীনচেতা শরীফ মহোদয়গণ মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে নীচ শ্রেণীর মধ্যে কন্যা বিবাহ দিতে বা কৃষক শ্রেণীর লোকের কন্যা গ্রহণ করার সময় 'বিবাহের পণ' দাবী করে বসেন। ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হতে দুশ-পাঁচশ বা হাজার টাকা পর্যন্ত একটি মেয়ে বা ছেলের দর হয়ে থাকে। এইরূপ ব্যবসায় মুসলমান ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর চট্টগ্রাম, বর্ধমান, বীরভূম ও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার বর্ণনায় দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে 'বাদিয়া' 'নিকারী' ও আসামের 'মাটীয়া' উপাধী বিশিষ্ট মুসলিমগণ এক সঙ্গে অন্য মুসলিমের সাথে বসে আহার করা দূরে থাকুক এক মসজিদে, এক ঈদগাহে বা মাঠে নামাজ পড়তেও পারেনা। ছালাম আদান প্রদানের অধিকারীও নহে। জুমা জামাতে তারা শরিক হতে পারে না। মধ্যবঙ্গে নদীয়া, চব্বিশপরগণা কোন নীচ জাতীয় হিন্দু মুসলিম হলে তাকে সমাজে নেওয়া হয় না, জুমা জামাতে শরীক করা হয় না।[২৯] এছাড়া পর্দা প্রথার নামে বাড়াবাড়ি, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, তালাক প্রথা ও বাঁদী প্রথা নামে বহু অনাচার যা ইসলামে সমর্থন করে না, সমাজে প্রচলন ছিল।

---

২৭. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশত শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৪৮৫

২৮. সৈয়দ আব্দুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২৯. মাও: মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, *আল-এসলাম*; ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন' ১৩২৬ সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য জগতে উনিশ শতকে বেশ কিছু সাহিত্যিক মহান পুরুষ আগমন করেন যারা সমাজে সংস্কারের তথা প্রকৃত ইসলাম অনুসরণ করার তাগিদ তাদের সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য করেন। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিকগণ হলেন-

১. মীর মশাররফ হোসেন। (১৮৪৭-১৯১২খ্রি.) তিনি উনিশ শতকের প্রথম পাদের লেখক হলেও তার সাহিত্য আজও সমান রস নিঃসরণ করে।
২. কাজিম আল কুরাইশী কায়কোবাদ। (১৮৮৫-১৯৫২খ্রি.)
৩. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩খ্রি.)
৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। (১৮৭৫-১৯৫০খ্রি.)
৫. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১ খ্রি.)
৬. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। (১৮৯১-১৯৭৬খ্রি.)
৭. কাজী ইমদাদুল হক। (১৮৮২-১৯২৬খ্রি.) 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসে মুসলমান সমাজের আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দাপ্রথা, ভোগবাদী পীরবাদ, ও অন্যান্য ধর্মীয়-কুসংস্কারের চিত্র তুলে ধরে সাহিত্যের জগতে অমর হয়ে আছেন।
৮. মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮-১৯২০খ্রি.)।

এসময়ে এহেন দুরবস্থা যেমন সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তেমনি উনিশ শতকে পরিপূর্ণ ইসলামী জ্ঞানে এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান বহু কামিল মুকাম্মিল পীর সাহেবগণ ও ছিলেন। যারা ইসলাম ধর্ম হতে এহেন ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস দূর করে সাচ্চা মুসলিম তৈরীতে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। সেসব মহান আধ্যাত্মিক পুরুষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. হযরত মাওলানা নিছারুদ্দীন আহ্‌মদ (রহ.)

তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই উপমহাদেশে দ্বীন ইসলামের বিকাশ সাধন ও ইলমে শরী'আত ও ইলমে মা'রিফাতের শিক্ষা বিস্তারে আজীবন ত্যাগ-সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক বাংলা ১২৭৯ সনের অগ্রহায়ন মাসে বরিশাল জেলার (বর্তমান পিরোজপুর) শর্ষিনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৩০] তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দ্বীনি শিক্ষার অভাবে মুসলমানগণ পথের দিশা হারিয়েছে। তাই তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রসার কল্পে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ১৩৫৮ সনের ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইন্তেকাল করেন।[৩১]

---

৩০. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮২, খ.৬, পৃ. ২০০

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

২. হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

তিনি তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত গাওহারডাঙ্গা গ্রামের এক দ্বীনদার পরিবারে বাংলা ১৩০২ সনের ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমেনা বেগম।[৩২]

তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ও তাসাউফ চর্চা সমানভাবে করতেন এবং সমাজে এ সবের সমান প্রভাব বিস্তারে আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি বহু গ্রন্থের অনুবাদসহ অনেক মৌলিক ইসলামী গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা সঠিক ইসলামী আকীদার ধারক ও বাহক। এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩৮৮ হিজরীতে রোজ মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন।[৩৩]

৩. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (রহ.)

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগণার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারা জীবন ভণ্ডপীর, শির্‌ক ও বিদায়াতের বিষাক্ত বিষ হতে সমাজকে রক্ষা করার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এ মহান সূফী ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই রবিবার সকাল ৯টা ৫৮ মিনিটে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৮৪ বছর ৩ দিন বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৩৪]

৪. হযরত শাহ মোহাম্মদ আব্দুল করীম (র.)

যশোরে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে এক চির উজ্জল নক্ষত্র তিনি। তিনি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইলমে তাসাউফের উপর তিনি 'এরশাদে খালেকিয়া' নামক এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এ বইটিতে তিনি আধ্যাত্মিকতার নামে তৎকালীন সমাজের ভণ্ড বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে সঠিক যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তব্য দিয়েছেন।

৫. হাফিজ সৈয়দ বশীরউদ্দিন (রহ.)

তিনি ওপার বাংলার অধিবাসী হলেও ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন। মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা রুহুল আমীন, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মুফতী আমীমুল ইহসান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী এরা সবাই সমমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কর্মবীর, সংস্কারক, আলিম সমাজ ও ধর্ম প্রচারকগণের মধ্যকার খুঁটিনাটি সংস্কার কার্যে জীবনভর চেষ্টা করে গেছেন।

---

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭

৩৩. *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

৩৪. *অগ্রপথিক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, জুলাই' ১৯৮৬ সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

৬. সৈয়দ মুহাম্মদ এছহাক (রহ.)

তিনি বরিশাল জেলার অন্তর্গত চরমোনাই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর ছিলেন। তিনি খুব সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা বাংলায় সূফীবাদের জোয়ার সৃষ্টি হয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি তিনি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মুরিদদের প্রতি বিশেষ তাগিদ দিতেন। তিনি মুসলিম সমাজ হতে কুসংস্কার দূর করেন এবং একজন সত্যিকারের সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ছিলেন তাঁর সুযোগ্য খলিফা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম

মানিকগঞ্জ জেলা : পরিচিতি ও ইতিহাস

অবস্থান

মানিকগঞ্জ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। মানিকগঞ্জের উত্তরে টাংগাইল জেলা, পশ্চিম, পশ্চিম দক্ষিণ এবং দক্ষিণ সীমান্তে যথাক্রমে যমুনা এবং পদ্মা নদী, পাবনা ও ফরিদপুর জেলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পূর্ব উত্তর পূর্ব দক্ষিণে রয়েছে ঢাকা জেলার যথাক্রমে ধামরাই, সাভার, কেরাণীগঞ্জ দোহার এবং নবাবগঞ্জ উপজেলা। ইহা ২৩° ৫২.৪৫″ অক্ষাংশ ও ৯০° ৪.১৫″ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

(মানচিত্রে মানিকগঞ্জ জেলা[১])

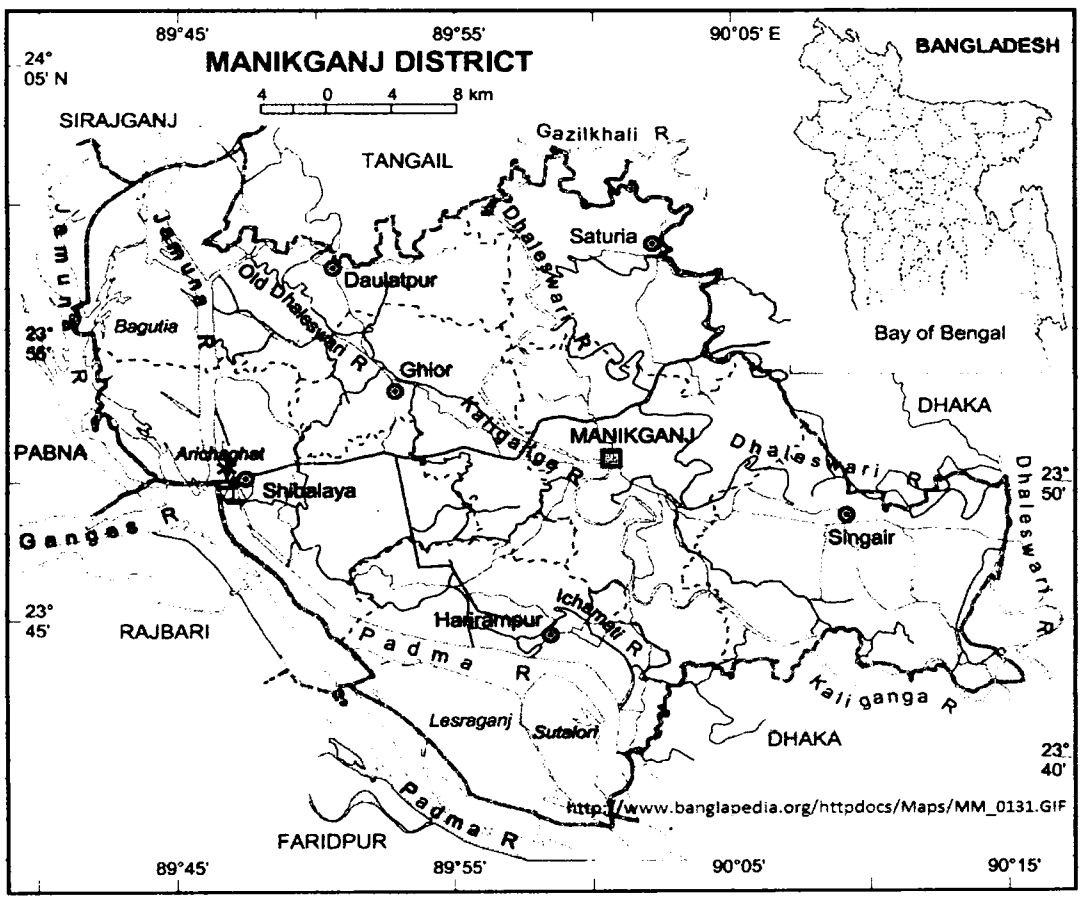

১. http://www.banglapedia.org/httpdocs/Maps/MM_131.GIF

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি

বাংলার মধ্যভাটি অঞ্চলভুক্ত মানিকগঞ্জ জেলার মাটি নদীবাহিত পলি মাটি দ্বারা গঠিত। পদ্মা, ধলেশ্বরী, ইছামতি, করতোয়া, যমুনা ও কালীগঞ্জ এ সকল নদনদী বাহিত হয়েই মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। মানিকগঞ্জ জেলার ভূভাগের মধ্যে হরিরামপুর শিবালয়, ঘিওর এবং সিংগাইর এর অংশ বিশেষ প্রাচীন। বাকী ভূ-ভাগ আঠার এবং ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে বসবাস উপযোগী হয়। প্রাচীনকালের নকশার ও জরিপকারীগণ যেমন বাউ দ্য বারোস (১৫৫০খ্রি.), ভ্যান ডেনপ্রোক (১৬৬০খ্রি.) এবং বেনেল (১৭৬৪-৭৬খ্রি) প্রমুখের নকশাগুলি মিলিয়ে দেখলে শুধু মানিকগঞ্জ নয়, প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। তাই বাংলাদেশকে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলে অখ্যায়িত করা হয়।

মানিকগঞ্জ জেলার নামকরণ

সংস্কৃত 'মানিক্য' শব্দ থেকে 'মানিক' শব্দটি এসেছে। মানিক অর্থ- চুনি, পদ্মরাগ, মণি কিংবা মুক্তা। এর ইংরেজি হয় Ruby, Jewel। মাণিক ও মানিক সমার্থবোধক শব্দ। তবে প্রয়োগ ক্ষেত্রে মানিক নাম বিশেষ্যের বেলায় এবং মাণিক গুণবাচক বিশেষ্যের বেলায় ব্যবহার হয়ে থাকে। গঞ্জ শব্দটি ফার্সি, হাট, বাজার, শস্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানকেই গঞ্জ বলা হয়।

মানিকগঞ্জ নামের উৎপত্তি সম্পর্কিত ইতিহাস এখনও রহস্যে ঘেরা। স্থানীয় জনশ্রুতিই এর একমাত্র ঐতিহাসিক উপাদান। এ নিয়ে বহু বিতর্কও রয়েছে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মানিকগঞ্জ নামের উদ্ভব দেখা যায়। এর পূর্বের কোন ঐতিহাসিক বিবরণে, মানচিত্রে বা সরকারী নথিপত্রে মানিকগঞ্জ নামের উল্লেখ নেই।

মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন তার গ্রন্থ *মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস* -এ কিছু অধিক প্রচলিত জনশ্রুতি বর্ণনা করেছেন[২]-

(ক) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে 'মানিক শাহ' নামক জনৈক সূফী দরবেশ সিংগাইর উপজেলার মানিকনগর নামক স্থানে আগমন করেন এবং খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে তিনি এ খানকা ছেড়ে হরিরামপুর উপজেলার দরবেশ হায়দার শেখের মাজারে গমন করেন এবং ইছামতি তীরবর্তী জনশূণ্য চরাভূমি বর্তমান মানিকগঞ্জে এসে খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এ খানকাকে

---

২. বিস্তারিত দ্রঃ মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, *মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস, ঢাকাঃ তা.বি., পৃ. ৭-১৫*

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র করে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে। উক্ত জনবসতি মানিকশাহের পূর্ণ স্মৃতি ধারণ করে হয়েছে 'মানিকনগর'। মানিকশাহ শেষ জীবনে ধামরাইতে অবস্থিত আধ্যাত্মিক গুরুর দরবার শরীফে ফিরে যাবার মানসে পুণরায় দ্বিতীয় খানকা ছেড়ে ধলেশ্বরীর তীরে পৌঁছেন। জায়গাটির নৈসর্গিক দৃশ্য তাঁর পছন্দ হয়। তিনি এখানে খানকা স্থান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খানকার ভক্তবৃন্দ এখানে এসে দীক্ষা নিত। ক্রমে ক্রমে এ জনশূণ্য স্থান বিরাট জনবসতি ও মোকাম প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিন 'মানিক শাহ' তাঁর ভক্তবৃন্দের নিকট ধামরাই হয়ে সোনারগাঁও যাবার বাসনা প্রকাশ করে এবং সত্যিই তিনি খরস্রোতা ধলেশ্বরী পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁর শিষ্যদের গানে এ বিষয়টি পাওয়া যায়-

মানিক শাহ দরবেশ ছিল,
ধল্লা গাং পড়াইয়া গেল,
সিন্ধুকে বিন্দু হইল তাজা
ও তাতে ধল্লাগাং হইল বাজা।[৩]

ত্রৈমাসিক 'ঋতু রং মন' পত্রিকায় "মানিকগঞ্জের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে কবি মুফাখখারুল ইসলাম সম্ভবত: এ দরবেশের কথাই উল্লেখ করেছেন-

"মানিক সাধু চইল্যা গেল
খালিগঞ্জ পড়ে রইলো।"[৪]

মানিকশাহ চলে গেলেও তাঁর খানকা এবং তৎসংলগ্ন মোকাম বা গঞ্জ পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারেই যে মানিকগঞ্জ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। উক্ত খানকা ও তৎসংলগ্ন খানকা নদীতে বিলীন হয়ে যায়।

(খ) কেউ কেউ মনে করেন দূর্ধর্ষ পাঠান সরকার মানিকঢালীর নামানুসারে মানিকগঞ্জ নামের উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, শেরশাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুরী বংশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক শক্তির অবনতিতে মোঘলদের পুণরুত্থান এবং মোঘল আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বহু পাঠান সৈনিক স্ত্রী-পুত্রসহ বাংলার মধ্যপাঠ অঞ্চলে আশ্রয়গ্রহণ করে। মানিকঢালী সম্ভবত এদেরই একজন হবেন। পাইক, বরকন্দাজ সহ তিনি এ অঞ্চলে এসে প্রভাব বিস্তার

---

৩. মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজহার), *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ: মানিকগঞ্জের লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৯, পৃ. ১৩-১৪

৪. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪*

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং পরবর্তীতে তারই নামানুসরে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ হয়ে থাকবে।

(গ) আবার কেউ মনে করেন মানিক চাঁদ এর নামানুসারে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ করা হয়ে থাকবে। মানিকচাঁদ নবাব সিরাজউদৌল্লাহর বিশ্বাসঘাতকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে বাংলার নবাব দরবারের গোপন তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সাথে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন। ইংরেজদের প্রতি মানিক চাঁদের বিশ্বাস দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ও একনিষ্ঠ সেবার কথা ইংরেজগণ ভুলে নি। তাই প্রশাসনিক প্রয়োজনে জেলাকে যখন মহকুময় বিভক্ত করা হয় তখন কোম্পানীর ফাইল ঘেটে ভক্ত মানিক চাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার নামানুসারেই। মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ করা হয়।[৫]

উপরোক্ত তিনটি পটভূমি স্থানীয় জনশ্রুতি এবং অনুমান ভিত্তিক। এ ব্যাপারে সরাসরি কোন দলিল দস্তাবেজ অথবা ঐতিহাসিক প্রতিবেদন এ যাবৎ হস্তগত হয়নি। তবে 'মানিক শাহ' এর নামানুসারে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ জনশ্রুতি এবং ঘটনা প্রবাহের যে চিত্র ও ধারণা পাওয়া যায় তাই যুক্তি-যুক্ত বলে মনে হয়।

মহকুমা ঘোষণা

ইংরেজ শাসক কর্তৃক ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রথমে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট ফরিদপুর জেলার অধীনে ছিল এবং প্রশাসনিক জটিলতা। নিরসনকল্পে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুর জেলা হতে কেটে ঢাকা জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মানিকগঞ্জ মহকুমার আয়তন বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে আটিয়া (বর্তমান টাঙ্গাইল), ১৮৮০/৮১ খ্রিস্টাব্দে ধামরাই সভার ও সুয়াপুর মানিকগঞ্জ মহকুমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মানিকগঞ্জে একটি কোর্ট, ৬৮ জন নিয়মিত পুলিশ অফিসার, ৪০ জন নিয়মিত সিগন্যাল ফোর্স এবং ৭৬৯ জন গ্রাম পাহারাদার বা চৌকিদার ছিল।[৬] মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার লগ্নে তিনটি রাজস্ব থানায় বিভক্ত ছিল।

১) মানিকগঞ্জ
২) জাফরগঞ্জ
৩) হরিরামপুর

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

৬. শ্রী শ্রী কুমার কুন্ডু, *মানিকগঞ্জঃ ইতিকথা/ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ সুহৃদ সম্মিলনী স্মরণিকা, ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী সময়ে বৃটিশ সরকার প্রশাসনিক প্রয়োজনেই বৃহৎ মানিকগঞ্জ ও শিবালয় (প্রতিষ্ঠালগ্নে জাফরগঞ্জ) রাজস্ব থানা ভেঙ্গে অতিরিক্ত চারটি নতুন থানার সৃষ্টি করে। ফলে থানার সংখ্যা বেড়ে সাত এ উন্নীত হয়-

১) মানিকগঞ্জ
২) সাটুরিয়া
৩) সিংগাইর
৪) শিবালয়
৫) ঘিওর
৬) দৌলতপুর এবং
৭) হরিরামপুর

জেলা ঘোষণা

অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে হুসেইন মোঃ এরশাদের সামরিক সরকার দেশের প্রশাসনিক পুণর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সিদ্ধান্তের আলোকে সকল মহকুমাকে জেলায় এবং থানাগুলোকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। মানিকগঞ্জ বাংলাদেশের জেলা হিসেবে গণ্য হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ থেকে। মানিকগঞ্জ স্টেডিয়ামে এক বিরাট জনসভায় মেজর জেনারেল এম.এ.মুন মানিকগঞ্জকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রথম জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন জনাব এম. জি. মর্তুজা।[৭]

মানিকগঞ্জ জেলা সর্বমোট ৬৬ টি ইউনিয়ন ও ২ টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। নিচে থানা ওয়ারী ইউনিয়নগুলোর তালিকা দেয়া হলঃ

---

৭. বিস্তারিত দ্রঃ মোঃ আযহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শত মানিক*, মানিকগঞ্জ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৫, পৃ. ০৩-১৫

Dhaka University Institutional Repository

১। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা : ইউনিয়ন ১০ টি (পৌরসভাসহ)

ক) মানিকগঞ্জ পৌরসভা
খ) গড়পাড়া
গ) দীঘি
ঘ) জাগীর
ঙ) কৃষ্ণপুর
চ) বে তিলা-মিতরা
ছ) নবগ্রাম
জ) পুটাইল
ঝ) ভাড়ারিয়া
ঞ) হাটীপাড়া

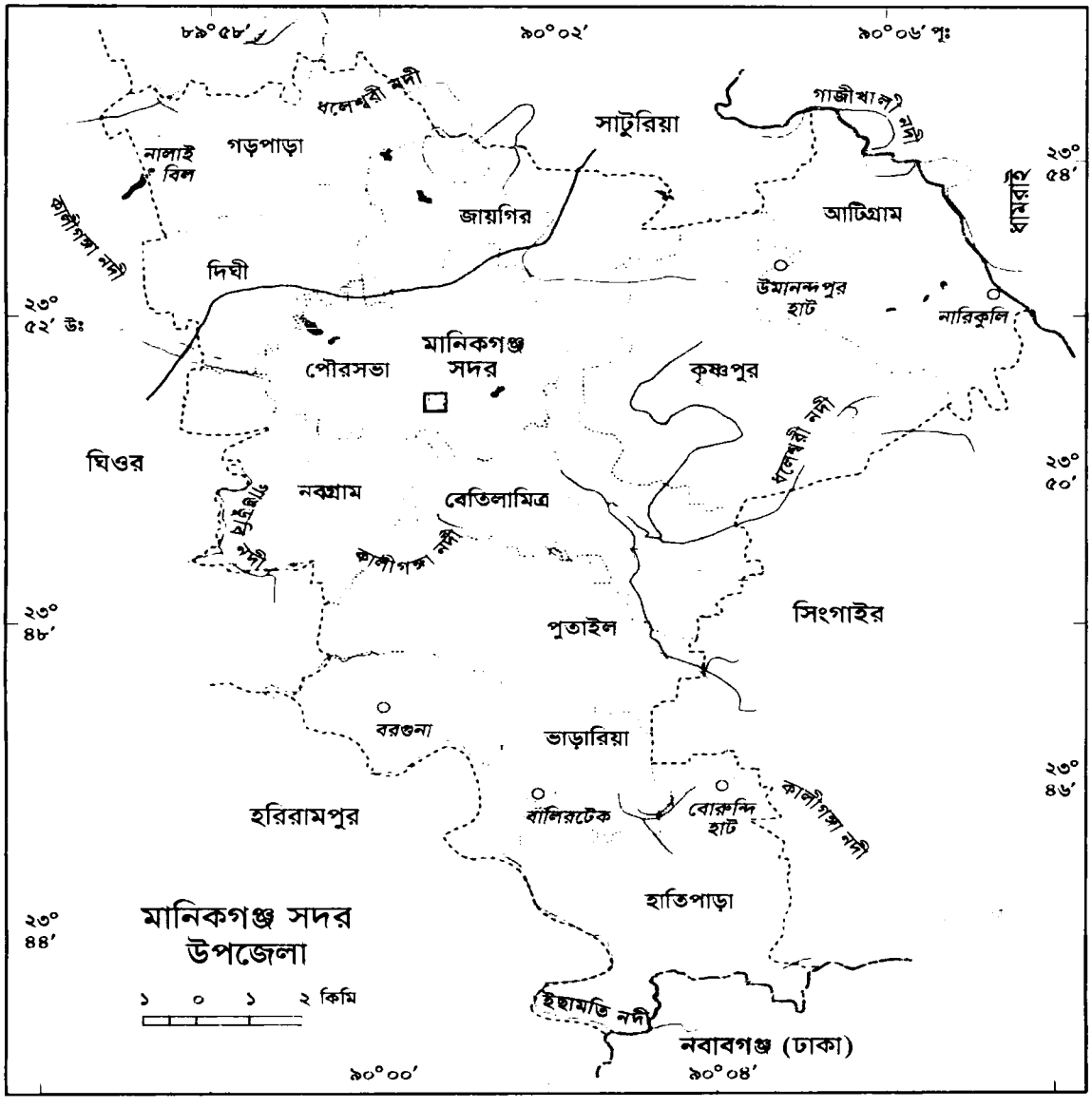

Dhaka University Institutional Repository

২। সিঙ্গাইর উপজেলা : ইউনিয়ন ১১ টি; পৌরসভা ১টি

ক) বায়রা
খ) তালেবপুর
গ) সিঙ্গাইর পৌরসভা ও ইউনিয়ন
ঘ) জয়মন্টপ
ঙ) ধল্লা
চ) শায়েস্তাপুর
ছ) চারিগ্রাম
জ) বলধরা
ঝ) জামশস
ঞ) জামির্তা
ট) চান্দহর

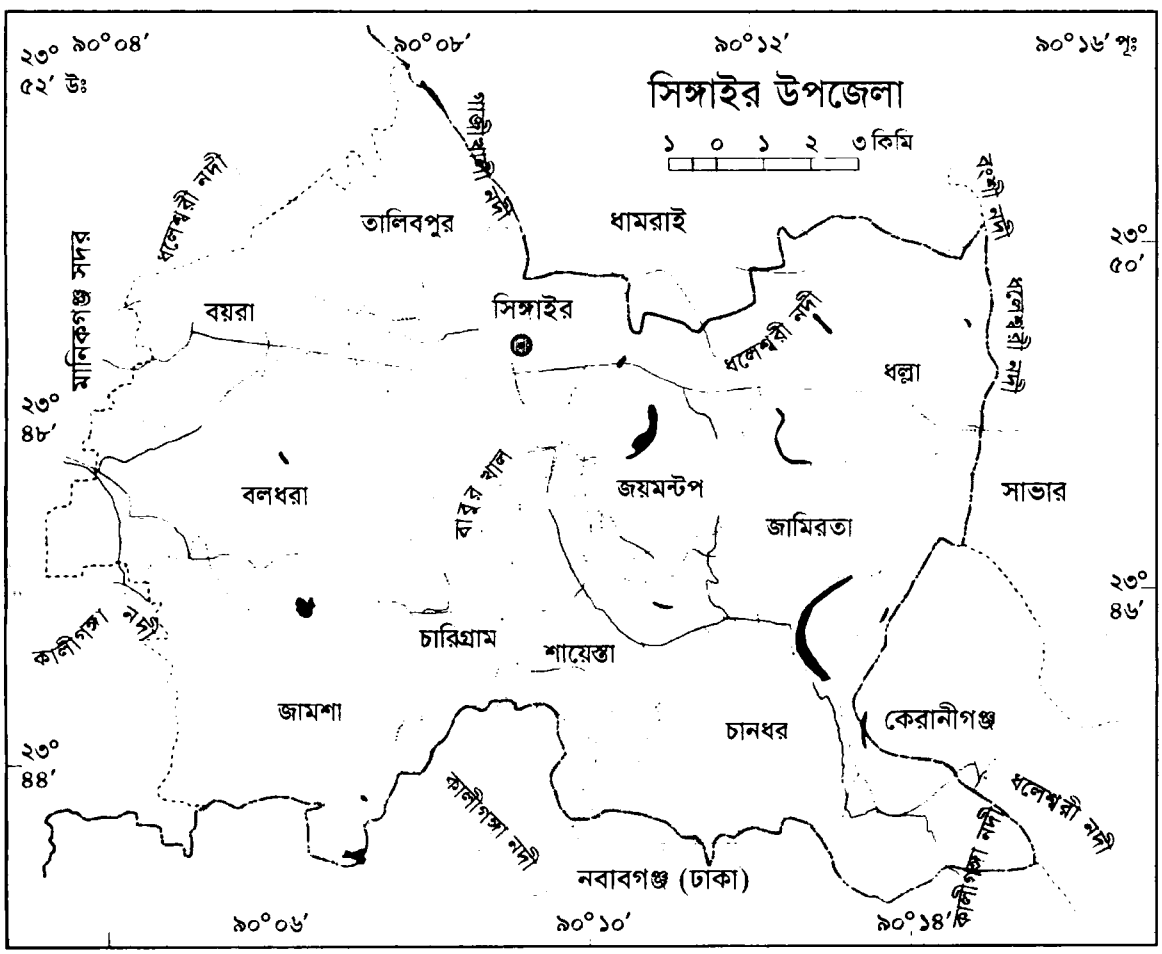

Dhaka University Institutional Repository

৩। সাটুরিয়া উপজেলা : ইউনিয়ন ১০ টি

ক) বরাইদ
খ) দিঘুলিয়া
গ) বালিয়াটি
ঘ) দরগ্রাম
ঙ) তিল্লি
চ) হরগজ
ছ) সাটুরিয়া
জ) ফকুরহাটী
ঝ) ধানকোড়া
ঞ) আটিগ্রাম

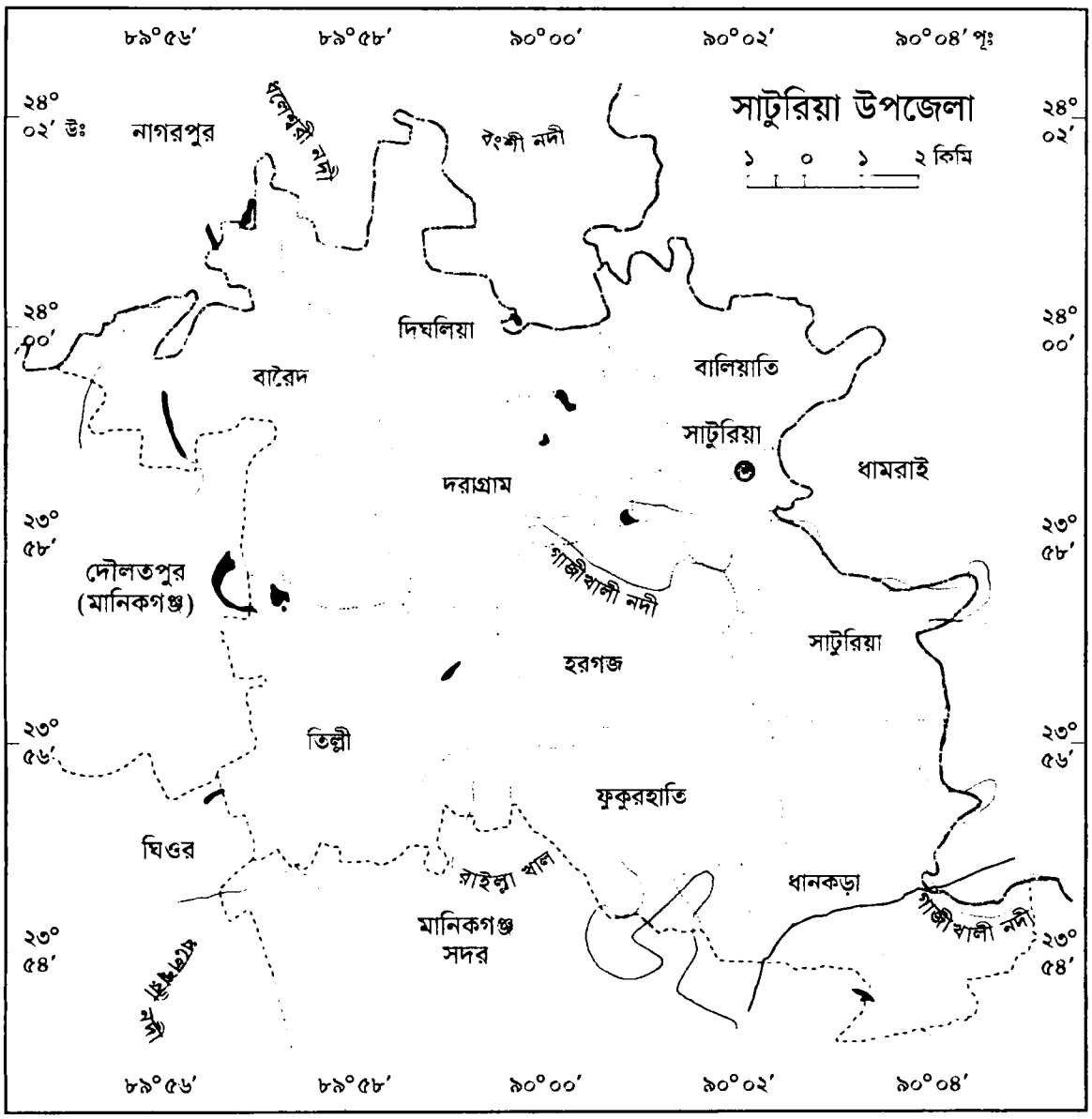

Dhaka University Institutional Repository

৪। ঘিওর উপজেলা : ইউনিয়ন ৭টি

ক) ঘিওর
খ) পয়লা
গ) সিংজরী
ঘ) বারটিয়া
ঙ) বালিয়াখোড়া
চ) বানিয়াজুরী
ছ) নালী

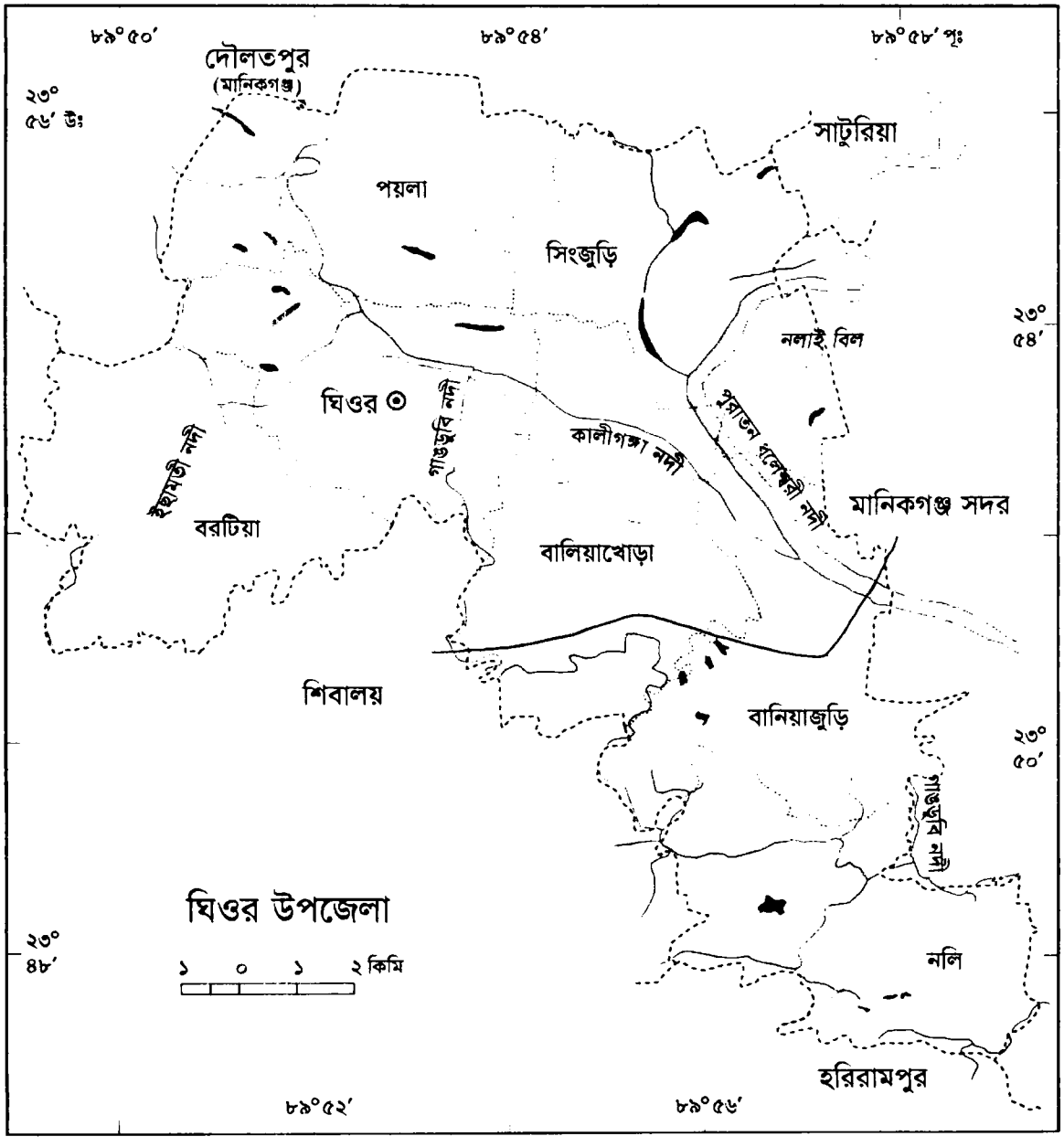

Dhaka University Institutional Repository

৫। দৌলতপুর উপজেলা : ইউনিয়ন ৮টি

ক) চরকাটারি

খ) বাচামারা

গ) বাঘুটিয়া

ঘ) খলসি

ঙ) জিয়নপুর

চ) চকমিরপুর

ছ) কালিয়া

জ) ধামশর

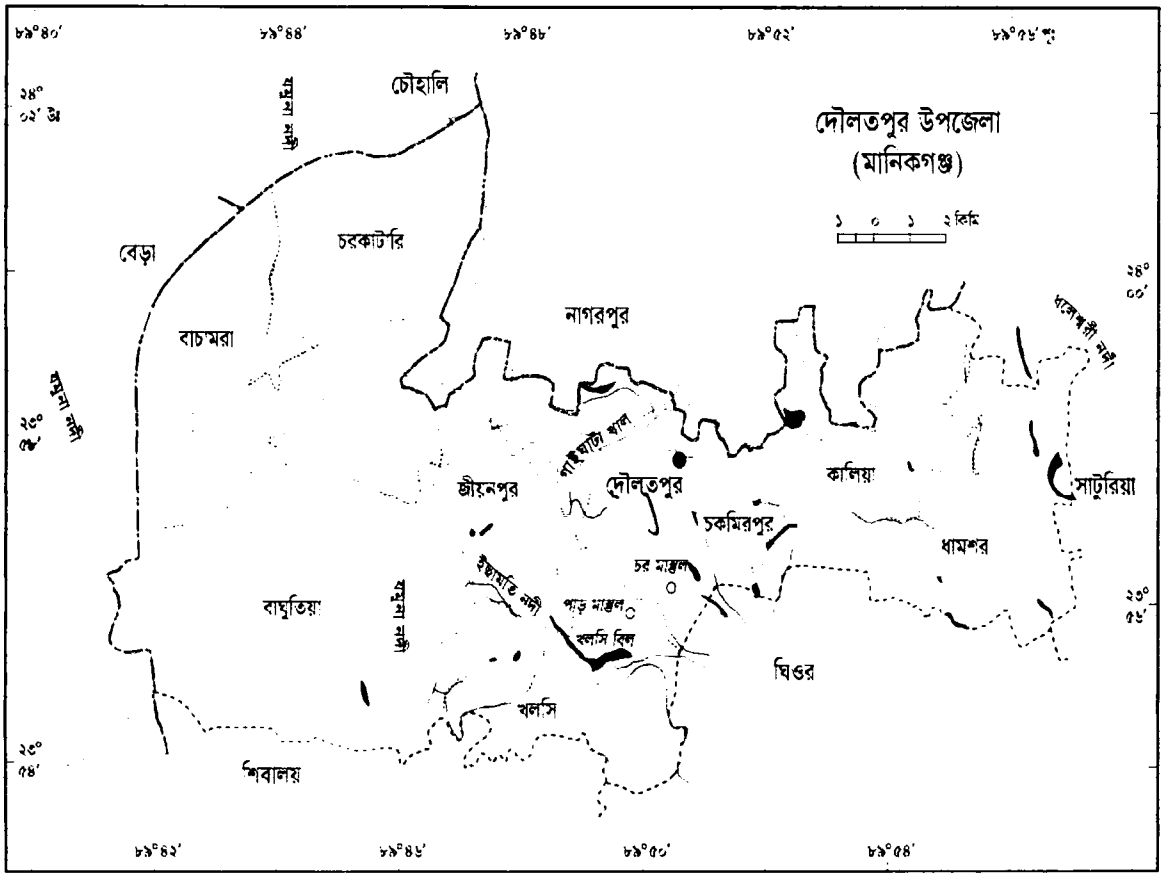

Dhaka University Institutional Repository

৬। হরিরামপুর উপজেলা : ইউনিয়ন ১৩ টি

ক) বাল্লা
খ) গালা
গ) কাঞ্চনপুর
ঘ) গোপীনাথপুর
ঙ) রামকৃষ্ণপুর
চ) চালা
ছ) লেছরাগঞ্জ
জ) বয়রা
ঝ) বলড়া
ঞ) হারুকান্দি
ট) সুতালরী
ঠ) আজিমনগর
ড) ধুলসুরা

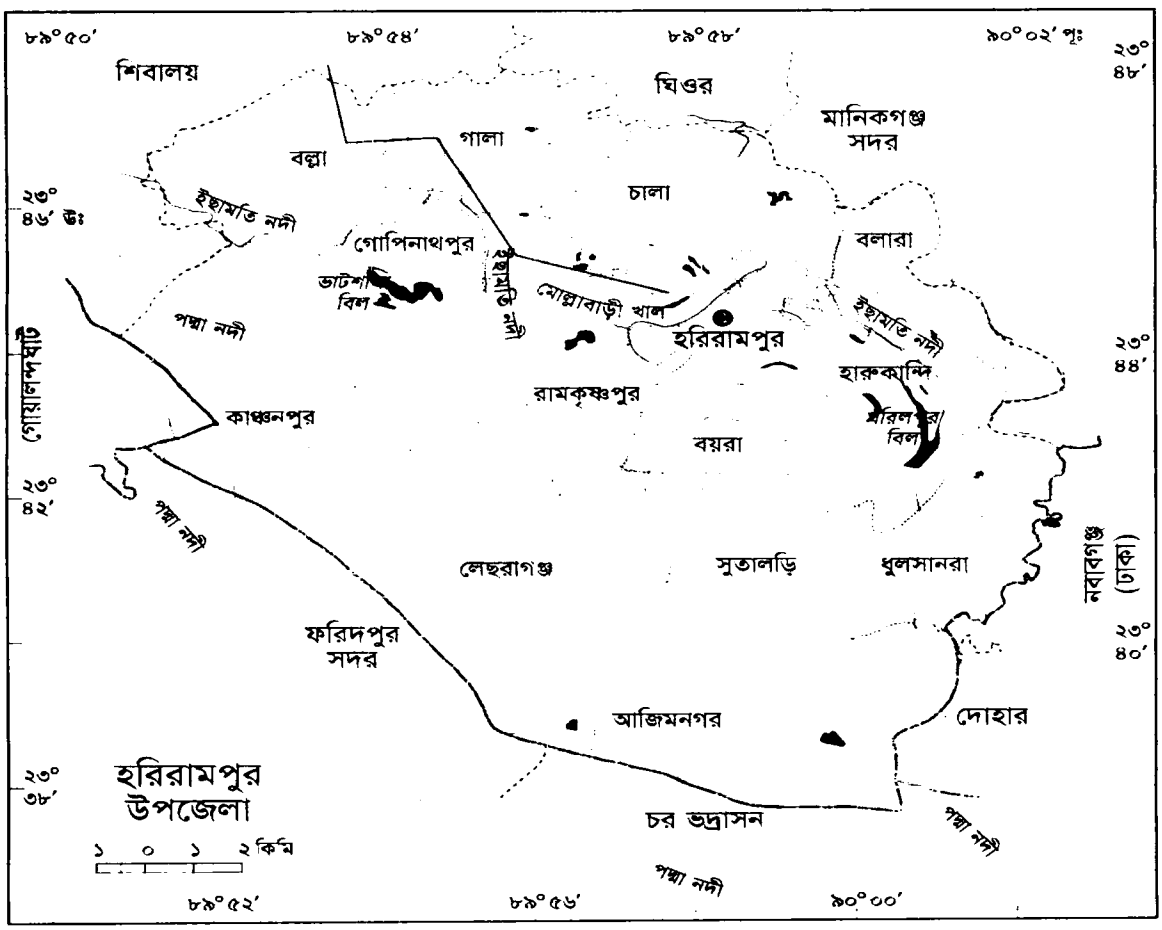

Dhaka University Institutional Repository

৭। শিবালয় উপজেলা : ইউনিয়ন ৭ টি

ক) তেওতা

খ) শিবালয়

গ) উথলি

ঘ) উলাইলা

ঙ) আড়ুয়া

চ) মহাদেবপুর

ছ) শিমুলিয়া

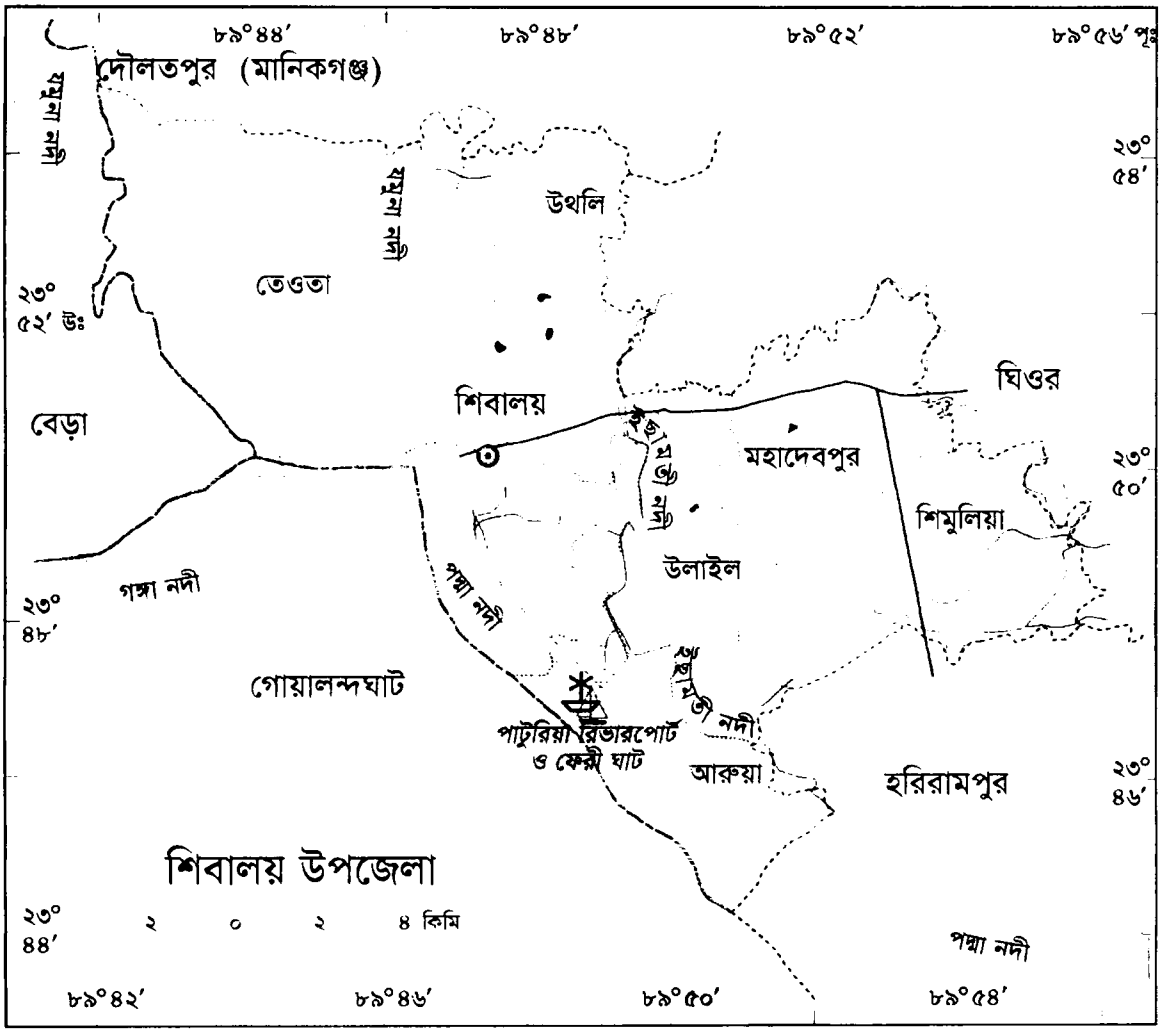

Dhaka University Institutional Repository

মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম ও ইসলাম প্রচারে কতিপয় মনীষী

১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বৃহত্তর মানিকগঞ্জ এলাকায় বাধ-ভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় মুসলমানদের আগমন ঘটতে থাকে। মধ্য এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আফগান, তুর্কি ও মুঘল সৈন্যদের সাথে ব্যবসায়ী এবং ধর্মপ্রচারকদের মানিকগঞ্জের বিভিন্ন জনপদে আগমন ঘটে এবং তাদের অনেকেই স্থানীয় রমনীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন গ্রামে বসতি গড়ে তুলেন। আর তৎকালীন সময়ে নদীপথই যেহেতু ছিল যোগাযোগের মাধ্যম সেহেতু প্রাচীন ইছামতি তীরবর্তী অঞ্চলেই অধিক হারে মুসলমানরা নিবাস গড়ে তুলেন। পরবর্তীকালে বাদশাহী ফরমান বলে অনেকেই ভূখণ্ড প্রাপ্ত হয়ে মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেন। এ প্রসঙ্গে যাদের কথা উল্লেখ করা যায় তারা হলেন- দাদরোখির খান পরিবার, মাচাইনের মিঞা পরিবার, গৌর বিদ্যা গ্রামের শেখ পরিবার, বরাঠদের খান মজলিস পরিবার, গড়পাড়ার মীর পরিবার, পারিল এবং রামকান্তপুরের খান পরিবার, মকিমপুরের চৌধুরী পরিবার, পিপুলিয়ার মিঞা পরিবার, জামির্তার সৈয়দ পরিবার, বাড্ডা ও বাইমালের দেওয়ান পরিবার, তেরশ্রীর ছিদ্দিক পরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব বংশধারা কতক অংশ পরিবারসহ এ ভাটি অঞ্চলে স্থায়ী নিবাস প্রতিষ্ঠা করেন এবং কতক অংশ স্থানীয় রমনীদের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এসব পরিবারের ইসলামী সভ্যতা সাংস্কৃতি উদার ন্যায়নীতির সাথে পরিচিত হয়ে নির্যাতিত নিম্ন বর্ণের হিন্দু সমাজ এবং সূফী সাধকদের জীবন কর্ম ও দর্শনের প্রভাবে অনেক উচ্চ হিন্দ বংশধর ইসলামের সুশিতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। ফলে ধীরে ধীরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় অনেক বনেদি হিন্দু পরিবার দেশ বিভাগের সময় হিন্দুস্তান তথা ভারতে চলে যায়। মানিকগঞ্জ জেলার কোন কোন অংশে হিন্দু সমাজের বসবাস আজ অবদি এটা প্রমাণ করে যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মানিকগঞ্জ জেলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরায়ত ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে ধারণ করে আছে। নিচে মানিকগঞ্জ জেলায় যারা ইসলাম প্রচারে অবদান রেখেন তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল-

১। মীর শাহ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী (রহ.)

হযরত শাহ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সওয়ার (রহ.) সমুদ্রপথে বাংলায় আসেন। এ দেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে যে সকল মুসল্লিগণ এদেশে আসেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

জনশ্রুতি আছে যে, তিনি ছিলেন বলখের সুলতান আগর শাহের পুত্র। পিতার ইন্তিকালের পর সুলতান মাহমুদ শাহ ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণে করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। মাহমুদ ধীরে ধীরে রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে পড়েন। এমনসময় একদিন তার এক কৃতদাসী তাঁর শয্যাগৃহ প্রস্তুত করতে গিয়ে,

Dhaka University Institutional Repository

শাহী বিছানায় কী আরাম তা অনুভব করার জন্যে তাতে শুয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে সুলতান এসে তাকে তাঁর নিজ শয্যায় শায়িত দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বেত্রাঘাত করতে থাকেন। তিনি তাকে যতই মারেন, দাসী ততই হাসতে থাকেন। পরে তিনি সংযত হয়ে তার হাসির কারণ জানতে চাইলেন। ক্রীতদাসী বললো- এ বিলাস শয্যায় সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যে যখন এত শাস্তি, তখন সুলতানের সারা জীবনের আরাম আয়েশের জন্যে যে কত শাস্তি জমে আছে তার হিসাব কে রাখে? এ কথা শুনে তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হল। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি রাজকার্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং দুনিয়ার অসারতা উপলব্ধি করে মানসিক শান্তির প্রয়াসে পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাজ সিংহাসন ছেড়ে দামেশক চলে যান। সেখানে সেকালের বিখ্যাত সূফী-সাধক শায়খ তওফীকের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় দীক্ষিত হন। ছত্রিশ বছর পীরের খিদমতে কাটিয়ে দিয়ে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর মুর্শিদ তাঁকে তখন পূর্ব দিকে বঙ্গাল মুল্লুকে গিয়ে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন।

ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস, তিনি বলখের সুলতান ছিলেন বলেই তাকে 'শাহ সুলতান বলখী' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এ নামে বলখে বা তার আশেপাশে কোথাও শাসক ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সূফী দরবেশগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান রাজ্যের বাদশাহ। তাই তাদেরকে 'শাহ্' বলা হয়। আর 'সুলতান' শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে- দলীল বা প্রমাণ। সূফী দরবেশদের অধিকাংশ ওলীরা তাঁর নিজ মুর্শিদ কর্তৃক দলীল বা সনদ নিয়ে বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারের জন্যে প্রেরিত হতেন। এ হিসেবে তাদের বলা হয় সুলতান। এভাবেই তিনি 'শাহ সুলতান' উপাধীতে ভূষিত হন। আর যেহেতু তিনি বলখের বাসিন্দা ছিলেন তাই তাকে বলখী বলা হত।

সাধারণত লোকের ধারণা- তিনি মাছের পিঠে সাওয়ার হয়ে সমুদ্র পথে এ দেশে আসেন। তাই তাঁকে 'মাহী সাওয়ার' আখ্যা দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি মৎসাকৃতির বাণিজ্য জাহাজে চড়ে তৎকালীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সন্দীপে আসেন। এজন্য তাকে 'মাহী সাওয়ার' বলা হয়। মাহী অর্থ মাছের সাথে সম্পর্কিত।

সন্দীপে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি ঢাকা জেলার হরিরামপুর তথা মানিকগঞ্জে আসেন। হরিরামপুর তখন জনবহুল ও সুরক্ষিত ছিল। সে সময় হরিরামপুরে বলরাম নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন কালীর উপাসক। তার অত্যাচারে প্রজাবর্গ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই উৎপীড়নের কথা শুনেই 'সুলতান মাহমুদ বলখী' সন্দীপ থেকে ঢাকায় আসেন (বর্তমান মানিকগঞ্জ)। তিনি সরাসরি বলরামের কালী মন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরের মধ্যে ছোট বড় বহু দেব-দেবীর মুর্তির মধ্যে এক বিরাট কালী মূর্তি স্থাপিত ছিল। মন্দিরে পৌঁছেই তিনি আযান দিলেন। কথিত আছে যে, আযান দেয়ার সাথে সাথে পাথর ও মাটির মূর্তিগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল। এ অলৌকিক ঘটনা দর্শনের জন্য বহু লোক সমবেত হল। এ খবর রাজার কানে গেলে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তার সেনাবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু সেনাবাহিনী দরবেশের কোন ক্ষতি করতে পারলো না। তখন রাজা নিজে আরও সেনাবল নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং তার মন্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রক্ষা পান। শাহ সুলতান বলখী (রহ.) তাকেই এ অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে তাওহীদ প্রচারে নিয়োজিত হলেন।

এখানে অবস্থানকালেই তিনি বগুড়ার মহাস্থানগড়ের অত্যাচারী শাসক পরশুরামের কথা শুনতে পান। রাজার অধীনস্থ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ করে বৌদ্ধদের প্রতি তাঁর উৎপীড়ন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। মহাস্থানের এ অত্যাচার কাহিনী শুনে সুলতান মাহমুদ বলখী (রহ.) হরিরামপুর থেকে মহাস্থানে চলে গেলেন। শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সাওয়ার ৪৩৯ হিজরী মুতাবিক ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে মহাস্থানে এসেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এর কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে তিনি এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই আসেন ও ইসলাম প্রচার করেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। [৮]

২। হযরত গাজীউল মুলক ইকরাম ইব্রাহিম বোগদাদী শাহ (রহ.)

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বঙ্গ বিজয়ের পর এয়োদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হযরত শাহ্জালাল (রহ.)-এর সফরসঙ্গী (১২১৪ খ্রি.) বিখ্যাত দরবেশ হযরত গাজীউল মূলক ইকরামুল হক ইব্রাহিম বোগদাদী শাহ (রহ.) সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রামে আগমন করেন ও খানকা প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম প্রচার করেন। স্থানীয় অগণিত নারী-পুরুষ ভক্ত তাঁর নিকট ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হন। উক্ত দরবেশের মাজারে তার সঙ্গে আনীত বড় বড় পাথর খণ্ড এখনও আছে। মাজারের সমাধিগাত্রে উৎকলিত শিলালিপি হতে তাঁর পরিচয় ও আগমন তারিখ জানা যায়। নিঃসন্দেহে উক্ত মাজার শরীফই সমগ্র মানিকগঞ্জ জেলার সর্ব প্রাচীন মুসলিম পুরাকীর্তি।

৩। হযরত শাহ রুস্তম

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শাহ রুস্তম অন্যতম। তাঁর সমাধিস্থল হরিরামপুর উপজলার মাচাইন গ্রামে। বাংলার বিখ্যাত হোসেন শাহী বংশের খ্যাতিমান সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ এর রাজত্বকালে তিনি মানিকগঞ্জ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আগমন করেন। তিনি সর্বদাই একটি মাচার উপর বসতেন। ইছামতির তীরে অবস্থিত হলেও তাঁর আগমনের সময় কোশী তিস্তার স্রোতধারা অবলম্বন করে প্রাচীন ভুবনের নদী প্রবাহমান ছিল বলে জানা যায়। মাচাইন গ্রামের তাঁর মাজার শরীফ ও ত্রিগম্বুজ বিশিষ্ট একটি আকর্ষণীয় শিল্পমণ্ডিত মসজিদ রয়েছে। শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটি ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে রিফাত হোসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

---

৮. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ", *অগ্রপথিক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, সংখ্যা-ফেব্রুয়ারী'৮৯, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

৪। হযরত দানেস্ত শাহ (রহ.)

হযরত দানেস্ত (রহ.) সুলতানী আমলেই নদী পথে তৎকালীন বিখ্যাত গঞ্জ হরিরামপুরে এসেছিলেন। তিনি প্রথমে দানেস্তপুরে খানকা স্থাপন করেন এবং ব্যাপকভাবে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। পরে তিনি কুতুবী শিমুলীয়ায় খানকা স্থাপন করেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন এবং এখানেই তার মাজার শরীফ অবস্থিত। দানেস্ত নগরের হালী তাঁরই স্মৃতি বহন করে।

৫। হযরত হায়দার শেখ (রহ.)

ইলিচপুরের কাছে দরবেশ হায়দার শেখের দরগা অবস্থিত। ইলচপুরসহ উক্ত দরগাহটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পদ্মা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্র হতে তাঁর অবস্থান নির্মিত হয়। শিলালিপি অনুযায়ী তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে পারস্যের নিশাপুর হতে দিল্লী হয়ে গৌড় এবং জীবন সায়াহ্নে পদ্মার তীরবর্তী এই স্থানে আগমন করেন। যাত্রাপুর গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত।

৬। সৈয়দ সুলায়মান বুখারী (রহ.)

তাঁর আগমন সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, কোদালিয়ার হাট এর বিরাট বটগাছের নীচে তাঁর আস্তানা ছিল।[৯]

৭। হযরত শাহ মুখদম রুপস (রহ.)

তিনি শাহ্ রুস্তম এর সমসাময়িক। দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার পথে রূপসা গ্রামে যাত্রাবিরতি করে এই স্থানেই খানকা প্রতিষ্ঠা করত: ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর উক্ত স্থান হতে তিনি রাজশাহী গমন করে সেই অঞ্চলের প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার এবং কুআচার দূর করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। রাজশাহীতে তাঁর সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলে তিনি সত্যিকার ইসলামের বীজ বপন করেন। তাঁর ব্যবহারে সততা, চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়ে তিনি স্থানীয় বাসীদের মন জয় করেন।[১০]

৮। সৈয়দ এনায়েত শাহ (রহ.)

১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সৈয়দ এনায়েত শাহ হরিরামপুরের এনায়েতপুরে আসেন। তাঁর নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম এনায়েতপুর রাখা হয়। যা আজ কালের বিবর্তন পদ্মার মধ্যে বিলীন। তৎকালীন হরিরামপুরের অজ্ঞাত ও অখ্যাত সামন্ত রাজা 'রামকৃষ্ণ সেন' নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বিশেষ করে মুসলিম প্রজাদের প্রতি ছিল নির্মম অত্যাচারী ও কঠোর।

---

৯. বিস্তারিত দ্র: মোঃ আযহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের শতমানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-২৫

১০. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পা.), *অগ্রপথিক সংকলন*, "আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম", ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই, ২০০৪, পৃ. ৬৯-৭০

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের আজমীর হতে আগমন করে সৈয়দ এনায়েত শাহ (রহ.) অত্যাচারিত অসহায় এসব মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং সশস্ত্র যুদ্ধে রাজা রামকৃষ্ণ সেনকে পরাজিত করেন। বর্তমানের 'রামকৃষ্ণপুর' হয়ত বা সেই সামন্ত রাজারই স্মারক।

৯। হযরত রসূল শাহ (রহ.)

হযরত রসূল শাহ (রহ.) ইরাকের বাগদাদ নগরী হতে এসে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার ধানকোড়া ইউনিয়নের বরুনি গ্রামে এসে অবস্থান নেন। এ স্থানে ইসলাম প্রচারের সুবিধার জন্য একটি সুসজ্জিত খানকা নির্মাণ করেন, যা বাগদাদের স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় বহন করে। কিন্তু এতে কোন স্মারকলিপি না থাকায় তাঁর আগমনের কাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না।

১০। হযরত শাহ সৈয়দ মতিউল্লাহ (রহ.)

১৭শ শতকের শেষার্ধে হতে ১৮শ শতকের প্রথম দিয়ে সৈয়দ মতিউল্লাহ (রহ.) মানিকগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। তিনি ধামরাই টোপের বাড়ী পীর বংশের পূর্ব পুরুষ।

১১। শাহ আব্দুল গণি (রহ.)

গড়পাড়া ইউনিয়নের আলীনগর গ্রামে এক খানদানী পরিবারে ১৮৪০ সালে শাহ আব্দুল গণি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। শাহ আব্দুল রহমানের হাতে বায়াত হয়ে তিনি কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং একজন কামিল ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

১২। শাহ্ আব্দুর রহমান (লাল মিয়া) (রহ.)

শাহ আব্দুর রহমান ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে গড়পাড়া আলীনগর গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেন। তিনি মুজাফ্ফরপুরের বিখ্যাত পীর হযরত সৈয়দ শাহ এমদাদ আলী আল কাদরী (রহ.)-এর হাতে বায়াত হয়ে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পীর তাঁর সাধনায় খুশি হয়ে তাঁকে খিলাফত দিয়ে নিজ বাড়ীতে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এখানেই তিনি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় বহু কিতাব রচনা করেন। এর মধ্যে শরফুল ইনসান তাসাউফ পান্থীদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

১৩। হযরত শাহ খলিলুর রহমান (রহ.)

তিনি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিহারের মুজাফফরপুর মহকুমার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি তাঁর পিতাকে হারান। তিনি তাঁর পিতার খলিফা শাহ্ আব্দুল গণি (রহ.)-এর হাতে বায়াত হয়ে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। গড়পাড়া হাটখোলা ময়দানে সপ্তাহব্যাপী তাঁর ইসলামী সম্মেলন বিশেষভাবে বাংলার মুসলিম সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। শাহ সূফী সৈয়দ মুহাম্মদ হোসেন (রহ.)

তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সিংগাইর থানার জামির্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম পীর ছিলেন মুশুরীখোলার পীর হযরত শাহ আহসান উল্লাহ (রহ.)। এরপর তিনি পীরের নির্দেশে ডেঙ্গার পীর হযরত আব্দুল ওয়াহাব (রহ.)-এর হাতে মুরিদ হন। তিনি সুপণ্ডিত হিসেব পরিচিত ছিলেন। মানব সেবায় তিনি যারপরনাই আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। ঢাকার রায়ের বাজার এলাকার পুল পাড়ের মসজিদটি তিনি তৈরী করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তিকালের পর এ মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

১৫। হযরত শাহ্ সৈয়দ মফিজউদ্দিন আহমেদ (রহ.)

মানিকগঞ্জ শহরে দুধ বাজারের কাছে যে মাযারটি অবস্থান তাতে ঘুমিয়ে আছেন সূফিকুল শিরোমণি দরবেশ শাহ্ সৈয়দ মফিজউদ্দিন আহমেদ (রহ.)। ধামরাই উপজেলার টেপর বাড়ী পীর বংশে বাংলা ১৩০১ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবান এবং বাকশিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি বাংলা ১৩৫৬ বাংলা সনের ১৬ই চৈত্র মানিকগঞ্জে ইন্তিকাল করেন।

১৬। খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন খান

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মানিকগঞ্জ মহকুমার মুসলমানদের অবস্থা ছিল চরম দুদর্শাগ্রস্থ। শিক্ষা-দিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার তেমন কেউ ছিলেন না। এমনই এক সময় তিনি মানিকগঞ্জ জেলায় মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার দায়িত্ব নিজ কাধে তুলে নেন। মুসলমানদের জাগ্রত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মানিকগঞ্জ শহরে মহররমের মিছিল বের করেন। তিনি ঘোষণা দিলেন- মুসলমানদের বাঁচার তাগিদে এক হয়ে একই সাথে ইংরেজ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। তাই বলে তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বিহারে মুসলিমদের উপর হিন্দুদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের জের ধরে সারা পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। তখনও খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন বদৌলতে মানিকগঞ্জ হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা মুক্ত এলাকা হিসেবে সুপরিচিত লাভ করে। তিনি কোন পীর বা ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মানিকগঞ্জ মুসলিম অধিবাসীদের প্রিয়পাত্র। মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসরের জন্য তিনি ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন।

(ক) খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন খান উচ্চ বিদ্যালয়

(খ) খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন খান ডিগ্রী কলেজ

(গ) তেরশ্রী কলেজকে বহু দেন দরবার করে তিনি মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজে রূপান্ত রিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। হযরত মাওঃ মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)

তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তেরশ্রীর সম্ভ্রান্ত সিদ্দিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাল থেকেই তিনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি লালায়িত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি জীবনের যে দিকেই গিয়েছেন সফলতার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছেন।

মানিকগঞ্জ জেলায় ইসলাম প্রচারে তিনি ব্যাপক অবদান রাখেন। শুধু মানিকগঞ্জ নয় বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর জীবন দর্শন আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত। ইসলামের সুমহান সাক্ষ্যের বাণীই তিনি জীবনভর প্রচার করছেন। ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদে হিন্দুদের হামলাকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় মানিকগঞ্জের হিন্দু-মন্দির ভাঙ্গার জন্য সর্বস্তরের মুসলিমগণ একত্রিত হলে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা থেকে এ এলাকাটি রক্ষা পায়। এজন্য তিনি সকলের চোখেই ছিলেন একজন আদর্শ মানব।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর

জীবন দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর জীবন দর্শন

বংশ পরিচয়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর বংশ পরিচিতি সম্পর্কিত তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

তাঁর প্রপিতামহের নাম হেলাল উদ্দিন। পিতামহ ডাক্তার আব্দুল জব্বার ছিলেন বিলেত ফেরত একজন শল্য চিকিৎসক যিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। পিতামহী ছিলেন একজন কাশ্মিরী রমণী। পিতামহের বাসস্থান ছিল বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলাধীন 'বাদে হালালিয়া' নামক সবুজে ঘেরা ছোট্ট একটি গ্রামে। ডাক্তার আব্দুল জব্বারের ৫ (পাঁচ) পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের মধ্যে তিন পুত্রই ছিলেন ডাক্তার। ফলে বাদে হালালিয়ায় তাদের বাড়িটি আজও 'ডাক্তার বাড়ী' নামে বিশেষ পরিচিত।

আর পিতা মাওলানা নাসিমুজ্জামান আজহারী[১] তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি ছেড়ে মানিকগঞ্জ[২] জেলার বর্তমান ঘিওর থানাধীন তেরশ্রীর ছোট পয়লাতে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। তিনি জীবনের শেষ অবধি তেরশ্রী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ফার্সী ভাষায় তাঁর গভীর দখল ছিল বলে জানা যায়। এ ভাষায় কবিতা রচনাতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। একজন খাঁটি মুমিন ও মুত্তাকী মুসলিম হিসেবে তিনি অত্র এলাকার সর্বস্তরের মানুষের নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন।[৩] নিম্নে ছকের মাধ্যমে মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকীর সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা তুলে ধরা হল–

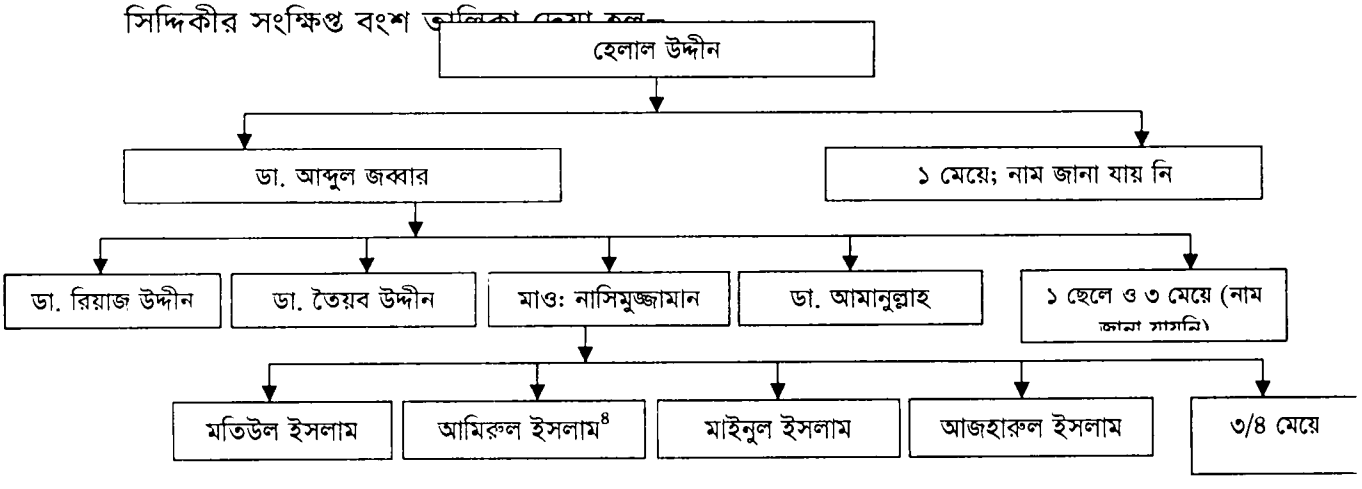

১. তিনি মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চ শিক্ষার পাঠ সম্পন্ন করেন।

২. তৎকালীন বৃহত্তর ঢাকা জেলা।

৩. এলাকার জনৈক প্রধানের অভিমত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকীর মাতার নাম মালেকা ছিদ্দিকা। মাতার বংশের গোড়ার দিকে ইসলামের প্রথম খলিফা সিদ্দিকে আকবার হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে সংযুক্ত।[৪] মাতুল মাওলানা আব্দুল শাকুর ছিলেন অতিশয় আল্লাহভীরু। তাঁর লজ্জা, সরলতা নিয়ে নিজ এলাকায়[৫] আজও নানা রকম জনশ্রুতি রয়েছে। নিম্নে মাওলানার মাতার দিকের বংশ তালিকা দেয়া হল–

১। মালেকা ছিদ্দিকা
২। মাওলানা আব্দুশ শাকুর
৩। মুজাফফর আনী
৪। এনাম বক্স
৫। মুহাম্মদ সাঈদ
৬। মুহাম্মদ হাফিজ
৭। মুহাম্মদ নাসির
৮। আব্দুন নবী
৯। আবু তুরাব
১০। মুহাম্মদ আবু হোসেন
১১। মুহাম্মদ আতিক
১২। মুহাম্মদ সায়াদ উদ্দীন
১৩। হামিদ উদ্দীন
১৪। আব্দুর রাজ্জাক
১৫। ইব্রাহীম
১৬। মুহাম্মদ জাহিদ
১৭। মুহাম্মদ হুসাইন
১৮। মুহাম্মদ আবুল কাসিম
১৯। মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন
২০। খাজা গরীবে নেওয়াজ সুলতানুল হিন্দ মইনুদ্দীন ছাত্তারী (রা.)
২১। আব্দুল মজিদ মান্দার শরীফদার
২২। শরীফ জেন্দানিয়া জেন্দান
২৩। আবুল ইক্কল কুদ্দুস
২৪। ইউসুফ আহমেদ
২৫। আব্দুল আজিজ
২৬। আবুল কাসিম
২৭। আব্দুল্লাহ

---

৪. পারিবারিক সূত্রে ডা. সাইফুল ইসলাম (এম.বি.বি.এস) বর্তমানে সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিক্যাল অফিসার সার্জারী কনসালট্যান্ট পদের বিপরীতে কর্মরত।

৫. বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলার বর্তমান নাগরপুর থানাধীন পাইশানা গ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

২৮। জুনাইদ বাগদাদী
২৯। আবুল হুসাইন সাররী সাখতি
৩০। মাসুদ খিলদানি
৩১। রোকন উদ্দীন
৩২। সুলাইমান
৩৩। আইনুদ্দীন
৩৪। আবু আহমাদ
৩৫। কাসিম
৩৬। আব্দুর রহমান
৩৭। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)

জন্ম ও শৈশব

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগীতায় মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার তেরশ্রী বাজারসহ ৪টি গ্রামের ঘুমন্ত মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এবং পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে ৪৩ জন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে ।[৬] যে দিনটি আজও শ্রদ্ধার সাথে 'তেরশ্রী দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সেই তেরশ্রীর ছোট পয়লা গ্রামে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে[৭] মাওলানা মুহাম্মদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) জন্ম গ্রহণ করেন।

শৈশব

মাওলানার শৈশব অতিবাহিত হয় তাঁর পিত্রালয়ে। বিচক্ষণ পিতার বন্ধুত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধান ও দ্বীনদার মাতার অকৃত্রিম স্নেহের আবেশে শরীর ও মনে পরিপুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠতে লাগলেন তিনি। সৃজনশীলতা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁর পরবর্তী জীবনের ভিত গড়েছিল শৈশবেই। এ সময় হতেই অন্যান্য শিশুদের তুলনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল লক্ষণীয়। অনুসন্ধিৎসু বালক আযহার এভাবেই কৈশোর পেরিয়ে তাঁর পরিণত জীবনের পথচলায় অগ্রসর হতে লাগলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

বিজ্ঞ পিতার নিকটই তাঁর কুরআন মাজীদ শিক্ষার হাতে খড়ি। এছাড়া সাধারণ বিষয়সমূহ পাঠদানের জন্য গ্রামের জনৈক পণ্ডিত মশাইকে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর তিনি নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন।

---

৬. দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ নভেম্বর ২০১০।
৭. মাওলানার মেঝ ভাই মুহাম্মদ আমীরুল ইসলাম সিদ্দিকী সূত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তেরশ্রী জমিদার হাইস্কুলে[৮] ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। বাল্যকাল হতেই তিনি খুঁজে বেড়াতেন তাঁর স্রষ্টাকে। যেহেতু একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পারিবারিক আবহে তাঁর বেড়ে উঠা তাই শৈশবের লালিত ধর্মীয় আদর্শেই স্রষ্টার সন্ধান পাবেন এ প্রত্যাশায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তীব্র আগ্রহবোধ করেন। এরপর মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার মাইষালোহা জাব্বারিয়া হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। এখান হতে মেধার স্বাক্ষর রেখে বার বছরের কোর্স মাত্র তিন বছরে সম্পন্ন করেন।

উচ্চ শিক্ষা

জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অদম্য পিপাসা। মহিষালোহা জাব্বারিয়া হাই মাদ্রাসা[৯] হতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে 'হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায়' পাশ করেন যা বর্তমানের ফাজিল সমমান। উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সে বছর ১৪,৫০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মাত্র ৪৭ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ভর্তি হন। এ সময়ে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দারুল উলূম মইনুল ইসলাম (হাটহাজারী) মাদ্রাসার উস্তাদগণের নিকট হতে উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেন।

কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধীনে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে একই বিভাগের অধীনে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি তদানীন্তন ঢাকা সিটি ল' কলেজ হতে এল.এল.বি ডিগ্রী লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠজীবনেই মূলত তাঁর বহুমাত্রিক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রগুলো তৈরি হচ্ছিল। এ পর্যায়ে এসে তাঁর পঠন-পাঠনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন পাঠ্যবহির্ভূত নানাবিধ গ্রন্থের উৎস হিসেবে। এসময়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়কে। বিশেষত নিউটন ও আইনস্টাইনের বিজ্ঞান-সাধনা তাঁকে এ সময় গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মহাকাশ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান হয়ে উঠে তাঁর বিদ্যার্জনের মূল আকর্ষণ। সেইখানে বিজ্ঞান ও দর্শনকে মিলিয়ে পড়ার ইচ্ছে থেকে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক বিশ্বাসে উপনীত হতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর পঠন-পাঠনের বিষয় ক্ষেত্রগুলোকে যেভাবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলো-

ক. ইসলামী দর্শন : তাসাউফ, বিশেষত ইমাম গাজ্জালী (রহ.) প্রণীত দর্শন চিন্তা।

খ. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব : প্রধান চারটি ধর্ম ও বিভিন্ন লৌকিক ধর্ম এবং তাদের বিবর্তন। প্রাচ্য দর্শন–উপনিষদ, বেদান্তিক দর্শন।

---

৮. অত্র এলাকার মধ্যে নামকরা স্কুল ছিল।

৯. যা পরবর্তীতে সরকারী সিদ্ধান্তে হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ. পাশ্চাত্য দর্শন : হেগেলীয় ভাববাদ, ডারউইন ও পেনসারের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ, হেনরী বার্গসোঁর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ, মার্কসবাদ, বার্ট্রান্ড রাসেলের সংসয়ী রচনাবলী ইত্যাদি।

সাহিত্য

ঘ. বিদেশী সাহিত্য : ঔপন্যাসিক ডিকেন্স, কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়র ও অন্যান্য।

ঙ. বাংলা সাহিত্য : কাযিম আল কোরায়েশী (কায়কোবাদ), মীর মোশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচরন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জসীম উদ্দীন প্রমুখের সাহিত্য পড়েছিলেন বিশেষভাবে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় প্রতিফলিত নিসর্গ ও আধ্যাত্ম-চেতনা দ্বারা তিনি অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বৈবাহিক জীবন

তিনি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার গোলাকান্দা গ্রামের তৎকালীন গ্রাম সরকার জনাব আফাজ উদ্দীন সরকারের বড় মেয়ে নুরুন্নাহার হেনা–র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য, নুরুন্নাহার হেনা ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় ব্যারস হাই স্কুল হতে এসএসসি পাশ করেন। তাঁর ঔরসে ২ ছেলে ও ৭ মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তারা হলেন–

১। জেসমিন সিদ্দিকা
২। ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
৩। ইয়াসমীন সিদ্দিকা
৪। নাসরিন সিদ্দিকা
৫। মুনিয়া সিদ্দিকা
৬। মিলি সিদ্দিকা
৭। শিফা সিদ্দিকা
৮। আজিজা সিদ্দিকা
৯। মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম সিদ্দিকী

তাঁদের সন্তানাদি

১। জেসমিন সিদ্দিকা : ২ ছেলে ২ মেয়ে
২। ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী : ১ ছেলে ১ মেয়ে
৩। ইয়াসমীন সিদ্দিকা : ৩ মেয়ে
৪। নাসরিন সিদ্দিকা : ৪ ছেলে ১ মেয়ে
৫। মুনিয়া সিদ্দিকা : ১ ছেলে ১ মেয়ে
৬। মিলি সিদ্দিকা : ১ ছেলে ২ মেয়ে
৭। শিফা সিদ্দিকা : ২ ছেলে ১ মেয়ে
৮। আজিজা সিদ্দিকা : ২ ছেলে
৯। মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম সিদ্দিকী : ২ মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৫৮-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪ বছর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় কিছুকাল বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায়ও নিয়োজিত ছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘদিন তিনি অত্র বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ষোল বছরের সফল অধ্যাপনা শেষে তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করেন। যদিও তাঁর অবসর গ্রহণের আবেদন পত্র আজও নামঞ্জুর অবস্থায় রয়েছে। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর ব্যবহার।

মাওলানা সাহেবের ঘটনাবহুল ও কীর্তিমান জীবনের কয়েকটি পরিচিতি

ভাষা সৈনিক

১৯৫২ সালের ভাষা অন্দোলনে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) শহীদ সালাম, শহীদ বরকত, শহীদ রফিকের সাথে মাতৃভাষার জন্য ঐ দিনের কর্মসূচী অনুযায়ী মিছিল করেছিলেন এবং বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। তাঁর ভাষায় "যখন পাকিস্তানি মেলিটারিরা মিছিলে গুলি চালালো আমার ডান পাশদিয়ে গুলিটা গিয়ে শহীদ রফিকের গায়ে লাগল। সাথে সাথে মানুষগুলো মাটিতে পরে মারা গেল। গুলিটা আর একটু বাম দিকে আসলেই আমার গায়ে লাগতো"। আল্লাহ্র ওলীকে দিয়ে আল্লাহ্পাক দ্বীনের কাজ করাবেন তাই আল্লাহ্পাক তাঁকে হিফাযত করেছিলেন।

নিম্নের কবিতাটি থেকে এ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৭৮ সালে একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এই কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন লিখেছিলেন ড. মুহাম্মাদ মন্জুরুল ইসলাম সিদ্দিকী এবং বাকী কবিতা সমাপ্ত করেছিলেন তাঁর পীর ও পিতা কুতুব উল আকতাব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)। কবিতাটির বানানগুলো ১৯৭৮ সালে প্রচলিত বাংলা বানান অনুযায়ী রাখা হল।

Dhaka University Institutional Repository

২১ ফেব্রুয়ারী

রক্ত মাখানো দিনটি আবার বাংলায় এলো ফিরে
শোক সাগরের খুন ভরা ঢেউ খেলে যায় ঘরে ঘরে
হু হু করে উঠে রিক্ত হৃদয় আসিলে ফেব্রুয়ারী
একুশ তারিখে বরষপঞ্জি নিয়ে আছে আহাজারি

মাতৃ ভাষারে অমর করিতে বীর বাংগালী প্রাণ
শহীদ হয়েছে ভাংগিয়া বিদেশী লৌহের জিন্দান
শহীদ হয়েছে শহীদ ছালাম আর বীর বরকত
যারা চেয়েছিল বরষিতে হেথা আল্লাহর রহমত

যুগে যুগে মোরা জানি
ভাষার গলায় ফাঁসি দিলে কেউ শোনেনি তাহার বাণী
মধুর ঝর্ণা ধারার মতই বাংলা ভাষার বোল
দোয়েল-শ্যামার-কোকিলের সুরের মতই কলরোল

এই ভাষাতেই স্বপ্ন আশার জাল বুনি মনে মনে
শান্তির ঘর বিরচন করি এই ভাষা নিকেতনে
রাখালিয়া বাঁশী এ ভাষায় বাজে, নিজেরে হারায়ে দেই
ভাই বলে ডাকি কত অজানারে, বক্ষে জড়িয়ে নেই।

এ ভাষায় হাসি, এ ভাষায় কাদি, মা বোন বলে ডাকি
বাংলা ভাষা হারালে বাংগালী জাতি হোয়ে যাবে ফাকি
যাহাদের ঘরে কোন ধন নাই, জীবনের জৌলুস
মুখে শুধু ভাষা, তা-ও কেড়ে নিলে রবে বাংগালীর হুস?
চাইতে শহীদ শহীদ হোয়েছে বরকত তার সাথে
সালাম দিয়েছে আখেরী ছালাম স্মরণীয় হোয়ে প্রাতে ॥

কলিজায় ভরা আগুনের ঝড় কাঁদে তাহাদের মা
একুশে ফেব্রুয়ারীর আকাশে আজও তার ঝাঞ্ঝা
গোধুলী আকাশে রাংগা হোয়ে উঠে ধুসর পৃথিবী জুড়ে।
ভোরে আকাশে শিশির হইয়া পাতা পল্লবে ঝরে ॥

ফিরে ফিরে আসে সেই ফেব্রুয়ারীর অতি করুন ধ্বনি
হারাইল যারা ফিরিবে কি তারা বসে বসে তাই গুণি।[১০]

---

১০ . মাসিক ভাটিনাও, প্রাগুক্ত, মার্চ, ২০০৮, বর্ষ : ৪, সংখ্যা: ৭ম

Dhaka University Institutional Repository

ক. অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী

খাঁটি আল্লাহর ওলীগণকে আল্লাহপাক বহু কল্যাণে ভূষিত করেন। তাঁরা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়ায় সাধারণ মানুষ যা করতে দীর্ঘ সময় ও পরিশ্রম করতে হয় তাঁরা তা স্বল্প সময়ে করতে পারেন। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান সবচেয়ে বেশী। তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বিংশ শতাব্দীতেও। নিম্নে অধ্যাপক (অব.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর কিছু আবিষ্কার তুলে ধরা হলো।

ক.১. পরমাণু বিজ্ঞানী

তিনি একজন বিশিষ্ট এমেচার পরমাণু বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি Human cell নিয়ে সুদীর্ঘ দশ বছর গবেষণা করে ১৯৮৬ সালে পরমাণু বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন একটি থিওরী আবিষ্কার করে প্রমাণ করেছেন কবরের আযাব সত্য। থিওরীটি হলো: "Man will have never been vanishing, and one man divided into crore of crores atom-men after death, they are roaming about on the air" অর্থাৎ "মৃত্যুর পর মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায় না, একটি মানুষ কোটি কোটি পরমানু মানুষ রূপে বাতাসে ভেসে বেড়ায়"।[১১] বিজ্ঞানের গবেষক না হলে থিওরীটি বুঝা কঠিন। উল্লেখ্য, তখনও পৃথিবীতে ক্লোনিং থিওরী ও জেনেটিক থিওরী (Genetic Theory) আবিষ্কার করা হয়নি কিন্তু থিওরী আবিষ্কারের ১৫ বছর পূর্বেই তাঁর গ্রন্থে ক্লোনিং থিওরী ও জেনেটিক থিওরীর মূল ভিত্তি বিদ্যমান ছিল। ভাবিষ্যতে এ থিওরীর ফলে বাতাস থেকে মৃত মানুষের জিন (Gene) সনাক্ত করা সম্ভব হবে। এ থিওরীটির বিস্তারিত মাসিক ভাটিনাও পত্রিকায় ২০০৬ ইং সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

ক.২. মহাকাশ বিজ্ঞানী

তিনি একজন এমেচার মহাকাশ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৯৯১ ইং সালে ঝঢ়ধপব ঝপরবহপব এর মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে **'মহা-ভাবনা'** (A Philosophy of Astronomy) নামক গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি এ গ্রন্থে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মুসলিম বিজ্ঞানী যিনি আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝা সম্পর্কে বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ (The World Challenge) করেছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ডা: হারুন-অর-রশিদের (লেকচারার, ডি.এম.সি) মতে, বর্তমান বিশ্বে Modern Astronomy বলতে যদি কিছু থাকে তার নাম হচ্ছে 'মহা-ভাবনা'।

---

১১ . মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহ.), *মহাস্বপ্ন*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৫৬, (কভার ৪র্থ)

Dhaka University Institutional Repository

খ. কবি প্রতিভা

তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের কবি ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালে 'তারানায়ে জান্নাত' বা বেহেশ্‌তের সুর নামক গ্রন্থে ১০৭ টি আধ্যাত্মিক গজল রচনা করেন। এ গজল গুলোর পরতে পরতে 'ইল্‌ম মা'রিফাতের জ্ঞান বিদ্যমান। কবিতাগুলো তাঁর নিজস্ব সুরে আজেও তাঁর খাদিম আব্দুল কাদির মোল্লা ছাহিবের সু-মধুর কণ্ঠে সুরের মাধুরী ছড়ায়। উল্লেখ্য, প্রখ্যাত মরমী শিল্পী আবদুল আলিমের অনুরোধে তিনি তাকে প্রায় ১০ টি ইসলামী গান লিখে এবং সুর করে দিয়েছিলেন যার প্রত্যকটিই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর শর্ত ছিল গানগুলোতে তাঁর নাম প্রকাশ করা যাবে না। তাই আজও গানগুলোর কথা ও গীতিকারে সংগ্রহ লিখা হয়। উচ্চ পর্যায়ের মহাকবি হওয়ায় তিনি প্রায়ই কাব্যিক ভাষায় সাহিত্য দিয়ে কথা বলতেন।

গ. সাহিত্যিক

তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন। তার লিখিত ৮টি কিতাবই তাঁকে সাহিত্য সাগরের তলদেশের মানিক-রতন হিসেবে পরিচিত করেছে। অনেক সূধী জ্ঞানীজন তাঁর লেখনি পড়ে মন্তব্য করেছেন বিজ্ঞানের মত একটি নিরস বিষয়কে সাহিত্যাকারে ইতিপূর্বে কেহ এমনভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

স্বর্ণপদক প্রাপ্তি

ক্ষণজন্মা এ মহাপুরুষ দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রথমটি, তাঁর লিখিত 'মহাভাবনা' গ্রন্থের জন্য ১৯৯৯ সালের ১৩ই মার্চ সমগ্র বিশ্বের প্রায় ২০০ ডক্টরেট ও মুসলিম দার্শনিকের মাধ্যমে যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে ড. সিকন্দর আলী ইব্রাহীমি কর্তৃক স্বর্নপদক লাভ করেন, ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি, যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে 'মহা ভাবনা' লিখে স্বর্ণপদক পাওয়ায় মানিকগঞ্জবাসী গর্বিতবোধ করে নাগরিক কমিটির পক্ষে সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) আবদুল মালেক কর্তৃক ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারীতে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। এ সময় দেবেন্দ্র কলেজের তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, মানিকগঞ্জ পৌরসভার বর্তমান মেয়র রমজান আলীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

হজ্জব্রত পালন

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। এসময়ে তিনি মাক্কাতুল মুকাররামা ও মদীনাতুল মুনাওয়ারাতে রাসূলুল্লাহ (স.) -এর স্মৃতিবিজড়িত গৌরময় ঐতিহাসিক স্থানসমূহের দর্শন লাভে ধন্য হন।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

এই মহান জ্ঞান তাপস ও আধ্যাত্মিক সাধক ২০০০ সালের ২১ মে রবিবার দিবাগত রাত ১০টায় ৬৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

পরের দিন মানকিগঞ্জ দরবারে মোট ৩টি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জানাজা পরিচালনা করেন তাঁর অন্যতম খলিফা মুফতী আব্দুল হাকিম দেওবন্দী, দ্বিতীয় জানাজা পরিচালনা করেন তাঁর দৌহিত্র মুফতী সাব্বির আহমেদ এবং সর্বশেষ জানাজা পরিচালনা করেন তাঁর বড় ছেলে, প্রধান খলিফা ড. মাওলানা মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী। প্রায় দুই লক্ষাধিক গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ এ জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। জানাজা শেষে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হুজুরপাক (স.)-এর খাঁটি ওয়ারিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথাটি বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে সুন্নত স্বরূপ তাঁর আদরের নাতী-নাতনী ভাইদেরকে বলেছিলেন। তিনি সারা জীবনের অজস্র পরিশ্রমে ৬৩ বছর বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। সেদিন ছিল ২০০০ সালের ২১ মে রবিবার দিবাগত রাত্রি অর্থাৎ সোমবার, মাওলানা সাহেব কন্যাদেরকে বললেন আমাকে ভাল করে গোসল করিয়ে দাও। সবাই তাঁকে গোসল করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন আমাকে খাবার দাও আমি আজকে খাব, তিনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেন। তারপর ইস্তিঞ্জা থেকে এসে অযু করে বিছানায় শুতেই শরীর খুব খারাপ লাগছিল, বিছানায় শুয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে 'পাছ আন ফাছ' সবক (নিঃশাষ নিতে 'আল্লাহ্' ছাড়তে 'হু') করতে ছিলেন। কিছুক্ষণ সবক চর্চা করতে করতে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের নয়নমণি, কুতুব উল আকতাব, অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হুযুরপাক (সা.)-এর এই খাঁটি ওয়ারিস সকলের বুক খালি করে দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়াল হয়ে যান।

মাওলানা সাহেবের (রহ.) দাফন

ইন্তিকালের তিন দিন পূর্বে তাঁর আদরের সন্তান আল্লাহর বান্দা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলম ছিদ্দিকীকে ৫ দিনের জন্য ফরিদপুর সফরে যেতে হচ্ছিল। সব সময় সফরে গেলে হুযুর খুব খুশি হতেন। কিন্তু সেদিন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তারাতারি চলে এসো, সোমবারের ভিতরে। তিনি সফরে গেলেন এবং রবিবার রাতেই ফোন পেলেন আব্বা খুব অসুস্থ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তারপর তিনি রওয়ানা হয়ে রাত ১ টার দিকে মানিকগঞ্জে এসে পৌঁছালেন। ইতিমধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক শত মুরিদ

Dhaka University Institutional Repository

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে হাজির হয়েছে, তারা অনেকেই তখনও জানে না তাদের আধ্যাত্মিক গুরু প্রানাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব আর নেই। এত মুরিদের সমাগম দেখে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেন কিন্তু ভাবলেন হয়তো অসুস্থতার খবর পেয়ে সবাই এসেছে। তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলেন কিছু বাঁশ কাটা হয়েছে তারপর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে তিনি আব্বা বলে জোড়ে চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলেন। সেই চিৎকারের শব্দে বাহিরের সকলেই বুঝে গেল তাদের নয়নমণি আর নেই। শুরু হলো কান্না। কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে গেল। সারা বাংলাদেশে মুহূর্তেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। ভোর হতেই হাজার হাজার মানুষ আসতে শুরু করলো মানিকগঞ্জে। সেদিন মানিকগঞ্জের আকাশে বাতাসে শোকের ছায়া নেমে এলো। সারা শহরব্যাপী দোকান পাট সব বন্ধ ছিল। আশে পাশে থেকে হিন্দুভাইয়েরা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছিল। কবর খনন করা হচ্ছে মাওলানার ওসিয়ত করা নির্দিষ্ট জায়গায়। মাওলানা সাহেবকে গোসল করিয়ে মদীনা শরীফ থেকে আনা কাফনের কাপড় পড়িয়ে দিলেন তার জামাতা মাওলানা মুজিবুর রহমান খান। যোহর নামাযের পর হুযুরকে বাহিরে মুরিদের মাঝে আনা হলো তখন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য ঘটলো। কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে গেল। শুরু হলো কান্না। প্রকৃতিও যেন একসাথে কাঁদছিল সেদিন। দুপুর ২ টার দিকে তাঁর প্রথম জানাজা নামায পড়ানো হলো। জানাজা পড়ালেন তাঁর আদরের সন্তান আল্লাহর বান্দা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী। প্রথম জানাজায় প্রায় লক্ষাধিক মানুষ হয়েছিল, এ সময় সমগ্র আকাশ অন্যরকম কালো হয়েছিল এক চিলতে বৃষ্টি হয়েছিল। 'আলিমদের মতে, তখন ফিরিশতা ও জীনরা জানাজায় শরীক হয়েছিল। তারপর তাঁকে আবার বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপার ঘণ্টা খানিক পর আবার বাহিরে আনা হলো এ সময় দ্বিতীয় জানাজা নামাজ পড়ানো হলো, এ জামায়াতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ হয়েছিল। তারপর আবার বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বাদ আছার আবার বাহিরে আনা হলো এ সময় তৃতীয় জানাজা নামায পড়ানো হলো। এ জামাতেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ হয়েছিল। তারপর আছর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময় আল্লাহর ওলীকে দাফন করা হয়েছে। দাফনের আধা ঘণ্টা পরই আল্লাহর ওলীর ইন্তিকালে প্রকৃতি কাঁদা শুরু করলো। সেদিন হঠাৎ করেই দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল। এভাবেই যুগ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জগতের এই মহান দিকপালের দাফন সম্পন্ন হলো। পরদিন দেশের কয়েকটি জাতীয় তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিজীবনে মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)

দৈহিক গঠন : গৌরবর্ণের নাতিদীর্ঘ পৌরুষদীপ্ত সুঠামদেহী ছিলেন তিনি। হাস্যোজ্জল অভিব্যক্তি ছিল লক্ষ্য করবার মত।

পোষাক-পরিচ্ছদ : তিনি আরবী জুব্বা, লুঙ্গি ও টুপি ব্যবহার করতেন।

স্বভাব-চরিত্র

রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন তিনি। একটি মুস্তাহাবকেও তিনি সর্বোচ্চ প্রেম ও ভক্তি সহকারে আদায়ে সচেষ্ট থাকতেন সর্বদা। অল্পে তুষ্টি, অনর্থক কথা না বলা, কোমল শিশুসুলভ ব্যবহার ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। তিনি খুব সহজ-সরল জীবন-যাপন করতেন। কথায় ও ব্যবহারে তিনি সকলের সাথে বিনয়ী, ভদ্র ও দরদী ছিলেন। সবশেষে বলা যায়, আল্লাহ ও রাসূল প্রেমের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল তাঁর চরিত্রের প্রতিটি মাত্রায়।

জীবন-যাপন পদ্ধতি

নিজের প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। ভোরের নির্মল বাতাসে কিছুক্ষণ হাটাহাটি, সকালের নাস্তা সেরে খবরের কাগজে চোখ বুলানো। এভাবেই শুরু ছিল কর্মচঞ্চল প্রতিটি দিনের। স্বাভাবিক কাজকর্ম ও চলাফেরার মাঝেও তিনি তাসবীহ-তাহলীলে ব্যপৃত থাকতেন। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। পাশাপাশি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতি দায়িত্ববোধে সংবেদনশীল ছিলেন তিনি। এমনকি একটি শিশুও তাঁর উপস্থিতিকে উপভোগ করত নির্মল আনন্দে।

দেশের প্রতিটি প্রান্ত হতে ছুটে আসা সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের নিত্য গমনাগমনে মুখরিত ছিল তাঁর বহির্বাটীর আঙ্গিনা। দিনের বড় একটা অংশ এসকল পথভোলা মানুষের পথের দিশা ও আত্মশুদ্ধির উপায় বাতলে দিতেই কেটে যেত। এভাবে গভীর রাত অবধি তাঁর পরম প্রেমাস্পদের গভীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে কেটে যেত কর্মব্যস্ত দিন।

দৈনন্দিন জীবনে পরিপূর্ণ সুন্নত পালন

সকালে উঠা : তিনি সব সময়ই ভোরে বিছানা থেকে উঠতেন। উঠেই বালিশের নিচ থেকে টুপি বের করে মাথায় দিতেন। জাগ্রত অবস্থায় তিনি সব সময়ই মাথায় টুপি রাখতেন। তারপর সঠিক সময়ে ফযরের নামায আদায় করতেন। সব সময়েই জামাতের সাথে নামায আদায় করতেন। নামাযের পর সেখানেই বসে থাকতেন। তারপর সূর্য উঠার পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌র করতেন, সূর্য উঠার পর ছয় রাকাআত ইশরাক নামায আদায় করতেন ৯ টার দিকে চাশত নামায আদায় করে সামান্য হাটতেন।

দাঁত পরিষ্কার : তিনি প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই মিসওয়াক করতেন। তিনি তাঁর সকল মুরিদকে নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করার জোড় নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি দুপুর বারটার দিকে প্রতিদিন পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতেন। তিনি সফ্‌ট ব্রাশ ব্যবহার করতেন।

ইস্তিঞ্জা : বড় ইস্তিঞ্জার সময় ৫টি, ৭টি, এমনকি ২১টি ঢিলা-কুলুপ[১২] ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। বড় ইস্তিঞ্জা শেষে তিনি ইস্তিঞ্জার স্থান তিনবার সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতেন। এরপর দু'হাত উত্তমরূপে সাবান ব্যবহার করে পরিষ্কার করতেন।

অযু : অযুর মধ্যে ও অযুর শেষে তিনি দরূদ শরীফ পরতেন। অযু করে তিনি কখনও কপাল মুছতেন না। ফজরের অযুতে তিনি চোখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিতেন। অযুর জন্য তিনি গর্ত করে তার উপর লোহার জালিকা দিয়ে সেই জালিকার উপর কেটলি রেখে ছোট কাঠের চকিতে বসে অযু করতেন। জালিকা দেয়ার কারণ যাতে মেঝেতে পানি পরে ছিটে এসে গায়ে না লাগে। তিনি অধিক পরহেযগারীতা অবলম্বন করতেন।

নামায : তিনি সুন্নত নামাযের পর ফরয নামায আদায়ের সময় সবুজ পাগড়ী বাধতেন এবং ফরযের পরবর্তী সুন্নত, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি নামাযের সময় পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকতেন। তারপর মুনাজাতের পর ভাজে ভাজে সুন্নতী কায়দায় পাগড়ী খুলতেন।

খাবার : খাওয়ার পূর্বে তিনি হাত ধুয়ে আঙ্গুলের মাথায় সামান্য একটু লবন নিয়ে জিহ্বায় লাগিয়ে বিসমিল্লাহ্‌ বলে খাবার শুরু করতেন। সব সময়ই লাল দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খেতেন। সামান্য খাবার পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খেতেন। তিনি উত্তমরূপে আঙ্গুল চেটে খেতেন যা নবীজীর (স.) পবিত্র সুন্নত।

পরিশ্রম করা : তিনি নিজ হাতে গাছ লাগাতেন, পানি দিতেন এবং নিড়িয়ে দিতেন। বরশী দিয়ে মাছ ধরা তার একটি শখ ছিল তিনি বাড়ীর ভিতরের পুকুর থেকে তাঁর আদরের সন্ত ান ও নাতীকে নিয়ে মাছ শিকার করতেন। তিনি লাঠি খেলা খুব পছন্দ করতেন। তেরশ্রীতে গেলে তিনি সেখানে লাঠিখেলোয়াড়দের সাথে লাঠি খেলতেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ৭ বছরের আদরের নাতী মুহাম্মাদ মিক্বদাদ ছিদ্দিকীর সাথে লাঠি খেলে আনন্দ পেতেন।

জ্ঞানান্বেষণে থাকা : তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়তেন, শেষ বয়সে তাঁর নাতী নাতনীরা পড়তেন তিনি শুনতেন। প্রতিদিন রেডিওতে রাত সাড়ে আটটার খবর শুনতেন।

---

১২. পায়খানা বা প্রশ্রাবের পর ব্যবহৃত মাটির ছোট টুকরা বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘুমানো : তিনি ঘুমানোর পূর্বে অযু করতেন। তারপর খালি পায়ে কিছু সময় হাটতেন। তাঁর বালিশের একপাশে একটি টর্চ, তজবীহ, টুপি ও মাথার রুমাল রাখতেন। মাথার রুমাল দিয়ে মাথা ও কান মুবারক ঢেকে রাখতেন যাতে ফ্যানের বাতাস ক্ষতি করতে না পারে। ঘুমের সময় শরীরে কাথা অথবা চাদর দিয়ে রাখতেন। এছাড়া তিনি সুন্নতস্বরূপ ঘরের এক কোণে একটি লাঠি রাখতেন। মশারীর চার মাথা সমান করে টানানো ছাড়া কখনও ঘুমাতেন না। প্রথমে আসমানের দিকে কিছু সময় মুখ করে শুয়ে তারপর বাম কাধে ভর করে সামান্য সময় থেকে অবশেষে ডান কাধে কিব্‌লামুখি হয়ে যিক্‌র করতে করতে ঘুমাতেন। কিন্তু তিনি গড়ে তিন ঘন্টার বেশী ঘুমাতেন না। সব সময় ইল্লাল্লাহ্‌ যিক্‌র করতে করতে ঘুম থেকে উঠতেন। রাতের অধিকাংশ সময় তিনি আল্লাহর যিক্‌র করতেন এবং বসে বসে কাঁদতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "আমার কিছু ভক্ত রয়েছে যারা আরাম করে নিদ্রা যাওয়ার পরিবর্তে গভীর রাতে আমার জন্য বসে বসে কাঁদে, আমিও সেই পাগলদের জন্য সজাগ থাকি আর বসে বসে কাঁদি"। তিনি তাঁর মুরিদদের অত্যন্ত ভালবাসতেন।

মানবিক গুণাবলী

আত্মবিশ্বাস

মানবিক এই গুণটি তাঁর অধিক মাত্রায় ছিল বলেই তিনি জীবনে সফলতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। যে কোন কাজের নৈপুণ্য অর্জন করা এবং সে কাজে অধিকতর কৃতকার্য হওয়ার জন্য যতটুকু আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, তিনি তা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আর এই গুণ সম্পর্কে বিশ্বাসী ঘোষণাও তিনি ইতিবাচকভাবে তাঁর নানা বক্তৃতায় দিয়েছেন।

অনুসন্ধিৎসা

তাঁর অনুসন্ধিৎসা মূলত তাঁর জ্ঞান-পিপাসার নামান্তর, যা তিনি সারা জীবন বয়ে গেছেন। যতক্ষণ না তার মানসিক চাহিদা অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষার পরিপূরক কিছু খুঁজে পেতেন, ততক্ষণ পড়াশোনার কিংবা গবেষণাধর্মী কাজের প্রেরণা অটুট থাকত তাঁর।

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা ছিল তাঁর সবচেয়ে উন্নত মানবিক গুণগুলোর একটি। কেবল ইসলামী আখলাককে বুঝে নিয়ে তা ধারণ করার চেষ্টায় নয়, বরং একটি শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের সংস্পর্শ ও জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনকে নির্মাণের সংগ্রাম তাঁকে কঠিন তথা সত্যের প্রতি আনুগত্য শিখিয়েছে। এ কথা তাঁর বিভিন্ন সময়ের স্বীকারোক্তি মূলক বক্তব্য থেকে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মানববাদী ভূমিকা

মুমিনের এটাও বড় গুণ, যা তিনি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসাতেন এবং সকলকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। বিশেষত: (বাসস্থানের) প্রতিবেশীদের খোঁজ নেওয়া তাঁর একটা নিয়মিত অভ্যাস ছিল। তিনি যেখানে থাকতেন, সেটা হিন্দু প্রধান এলাকা ছিল। বন্যা কিংবা যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁকে খাবার, অর্থ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতে দেখা গেছে। মানুষের বিপদ বুঝে নেয়ার ক্ষমতাও ছিল তাঁর, সাহায্য চেয়ে কেউ কখনও ফিরে যায়নি তাঁর কাছ থেকে। বাড়িতে কেউ ভিক্ষা করতে এলে ভিক্ষুকের শারীরিক সামর্থ অনুযায়ী অর্থ সাহায্য দিয়ে তিনি তাকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করতেন, যেন তাকে আর ভিক্ষা করতে না হয়। এককথায়, গভীর সংবেদনশীল মন ছিল তাঁর; যা তাঁকে মানবতাবাদী ভূমিকায় উত্তীর্ণ করেছিল।

বন্ধুত্বসুলভ আচরণ

পরিবার এবং সমাজের মানুষের সাথে তাঁর সহজ গুণ ছিল বন্ধুতাপূর্ণ আচরণ। একটি ছোট শিশুর মনোভঙ্গি বুঝে নিয়ে তার সঙ্গে মিশতে ও তার বন্ধু হতে পারতেন তিনি। বিশিষ্ট লেখক, দার্শনিক ডেল কার্নেগীর দর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এছাড়া সর্বোপরি, হুজুর (স.)-এর স্বভাব-গুণ আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন তিনি। দাম্পত্য জীবনেও তিনি অত্যন্ত সুখী ছিলেন এই বিশেষ গুণটির কারণে। তাঁর সহধর্মিনীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর (সহধর্মিনীর) মতামত ও পরামর্শকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেছেন এবং সবসময় তাঁকে বুঝতে চেয়েছেন মানসিকভাবে।[১৩]

অন্যের ব্যক্তিত্ব গড়নে ভূমিকা

অন্যের মনোভঙ্গি গভীরভাবে উপলব্ধি করে তার স্বভাব-প্রবণতা, অবস্থান বুঝে নিয়ে তাকে গড়ে তোলার একটা প্রয়াস পেতেন তিনি। পরিবারে বা পরিবারের বাইরে যে কোনো মানুষের বেলায় এটা সত্য হয়েছিল। যেহেতু নিজেকে ভালভাবে জানার প্রবণতা ছিল তার; সেই সূত্রে অপরকে বোঝার ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল। শিশুদের শাসন করতেন ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। যাতে তারা তাকে বন্ধু মনে করে।

অঙ্গীকার রক্ষা করা

কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা মু'মিনের অন্যতম বড় গুণ, তাঁরও সেটি ছিল। ছোট শিশুকেও যদি কোনো কথা দিতেন, সেটা শিশুটি ভুলে গেলেও তিনি তা ভুলতেন না। বড়দের

---

১৩. তাঁর সহধর্মীনীর সাথে আলাপ চারিতায় এ তথ্য জানা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে তো নয়ই। কথা রক্ষা করতে না পারলে কথা তিনি দিতেন না, কাউকে সময় দিলেও সেই নির্দিষ্ট সময়েই দেখা করতেন।

সমাজ সেবা

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) ছিলেন মানবপ্রেমের দীক্ষায় উদ্দীপ্ত। মানুষের উপকার করতে গিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলিম ভেদ করতেন না। কন্যা দায়গ্রস্থ পিতার দুশ্চিন্তা মোচন, অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর লেখাপড়া চালিয়ে নেয়া, অর্ধাহারে-অনাহারে থাকা মানুষের ক্ষুধার জ্বালা মেটানো, শীতার্তের কষ্ট মোচন, সহায়-সম্বলহীনের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন তাঁকে গরীব-দুঃখী-মেহনতী মানুষের কাছে করে দিয়েছিল পরম বন্ধুর আসন। দুঃস্থের সেবায় লাভ করতেন স্রষ্টা সেবার প্রতিকী তৃপ্তি।

নিজের বাড়ীর পাশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও মাদ্রাসা ছাড়াও আরও অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তিনি।

জীবন দর্শন

ইসলাম ও তাসাউফ অনুপ্রেরণা

যখন থেকে জীবনের উদ্দেশ্য কিংবা পৃথিবীতে অবস্থানের অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়পর্বের উপযোগিতা নিয়ে ভেবেছেন, তখন থেকেই আত্মানুসন্ধান এবং তার পরিণতি হিসেবে একটি বিশ্বাস-দর্শন, সে অনুযায়ী নিজ জীবনকর্মকে বিন্যস্ত করা ছিল মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর ব্রত।

প্রকৃতিবাদী ও বস্তুবাদীরা কোনো অতিপ্রাকৃত ও অতিন্দ্রিয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। ঠিক প্রকৃতিবাদী ও বস্তুবাদীদের মতো করে নয়, তবে ঈশ্বর-বিশ্বাসে স্থিত হওয়া যাবে কি না; ধর্মগ্রন্থ কিংবা সৃষ্টি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে এ ব্যাপারে কোন অখণ্ড যুক্তি এবং তা থেকে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসে উপনীত হওয়া সম্ভব কি না – এ সম্পর্কিত অনুসন্ধানের তাগিদ মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দীকী অনুভব করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আগেই। এই বিশ্বব্যবস্থা এবং তার গতিপ্রকৃতির উৎস কী– এই প্রশ্নের সহজ, সরল ও সর্বজনগ্রাহ্য জবাব তিনি তখনও পাননি। সুতরাং এ পর্যায়ে তাঁর অন্বেষণের মূল কেন্দ্রসূত্র ছিল এই জিজ্ঞাসা। কুরআন, ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি হল প্রাথমিকভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধানের উৎস। সুতরাং তাঁর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র পরিধিও হয়ে উঠলো এসব বিষয়কে ঘিরে।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মগ্রন্থ বিষয়ক অনুসন্ধানে তিনি মূলত: বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত চার ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণে প্রবৃত্ত হলেন। একেশ্বর ও বহুশ্বেরবাদী, সর্বেশ্বরবাদী ধারণা নান ধর্মে রয়েছে। কিন্তু প্রথমেই ধর্মীয় সংজ্ঞার ঈশ্বরকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। এর একটি কারণ হল- প্রধান ধর্মগুলোর দু'একটি এবং লোকায়ত ধর্মের ঈশ্বরভাবনার সাথে মানুষের নিজ ভৌগলিক অবস্থান-কাঠামো, জীবনযাত্রার সংস্কৃতি, সমাজ নিয়ন্ত্রকের বিশ্বাস, সমাজ-প্রচলিত প্রথা প্রভৃতি বিষয় জড়িত। সুতরাং সৃষ্টিবিজ্ঞান বা প্রকৃতবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায়, তিনি তা-ই শিক্ষালাভ করতে শুরু করেন। দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব যেভাবে নানা কালে দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে তার মাঝে আকস্মিক সৃষ্টিবাদ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। 'উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি ঈশ্বর তথা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় প্রাকৃতিক জগতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য থেকে। যুক্তিটিকে মোটামুটিভাবে দু'ভাবে বিবৃত করা যায়।

প্রথমত, আমরা যাকে প্রকৃতি বলি, তা ঘটনাবলির আকস্মিক সমাবেশ কিংবা আপতিক ঘটনাবলির এলোমেলো সংমিশ্রণ নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল ব্যাপার। গ্রহগুলো তাদের কক্ষপথে নিয়মিত পরিক্রমণ করে; শস্যবীজের পুষ্টি ও বিকাশ ঘটে একই নিয়মে; ঋতুসমূহের পরিবর্তন ঘটে একের পর এক। প্রত্যেক জিনিসেরই সঙ্গতি রয়েছে এক বিধিবদ্ধ নিয়মের সঙ্গে। সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত নিয়ম দ্বারা। প্রকৃতির এই বিরাট শৃঙ্খলা আপনা-আপনি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। কিংবা তাকে কোনো আপতিক বলেও আখ্যায়িত করা যায় না। এর নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই একটা বুদ্ধিমান সত্ত্বার অস্তিত্ব থাকা চাই। প্রকৃতিতে যে শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে একজন পরিকল্পনাকারী বা স্থপতির অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, জগতের বস্তুরাশি ও ঘটনাবলির সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রত্যেক জিনিষেরই সম্পাদন করার মতো কিছু কাজ আছে। প্রাণবানই হোক আর নিষ্প্রাণই হোক, প্রত্যেক জিনিসেরই জগতের সামগ্রিক পরিকল্পনায় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত। জগতের সবকিছুই আপনা-আপনি চলছে, কিংবা প্রত্যেক জিনিস নিজেই সচেতনভাবে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও গতিপ্রকৃতি স্থির করছে, এ কথা ভাবা অস্বাভাবিক। সুতরাং, এ সূত্রেই ধরে নিতে হবে যে, প্রত্যেক জিনিসেরই কর্ম, আচরণ ও গতিপ্রকৃতি আগে থেকেই পরিকল্পিত হয়েছে। অর্থাৎ জগতের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড একই পরম চেতন সত্ত্বা দ্বারা পরিকল্পিত, সংঘটিত ও সমন্বিত হয়ে চলেছে। আর এই পরিকল্পনাকারী সার্বিক চেতনাই হচ্ছে জগতের স্রষ্টা।

লক্ষণীয়, এ যুক্তির প্রথম অংশে প্রকৃতিকে মনে করা হয়েছে একটি উদ্দেশ্যের ফলাফল হিসেবে। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, প্রকৃতি এমন একটি যন্ত্রস্বরূপ যার যথাযোগ্য একটি লক্ষ্য অর্জিত হয়। যুক্তিটির উভয় অংশেই বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হয়। আর তাই এ যুক্তির নাম উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যবাদী যুক্তি বা দর্শন আয়ত্ত করে তিনি (আজহারুল ইসলাম) মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন– একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শৈশব থেকে অনুসন্ধানের যে গুণ তাঁর ছিল, সৃষ্টিকর্তা, নিজসত্তা ও সামগ্রিকভাবে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে; পরিণত বয়সে (অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে) এসে সে জিজ্ঞাসা পূর্ণ রূপ পেয়েছিল। আর সে অন্বেষা থেকে একটি অস্তিবাচক বিশ্বাসে পৌঁছে যাবার অভিপ্রায়ে ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান চর্চার নানা দিক তাঁকে সাহায্য করেছিল মাত্র।

কেন তিনি শেষ পর্যন্ত অস্তিবাচক দর্শনে স্থিত হলেন তার পক্ষে যুক্তির প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন নিজ রচনায়। একটি ধর্মীয় পটভূমিসম্পৃক্ত পারিবারিক কাঠামোয় তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন, ৭ম শ্রেণীতে পড়ার পর মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া ও তৎকালীন হাই মাদ্রাসা সার্টিফিকেট অর্জন, এসব তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবেশের পূর্বেই ঘটেছিল। সুতরাং পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের 'সামাজিকীকরণে' (Socialization) ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ় হবার ব্যাপারটি প্রথমাবধি স্বাভাবিক ছিল। তবু কেন সেই ধর্মীয় বিশ্বাস বিশেষত সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসটি অর্জনের জন্য তাঁকে যুক্তি-মুক্তবুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথটি বেছে নিতে হল? বিশ্বাসটি যাচাই করে নেয়া নাকি একজন স্বশিক্ষিত মানুষ হিসেবে যৌক্তিক মুল্যায়ণকে ধারণ করার ইচ্ছা দুটোই হতে পারে। কারণ নির্মোহ-নির্জীব বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীকে বোঝাতে সক্ষম হলেও নেতিবাদী সংশয়ীকে তার উপলব্ধি কেমন করে বোঝাবে! যুক্তি সেখানে প্রয়োজন, প্রয়োজন জ্ঞানের চর্চা। যার প্রথম প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃতি রয়েছে ইসলাম ধর্মে। যা তিনি খুঁজে পেলেন এবং উপলব্ধি করলেন নিম্নের আয়াতে কারীমাগুলো–

ক. পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।[১৪]

খ. জ্ঞানীরাই আমাকে ভয় করে।[১৫]

গ. এবং অবশ্যই তাদের সবাইকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা খায় করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর আঙ্গুরের উদ্যান এবং তাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ, যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল থেকে, অথচ তাদের হস্ত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? । পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে তা শুষ্ক বক্র,

---

১৪. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ আল-কুরআন, ৯৬ : ০১

১৫. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (আল-কুরআন, ৩৫ : ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।[১৬]

ঘ. মানুষকি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।[১৭]

ঙ. আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি প্রকৃতিগতভাবে তার অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না?[১৮]

এভাবে একটি গভীর বিশ্বাসে কিংবা দর্শনে স্থিত হলেন তিনি। কিন্তু তা অপরকে জানানোই মু'মিন হিসেবে প্রথম কর্তব্য হল তাঁর। এ উদ্দেশ্যেই লিখলেন বই। প্রথমেই এ জগত-জীবন সম্পর্কিত ভাবনার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। দ্বিতীয়ত, স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপলব্ধির ভেতরে পাওয়ার চেষ্টা, তৃতীয়ত, ইসলামী জীবনাচরণ পূর্ণভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে সমাজ-সমস্যা সম্পর্কিত প্রকাশ। এ দিক থেকে তাঁর লেখনীকে তিনটি ভাগে বিভাজন করা যায়। যেমন–

প্রথম

ক) মহাভাবনা (A philosophy of Astronomy)

খ) জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব (A philosophy of Phisiology)

গ) মহাস্বপ্ন

দ্বিতীয়

ক) মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব

খ) তারানায়ে জান্নাত

তৃতীয়

ক) বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

খ) ধূম পিপাসা সর্বনাশা

---

১৬. وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ – وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ – وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ – لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ – سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ – وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ – وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ – وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ– لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ আল-কুরআন, ৩৬ : ৩২-৪০

১৭. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ আল-কুরআন, ৩৬ : ৭৭

১৮. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ আল-কুরআন, ৩৬ : ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের দ্বিতীয় পর্বে এসে বিশ্বাসকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরা ও সেই উপলব্ধি জ্ঞান সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। সত্যবাদী একজন মানুষের সংস্পর্শ সে কারণেই চেয়েছিলেন, যাঁর পথ-প্রদর্শনের পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করতে পারেন। তা–ই হয়েছিল। সৃষ্টি সম্বন্ধে অর্জিত গভীর জ্ঞানকে যারা বিশ্বাসে রূপান্তর করে সুস্থির হয়েছেন মহান সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য ধ্যানে এবং সর্বোপরি তা অন্যের অন্তরে অনুপ্রবেশ করাতে চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে পেয়ে গেলেন তিনি। আর তিনি হলেন হযরত ইছহাক (রহ.)।

নবী-রাসুলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে পাক কালামে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।[১৯]

উল্লেখিত আয়াতে কারিমা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ন্যায়বান মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নবী (আলাইহিসসালাম) গণ এসেছিলেন এবং তাঁরা তাদের মহৎ ও আদর্শ জীবদন চরিত্রের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠ চেষ্টার মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাকের প্রদর্শিত পথে মানুষকে উজ্জীবিত করে পৃথিবীতে স্বর্গীয় শান্তির মহিমা প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করে গিয়েছেন।

সকল যুগ জিজ্ঞাসার জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী দ্বীনী ব্যবস্থায় তাই কিভাবে ন্যায় ভিত্তিক সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার দিক নির্দেশনা ও বাস্তব রূপায়নের রূপরেখা রয়েছে। অপর দিকে অনৈসলামিক চিন্তাবিদগণের মধ্যে দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানী প্লেটো তাঁর (Idealstics) ন্যায়ভিত্তিক সমাজের কল্পনা করেছিন সেখানে তিনি ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রকে উপেক্ষা করে কেবল দার্শনিক রাজা বা শাসকের উন্নত মহৎ চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন রাজা যদি দার্শনিক হয় তবে ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মানব রচিত আইন, কানুনের প্রয়োজন নেই তাঁর কাল্পনিক আদর্শ ন্যায়ানুগ সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকের চরিত্র নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই যা প্রয়োজন তা হল কেবল রাজার নৈতিক চরিত্র উন্নত ও মহৎ হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তিনি সেই দার্শনিক নিরাসক্ত তরাজা তৈরি করতে পারেন নি।

---

১৯. আল-কুরআন, ৫৭:২৫

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগের সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের নেপথ্য দার্শনিক প্রাণপুরুষ রুশোর মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বদিচ্ছা বিদ্যমান। এই ব্যক্তিক স্বদিচ্ছা সদিচ্ছায় (Good will) রূপ নেয় অর্থাৎ সমাজের সকল মানুষ যখন তাদের বিবেকের অনুশাসনে আবদ্ধ হবে তখন সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা পাবে। তাই তিনি সমাজের সকলকে তার স্বীয় ব্যক্তিগত সদিচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। কিন্তু কিভাবে মানুষ বিবেকের অধীন হবে সে বিষয়ে তার চিন্তধারায় কোন সুস্পষ্ট ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা নেই।

এ বিষয়ে কুরআন পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে একদিকে যেমন বর্ণনা দিয়েছেন অন্যদিকে মানুষের কু-স্বভাব কিভাবে উন্নত করা যায় তার শিক্ষা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মাধ্যমে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আশশামস-এ বলা হয়েছে–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا– فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا – قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

অর্থ: শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।[২০]

মানুষের মধ্যে রয়েছে গুনাহ করার প্রবণতা এবং পরহেযগারী স্বভাব। অতএব, ঐ ব্যক্তি সফলকাম যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করতে পেরেছে। তাই নফসের ক্ষতিকারক প্রবণতা সম্পর্কে আল-কুরআনে[২১] বলা হয়েছে-

অর্থ: নফস তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তাই দেখা গেল মানুষের শত্রুতার নিজের মধ্যেই রয়েছে। নফসরূপী সে শত্রুই শয়তানের বাহন। নফসানিয়াত থেকে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা আসে। আর মুলহেম থেকে আসে ইলহাম। আত্মার শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিবেকের মাধ্যমে। মানুষকে তার স্রষ্টা তার স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করে উল্লেখিত আয়াতে কারিমায় ঐ স্বভাব প্রকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে নফসের পশুসুলভ কুপ্রভাবের মুখে লাগাম এটে ওটা খোদা ভীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে আত্মার তথা বিবেকের জাগৃতির মাধ্যমে মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হওয়াকে প্রকৃত সফলতা বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কোরআন পাক মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হওয়াকে সফলতা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কিভাবে মানুষ মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হবে তার সঠিক

---

২০. আল-কুরআন, ৯১ : ৭-৯
২১. আল-কুরআন, ১২ : ৫২

Dhaka University Institutional Repository

এবং সফল দিক দিশার সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং মানুষ সকল ভালমন্দ কাজের সকল কথায় এমনকি তার মনের নিভৃত কোনে উদিত শু ও কুচিন্তার রেকর্ড করা হচ্ছে এবং এ বিষয়গুলোর জন্য পরকালে তাকে স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ লক্ষ্যেই বিভিন্ন যুগে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী রাসুল পাঠিয়েছেন এবং শেষ জমানায় এ মিশনের সার্বিক পূর্ণতা দিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে পাঠিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাক কালামের সূরা বাকারাহ, সূরা আল ইমরান এবং সুরা জুমুআর বিভিন্ন আয়াতে মহা নবীর জগতে শুভ পদার্পন ও তার রিসালাতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন। আয়াত সমূহের মধ্যে সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতাংশের মূল বক্তব্য নিম্নে দেওয়া হলো[২২]:

অর্থাৎ, আমার নবী তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন। আমার কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষা দিবেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ন্যায় সুবিচার, সৎকর্ম শিক্ষা দিবেন এবং তোমাদের বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা কিভাবে অর্জন হয় এ শিক্ষাও দিবেন। কারণ শিক্ষা গ্রহণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও উহার আলোকে আলোকিত হওয়ার সাথে সাথে চরিত্র সংশোধন ও আত্মিক পবিত্র করণের ঐকান্তিক ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে জ্ঞানের অপপ্রয়োগ ঘটবে, সমাজে প্রাবল্যের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে। নৈতিকতার অভাবে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হিংস্র পশুর চেয়ে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। অন্যান্য জাতি ধর্মে, শিক্ষা ও বাহ্যিক সভ্যতাকে কোন না কোন প্রকারে অত্যাবশ্যকীয় মনে করলেও ইসলামের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা শিক্ষার সাথে চরিত্র সংশোধন ও আত্মিক পবিত্র করণের নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পেশ করেছে। যার প্রভাব মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বিস্তার করে চমৎকার জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। মহানবী (সা.) উল্লেখিত লক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে সাফল্য অর্জন করে এমন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছিলেন যেখানে শিক্ষার অপরিসীম তাগিদ ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কোরআন তিলাওয়াত হত। হাজার হাজার হাফেজ ছিল। কোরআন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দীক্ষায় গোটা সমাজ দীক্ষিত হয়েছিল। অপরদিকে তায্‌কিয়া তথা পবিত্র করণের প্রক্রিয়ার চরম উৎকর্ষের ফলে এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুর আসনে আসীন হয়েছিলেন। যারা দস্যু তারা পথ প্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তি পূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতিশীল হয়ে গেল। কঠোরতা ও যুদ্ধ লিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজ করতে লাগলো। সামাজিক নিরাপত্তা শান্তি শৃঙখলা ন্যায়নীতি প্রাধান্য পেল। দূর হয়ে গেল সকল অন্যায় অবিচার। পাশবিকতার স্থলে নৈতিকতা

---

২২. আয়াতটি নিম্নরূপ: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (আল-কুরআন, ০২ : ১২৯)

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক শিষ্টাচারের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গল্প কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল। হুজুর পাক (স.)-এর সে শিক্ষার প্রভাবে বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির, জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞার, বোধের সঙ্গে বিবেকের, উদ্যোগের সংগে আয়োজনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আদর্শের, কর্মের সঙ্গে নীতির, দায়িত্বের সাথে চরিত্রের, কর্তব্যের সঙ্গে সদিচ্ছার, সেবার সাথে সততার, ত্যাগের সঙ্গে তিতিক্ষার, ভোগের সঙ্গে সংযমের আনুপাতিক সংযোগ-সামঞ্জস্যে উজ্জীবিত ধর্মভীরু ন্যায়নীতি পরায়ণ মানুষ সৃষ্টি করেছে। সমাজে বাস্তবায়িত হয়েছিল তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। সেই সামাজিক রূপরেখায় অধ্যাপক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের আদর্শ ও শিক্ষা কি ভূমিকা রাখছে সে বিষয়েই এখন আলোকপাত করতে চাই।

তাঁর দর্শন ও শিক্ষা কোরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ নির্ভর। তিনি বিশ্বাস করেন অন্তর মধ্যে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ একীন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশু জীবনের সাথে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ইসলামে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নবী করিম (সা.) প্রদর্শিত পথে তাঁর সমগ্র চিন্তা চেতনা সংগ্রাম সাধনা পরিশ্রম প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির এ যুগে ধর্মের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী, নাস্তিকতাবাদীয় বিভিন্ন চিন্তাধারা যে Challenge ছুড়ে দিয়েছে সেই Challenge মোকাবেলায় যে প্রজ্ঞা, যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণ আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে প্রয়োজন ছিল তাঁর সে অভাব পূরণে মাওলানা সাহেব সার্থক ভূমিকা রেখেছেন। ফরাসী চিন্তাবীদ অগাস্ট কোঁতে মানুষের চিন্তার ক্রমোন্নাতির ইতিহাসকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রথম হলো, ইলাহিয়াতী বা ধর্ম তাত্ত্বিক স্তর। যখন বিশ্বের ঘটনারাজির ব্যাখ্যা আল্লাহর শক্তির বরাতে প্রদান করা হতো। দ্বিতীয় স্তরে পরাবিদ্যার স্তর যখন নির্দিষ্ট কোন আল্লাহ বা স্রষ্টার নাম না থাকলেও ঘটনা রাজির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অজড় উপাদান বা অলৌকিক শক্তির বরাত দেওয়া হতো। তৃতীয় হলো নিশ্চিত জ্ঞানের স্তর। যখন ঘটনা রাযির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এমন কার্যকরণের বরাত দেওয়া হয়, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জানা ও বুঝা যায়। এ শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী আমরা তৃতীয় স্তরের যুগে অবস্থান করছি। যখন যুক্তিহীন-প্রমাণহীন ভাবে কেউ কিছু মেনে নেয় না। দর্শন শাস্ত্রে এর নাম হলো ন্যায় শাস্ত্রীয় নিসর্গবাদ (Logical positivism). আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে আখেরাতের বিশ্বাসে এ যুগের সেই ঈযধষষবহমব মোকাবেলায় তিনি মহা ভাবনা, মহাস্বপ্ন, জীবন রহস্য, দেহতত্ত্ব নামক অমর গ্রন্থের রচনা করে সমাজকে উপহার দিয়েছেন।

আধুনিক যুগকে ধর্মহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে নাস্তিকতার যুগ আখ্যা দেওয়া চলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সৃষ্টি জগত সম্পর্কে মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা রাজির জড়বাদি ব্যাখ্যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হবার পর বস্তু সম্পর্কিত মানুষের অতীতের যাবতীয় ধ্যান ধরাণা বদলে গিয়েছে। গত কয়েক শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় একদল খোদাদ্রোহী আধুনিক চিন্তাবিদের জন্ম দিয়েছে যাদের মতে ধর্ম কোন প্রকৃত বস্তু নয় বরং এটা হচ্ছে মানুষের সেই বৈশিষ্ট্যের ফলশ্রুতি, যে বৈশিষ্ট্যের কারণে সে সৃষ্টির রহস্যাদীর একটা ব্যাখ্যা দিতে চায়। আধুনিক বিবর্তনবাদ প্রসূত জ্ঞান আমাদের বলে যে, বাস্তবতা শুধু তারই নাম যা প্রত্যক্ষ করা যায় বা অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জন করা যায়। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী ধর্ম হচ্ছে ঘটনা সমূহের একটি অবাস্তব বিশ্লেষণ। নিউটন প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃতি জগত একটা অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন। যার অধীনে যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্র আবর্তিত বিবর্তিত হচ্ছে। তাই এমন কোন আল্লাহ নেই যিনি গ্রহ নক্ষত্রের গতির উপর শাসন চালাচ্ছেন। পরবর্তী সময়ে লা-প্লাস বার্ট্রান্ড রাসেল সহ আরও অনেকে এই তত্ত্বের উন্নতি সাধন করে যাবতীয় ঘটনাবলীকে এমন একটি চিরন্তন নিয়মের অধীনে নিয়ে আসেন যা প্রকৃতির নিয়ম নামে জ্ঞাত হয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তো বলেই বসলেন যে, যেহেতু সব কিছুর স্রষ্টা থাকতে হয় তা হলে আল্লাহর ক্ষেত্রেও একজন থাকতে হবে, অন্যথায় আল্লাহ অস্তিত্বের দাবী টিকছে না। বস্তুতঃ স্রষ্টা বলতে কিছু নেই সবকিছুই কারণের ফলে। এই মত অনুযায়ী মানুষ ঐ সব কারণের সৃষ্টি, যে গুলোর সুচিন্তিত কোনো উদ্দেশ্য নেই। তার সূচনা, ক্রমবিকাশ, আশা-আকাংখা, ভয়ভীতি, প্রেমপ্রীতি, আকীদা, বিশ্বাস সব কিছুই পরমাণুর আকস্মিক সমন্বয়ের ফলশ্রুতি। সবর হলো তার জীবনের পরিসমাপ্তি। পুনুরুত্থান, বিচার, বেহেস্ত, দোযখ বলতে কিছু নেই। জীব বিদ্যার ক্ষেত্রে ডারউইন ও পাস্‌সার স্রষ্টার কল্পনা বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে বিবর্তন বাদের ধারণা প্রচার করলেন। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দর্শনে ধর্মকে ঐতিহাসিক ধাপ্পাবাজী বলে আখ্যায়িত করা হল। লেনিন যুব কমিউনিষ্টলীগের তৃতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসে বললেন, আমরা মোটেই আল্লাহতে বিশ্বাস করি না। আমরা জানি গীর্জার অধিপতি জমিদার বুর্জোয়া শ্রেণী। যারা আল্লাহর বরাত দিয়ে কথা বলে তারা স্রেফ শোষক হিসেবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়। আমরা বলি এটা একটি ধোকাবাজী, একটি প্রতারণা। এ সকল চিন্তা আধুনিক যুগকে এমনভাবে আন্দোলিত করে যে, তা ধর্মের প্রতি তথা ইসলাম ও তার বিধানদাতা মহান আল্লাহর প্রতি মানুষের বিশ্বাস একীন ম্রীয়মান হয়ে পরে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, দীন বা ধর্ম বলতে বাস্তব অর্থে শুধুমাত্র ইসলামকে বুঝাবে। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পছন্দ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার জন্য আজ যে ধর্ম স্বীকৃত বা অনুমোদিত তা ইসলাম এবং একমাত্র ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

তাই ইসলামের বিধানদাতা মহান আল্লাহ উপরোল্লিখিত বিভ্রান্তিমূলক চিন্তার অন্বেষী খোদাদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রেরিত রাসূল হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পাক কালামের নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করলেন বিশ্বজগতে এবং ওদের নিজেদের মধ্যে। ফলে ওদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই একমাত্র সত্য। এ আয়াতের মর্মবাণী হল স্রষ্টাকে জানার জন্য প্রয়োজন তার সৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝা। আর আল্লাহ পাকের সৃষ্টি বলতে এই বিশাল বিপুল মহাবিশ্ব, আদিঅন্তবিহীন অনন্ত অসীম নক্ষত্র নীহারিকা অধ্যুষিত এক বিশালতা এবং মানুষসহ সমস্ত প্রাণীকূল বুঝায়। আল্লাহ পাক এ সৃষ্টিরাজীর প্রতি ইশারা করে বলেছেন যে, এ মহাবিশ্বের ছোট বড় সৃষ্টি তথা আকাশ পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তার একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের দেহ ও প্রাণ। তার এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে, তার গ্রন্থি সমূহে, গায়ের চামড়ায়, আংগুলের ছাপে অঙ্কিত রেখায় সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের জন্য যে চিন্তার ইশারা রয়েছে তা যদি কেউ ভাবে তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন যার জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যার সমকক্ষ কেহ হতে পারে না। আল্লাহ পাকের আয়াতে কারিমার বিষয়বস্তু সামনে রেখে তিনি তাঁর রচিত 'মহাভাবনা' কিতাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টি উহার ব্যাপকতা ঐ গুলির সুশৃঙ্খল স্তর বিন্যাস ও পরিকল্পিত দুরত্বে অবস্থান, কল্পনাতীত ঘূর্ণীয়মান বস্তু, শক্তির বিজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ এবং ঐ সকল সৃষ্টির মহা সাফল্যজনক সমন্বয়ের পরিনতি জীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে যে ভূমিকা রাখছে তার জ্ঞানগর্ভ বর্ণনা দিয়েছেন।

রাজনীতি ভাবনা

রাজনীতি বর্জিত সাধনার অদ্বিতীয় ব্রত পালন করার অঙ্গীকার তিনি না করলেও সরাসরি সুবিধাভোগী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হবার জন্যে একটি শক্ত আদেশ তিনি তাঁর 'হুজুর কেবলা'র (হযরত ইছহাক) নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তবে রাজনীতি শব্দটাকে তিনি গ্রহণ করেছেন ভিন্নভাবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তা নয়। জনগণ থেকে দূরে নয়, বরং কাছেই ছিলেন তিনি। পরিণত হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যক্তিত্বে। তাঁর কাছে বিশুদ্ধতার অনুপ্রেরণায় আসা মানুষগুলোকে তিনি আপন শিক্ষা-জ্ঞান-অভিজ্ঞান-অর্জন দান করতে চেয়েছেন।

এই নেতৃত্বকে পরোক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলা যায়। এ কারণে যে, মানুষের প্রতি দরদ, ভালোবাসা, তাদের স্বভাবকে উত্তরোত্তর উন্নত করার চেষ্টা, তাদের নানা দুঃখ-অসুবিধার খোঁজ নেয়া, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সর্বোপরি শারীরিক-মানসিক পরিচর্যা করা, এ সবই

Dhaka University Institutional Repository

চলমান জীবনস্রোত ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের চেষ্টা। নিজস্বত্ত্বার প্রকৃতির অদম্য টানেই সমাজ-অন্যায়লিপ্ত, অপকৃষ্ট পথ–বিচ্যুত অথবা সঠিক পথ অন্বেষী মানুষগুলোকে কাছে টেনেছেন তিনি। তাদেরকে মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছেন।

মজলিশে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, এখানে (অর্থাৎ তাঁর সংস্পর্শে) সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল রাজনৈতিক দলের মানুষের পথ উন্মুক্ত। নিজেকে সর্বদলীয় এবং নির্দলীয় ভেবেছেন এই অর্থেই। তিনি জানতেন, সকল ভেদাভেদ উপরে মানুষের স্থান। সুতরাং পক্ষপাতহীন ধর্ম। ধর্মের পূর্ণ আনুগত্য করেও যে কতটা অসাম্প্রদায়িক, উদার হওয়া যায়, তা তিনি প্রমাণ করে গেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি তাঁর মজলিসী পরামর্শ ছিল– "তারা যেন একে অপরের অর্জন বা ভাল কাজকে প্রশংসার মাধ্যমে অন্তত স্বীকার করে নেয়।" তা হলে এ গরীব দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিদেশী শক্তির প্রভাব সত্ত্বেও অনেকটাই কমে আসবে। তিনি সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক ছিলেন। ৫২'র ভাষা আন্দোলনে ভাষার দাবিতে বের হওয়া মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন তিনি। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও নানাভাবে সাহায্য করেছেন মুক্তিসেনাদের। দেশপ্রেমের কিংবা স্বাধীনতার পক্ষে যারা কপট ভক্তি দেখায়, তাদের তিনি ঘৃণা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলাম ও তাসাউফ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলাম ও তাসাউফ

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম (اسلام) শব্দটি (سلم) শব্দমূল হতে গঠিত বাবে 'ইফ্'আল' (باب افعال) -এর মাসদার। আল-কুরআনের আট জায়গায় ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১] সাল্‌ম (سلم) শব্দটির নিম্নোক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য:

১। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা (বিপদ-আপদ) ও দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত (পবিত্র)।

২। সন্ধি ও নিরাপত্তা। "অতএব তোমরা হীনবল হইওনা এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না।"[২]

৩। শান্তি এবং

---

১. পবিত্র কুর'আনের ৮টি স্থানে ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

ক. إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (আল-কুরআন, ৩ঃ১৯)।

খ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (আল-কুরআন, ৩ঃ৮৫)।

গ. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (আল-কুরআন, ৫ঃ৩)।

ঘ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (আল-কুরআন, ৬ঃ১২৫)।

ঙ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (আল-কুরআন, ৯ঃ৭৪)।

চ. أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (আল-কুরআন, ৩৯ঃ২২)।

ছ. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (আল-কুরআন, ৪৯ঃ১৭)।

জ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (আল-কুরআন, ৬১ঃ৭)।

২. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ আল-কুরআন, ৪৭ : ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৪। আনুগত্য ও হুকুম পালন। "আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।"[৩]

সালাম এবং সাল্‌ম এই উভয় শব্দেরই অর্থ হচ্ছে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম পালন। উক্ত অর্থগুলোর মধ্যে 'পবিত্র' ও 'দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া' শব্দটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য[৪]।

অভিধান রচয়িতাগণ ইসলাম শব্দের নিম্নোক্ত পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করেছেন- "শারী'আতী পরিভাষায় ইসলাম শব্দের অর্থ- (আল্লাহর প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ এবং রাসূল (স.) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে আনীত সুন্নাহকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও ধারণ"।[৫]

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হইতেছে ইসলাম (৩ঃ১৯)- এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইসলাম শব্দের নিম্নোক্ত চারটি অর্থ বর্ণনা করেছেন-

১. ইসলামে প্রবেশ করা
২. আকীদা এবং দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা, যে ব্যক্তি স্বীয় ইবাদতকে একামত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে সে মুসলিম।
৩. ঈমান এবং
৪. আনুগত্য ও ফরমানদারী।[৬]

ইসলাম একটি 'দ্বীন'[৭] এবং দ্বীন অর্থ পারস্পরিক ব্যবহার, লেন-দেন ইত্যাদি। এই দীনের প্রধান উৎস আল-কুরআন। এতে বিধৃত দ্বীন ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা যা- স্বীকৃতি, আনুষ্ঠানিক ইবাদত, দার্শনিক ইত্যাদি অপেক্ষা মানুষের কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। 'ধর্ম' বা 'Religion' বলতে সেক্ষেত্রে মুলত আধ্যাত্মিক এবং পারত্রিক জীবন-দর্শন ও ক্রিয়াকর্ম বুঝায়, সে অর্থে ইসলামকে একটি 'ধর্ম' রূপে অভিহিত করলে এর অনেক কিছু অনুক্ত থেকে যায়।[৮]

---

৩. أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (আল-কুরআন, ২ : ৭১)
৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, খ.৫, পৃ. ২৯৫
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
৬. *তাফসীর-ই কাবীর*, ২য় খন্ড, মিসর: ১৩১০ হি, পৃ. ৬২৮
৭. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (আল-কুরআন, ৩ : ১৮)
৮. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

'ইসলাম মানবের চিরন্তন ধর্ম'[৯] -এর মূলকথা হলো:

(ক) আল্লাহর একত্ব ও অদ্বীতিয়ত্বে বিশ্বাস

(খ) ইয়াওমুল আখির বা মৃত্যুর পর পুণরুত্থান ও বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস এবং

(গ) আমলে সালিহ বা সৎকর্মে আত্মনিয়োগ।

বিশ্বাসের পর্যায় ১. ফিরিশতাগণ, ২. আসমানী কিতাবসমূহ এবং সকল নবী-রাসূল, আর ৪. আল্লাহর সীমা নিয়ন্ত্রণ।

'তাকদীর'-এ বিশ্বাসও উপরোক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সাথে যুক্ত হয়। আদি পিতা ও নবী আদম (আ.) হতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আল-কুরআনে উল্লিখিত বা অনুল্লিখিত সকল নবী-রাসূল[১০] পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে[১১] উপরোক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত ইসলামের প্রচার করেছিলেন। এই তিনের ভিত্তিতে আল-কুরআন সমসাময়িক ইহুদী খৃষ্টান, সাবিঈ ও মাজুসী তথা অপর সকল ধর্মাবলম্বীকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল[১২] এবং এই আহ্বানে সাড়া দিলে নিরাপত্তা ও মুক্তির নিশ্চয়তা দান করেছিল। এখনও সে আহ্বান কার্যকর।[১৩]

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত

১. ঈমান : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল এই দুইটি বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান। মহান আল্লাহর অস্তিত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে কবুল করা হল ঈমান। আল্লাহ শব্দটি সৃষ্টিকর্তার সত্তাবাচক নাম।

---

৯. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ আল-কুরআন, ৩ : ১৯

১০. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (আল-কুরআন, ৪০ : ৭৮)

১১. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ (আল-কুরআন, ১০ : ৪৭); আল্লাহ আরো বলেন, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (আল-কুরআন, ১৩ : ৭); অন্যত্র আছে, وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (আল-কুরআন, ৩৫ : ২৪)

১২. আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (আল-কুরআন, ২ : ৬২)

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতম মতানুসারে আল্লাহ শব্দটি ঐ চিরন্তন সত্ত্বার সত্ত্বাবাচক নাম যার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং যিনি সমস্ত প্রশংসনীয় ও উদম গুণাবলীর অধিকারী।[১৪]

২. **সালাত** : ইবাদতমূলক আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী।

৩. **সাওম** : প্রত্যেক সুস্থ মুসলিমের উপবাসমূলক ইবাদত।

৪. **যাকাত** : ধনীর সম্পদে নির্ধনদের অধিকার স্বীকৃতিমূলক অপরিহার্য এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ দান।

৫. **হাজ্জ** : মুসলিমদের কিবলা মক্কার কাবা ও তা সন্নিহিত স্থানসমূহে প্রত্যেক সুস্থ, সাবলম্বী এবং সক্ষম মুসলিমের পক্ষে জীবনে অন্তত একবার একটি বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদত সমাপন।

এছাড়া জিহাদ সন্ত্রাস রূপে কথিত হয়। জিহাদ অর্থ কল্যাণমূলক কর্ম-প্রচেষ্টা, অকল্যাণকর কর্মের প্রতিরোধ, জান-মাল, আবরু ও বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষার সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং বিশ্বাসের প্রচারাধিকার রক্ষামূলক সংগ্রাম। প্রয়োজনে সংযত এবং ন্যায়ভিত্তিক সশস্ত্র সংগ্রামও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রচারিত ইসলাম সমসাময়িক ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাগুলো থেকে বহু বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইসলামের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে বহু মানবগোষ্ঠী বা অপর ধর্মবলম্বীরা ইসলামের অনেকগুলি নীতি সাকুল্যে বা আংশিকভাবে তাদের সমাজ বিধানের অন্তর্ভূক্ত করার ফলে ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো এখন আর তেমন প্রকটভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা।[১৫] এরকম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে চিহ্নিত করা হলো:

১। ইসলামে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত মানবগোষ্ঠীর উপাস্য নন। তিনি সর্বগুণে বিভূষিত, সর্বদোষমুক্ত, সর্বশক্তিমান, নিরাকার এবং সাদৃশ্যবিহীন সত্তা। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আসমাউল হুসনা'-য়, যা সীমিত শক্তির আওতায় মানুষের করণীয়। সুতরাং আল্লাহ একাধারে মানুষের উপাস্য এবং আদর্শ।

২। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন নবী অতি মানব নন। তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ধর্মাধিকরণরূপে অভ্রান্ত বিধান দেয়ার কোন অধিকার লাভ করেনা, অনুসারীর পাপ

---

১৪. আল্লামা তাফতাথানী, *শরহে তাহসীব*, ২য় খন্ড, পৃ. .....

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, খ.৫, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

মোচনের ক্ষমতা অর্জন করেনা। পৌরহিত্য বা যাজকত্বের স্থান ইসলামে নেই। আল-কুরআন অধ্যয়ন এবং এর ব্যাখ্যা দান কোন সম্প্রদায়ের বা কোন বর্ণের বিশেষ ইখতিয়ারভুক্ত নয় এবং ইবাদত এবং নীতিনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনে কুরআন মাজীদ শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিবেচনায় ইসলাম বাধ্যতামূলক শিক্ষা নীতির প্রবর্তক।[১৬]

৩। সকল সম্প্রদায়ের নবী-রাসূলকে, সকল নবীর প্রাপ্ত ওহী তথা আসমানী কিতাবকে স্বীকৃতি দানের[১৭] মাধ্যমে ইসলাম অপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় দেয়, দীনের ঐক্য এবং বিবর্তনমূলক শরী'আয় পূর্ণতা ঘোষণা করে[১৮], মানব চরিত্রের উৎকৃষ্ট সাধন এবং মানবজীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য ওহীপ্রসূত প্রজ্ঞার অপরিহার্যতা ঘোষণা করে।[১৯]

৪। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবসত্ত্বা 'ফী আহসানি তাকবীম' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সৃষ্ট[২০], পাপের পক্ষে তার জন্ম নয়, আদি পিতার পাপে বোঝাও সে বহন করেনা।[২১] সে তার আপন কর্মের জন্য দায়ী[২২], মানবসত্তা সম্বলিত, জ্ঞানে গুনে সে ফিরিশতাকে ও ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে[২৩], সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিভূ[২৪], সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের সহজাত প্রবণতা নিয়ে সে জন্ম গ্রহণ করে।[২৫]

৫। ইসলাম ইহজীবনের পর অনন্ত পারলৌকিক জীবনের পক্ষে রায় দেয়, এতে জন্মান্ত রবাদীদের সমর্থন পাওয়া যায় না, মোক্ষ বা নির্বান প্রাপ্তির জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দান করে না।

৬। ইসলাম মানবাধিকারের অভূতপূর্ব ব্যবস্থা দান করেছে। যেমন-

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

১৭. আল্লাহর বাণী, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (আল-কুরআন, ২ : ২৮৫)

১৮. আল-কুরআনে এসেছে, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (০৫ : ০৩)

১৯. আল-কুরআনের সূরা মায়েদার ৪৪-৪৭ আয়াতে এ বিষয়টি বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে।

২০. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (আল-কুরআন, ৯৫ : ৪)

২১. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

২২. আল্লাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (আল-কুরআন, ০২:২৮৬)

২৩. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (আল-কুরআন, ০৭ : ১১)

২৪. বিস্তারিত বিবৃত: আল-কুরআন, ২:৩০ ও ৬ : ১৬৫

২৫. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (আল-কুরআন, ৩০ : ৩০); আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, জানাযিয অধ্যায়, হাদীস নং- ১২৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

ক. নারীর সামাজিক মর্যাদা বিধান ইসলামের অবদান। সম্পত্তির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণে সে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করেছে। স্বামী ও পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেছে, সেক্রিমেন্টের (Sacrament) শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করে 'সামাজিক চুক্তির' আওতায় তার ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাফবীস (تفويض) এর শর্তে নারী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পেয়েছে।

খ. গোলাম ইসলামী বিধানে তার মানবিক মর্যাদা পেয়েছে। গোলামকে স্বাধীনতা প্রদান ইসলামে একটি পূণ্যময় অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে।

গ. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর স্বার্থে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি ইসলামের অবদান। ইসলাম সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী, এমন কি অমুসলিমের ধর্ম-মন্দির রক্ষার দায়িত্ব মুসলিমের উপর বর্তায়। যদি কেউ তা ধ্বংশ করতে চায়।[২৬] কা'বায় উপাসনার অধিকারে হস্তক্ষেপকারী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদকারী মুশরিকদের বিচারেও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।[২৭] ইসলামী আইনের শাসন (عدل) অপর ধর্মাবলম্বীগণের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

ঘ. যুদ্ধরত বিধর্মীদেরও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে যারা যুদ্ধরত নয় বা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় যথা- অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, শ্রী-মন্দিরাশ্রয়ী সাধু, তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ, অযথা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘরবাড়ী, ভুমি ধ্বংস করা যাবে না। সুতরাং শান্তির প্রস্তাব অবশ্য গ্রহণীয় এমনকি প্রতিপক্ষের শঠতার সন্দেহ থাকলেও। শান্তির খাতিরে অসুবিধাজনক শর্তেও সন্ধির নজীর রয়েছে। বিনা বিজ্ঞপ্তিতে এককভাবে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করা যাবেনা।[২৮] যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে না দেয়া হয় ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবেনা। উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেয়া নিষিদ্ধ যদি তার জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করতে হয় যুদ্ধবন্দীদের প্রতি

---

২৬. বিস্তারিত দ্র. আল-কুরআন, ২২ : ৪০

২৭. আল্লাহর বাণী, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (আল-কুরআন, ০৫:০২) তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا (আল-কুরআন, ৫ : ৮)

২৮. আল্লাহর বাণী, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (আল-কুরআন, ৮ : ৫৮)

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক ব্যবহার করতে হবে।[২৯] মোটকথা, ইসলাম অতি পরিচ্ছন্ন আন্ত র্জাতিকতা ধারক ও বাহক।[৩০]

৭। ইসলামে ধন-বৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ হারাম, যাকাত ওয়াজীব, উত্তরাধিকার আইন সম্পদ বণ্টনমূলক।

৮। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর[৩১]; প্রশাসন ব্যবস্থা খিলাফত নীতিতে। খলীফা আইনের উর্ধ্বে নন, তাঁর কোন Prerogative বা বিশেষ সুবিধা নেই, জনগণের সম্মতির উপর তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি, প্রতিনিধিত্বমূলক গণপরামর্শে সেই ক্ষমতার পরিচালনা করতে হবে।[৩২] খলীফা জনগণের আনুগত্য দাবী করতে পারেন যতক্ষণ তিনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। ব্যক্তির প্রাধান্য ধর্মনিষ্ঠার (তাকওয়া) ভিত্তির উপর স্থাপিত[৩৩], কোন বর্ণ, গোত্র, বাহুবল বা উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; সুতরাং এই ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদের স্থান নেই।

৯। ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ করে অত্যন্ত ব্যপকভাবে। এতে পার্থিব জীবন এবং ধর্মীয় জীবনের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় না। কল্যাণকর সব কাজই ইবাদত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা করা হয়। সব কাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। বিদ্রুপাত্মকভাবে জনৈক বিধর্মী সালমান (রা.) কে বলল, 'তোমাদের বন্ধু (রাসূল) তো তোমাদেরকে এমনকি মল-মূত্র ত্যাগেরও প্রণালী শিক্ষা দিয়ে থাকেন!' সালমান (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করতে, ডান হাত দিয়ে শৌচক্রিয়া সম্পাদন করতে নিষেধ করেন।'[৩৪]

তাসাউফ পরিচিতি

পুরো দ্বীন ইসলামের উদ্দেশ্য হল পূর্ণ মুক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভে ধন্য হওয়া। প্রধানত এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সূফীবাদ বা তাসাউফের জন্ম। সূফী শব্দের মূল ধাতু কী এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

---

২৯. আল্লাহর বাণী, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (আল-কুরআন,৭৬ : ৮)

৩০. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৩১. আল্লাহ বাণী, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (আল-কুরআন, ৬ : ৫৭)

৩২. আল্লাহর বাণী, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (আল-কুরআন, ৪২ : ৩৮)

৩৩. আল্লাহর বাণী, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩)

৩৪. উদ্ধৃত- সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

> সূফী শব্দের অর্থ ছুফ অর্থাৎ পশমের খদ্দর পরিধানকারী। যাঁহারা সর্বদা দিলকে গায়রুল্লাহর খেয়াল হইতে পবিত্র রাখেন, দিলের মধ্যে আল্লাহর খিয়াল ছাড়া অন্য খেয়াল আসতে দেন না, যাঁহারা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাহ্যিক আড়ম্বর ও দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ করিয়া শরীআতের পায়রবীর জন্য এবং ধর্ম ও লোকসমাজের উপকার ও খেদমতের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সূফি বলে।[৩৫]

তাসাউফ (تصوف) আরবী শব্দটি বাবে *তাফাউল* (تفعل) -এর মাসদার। এখান হতেই 'ছুফফুন' বা কাতার এর উৎপত্তি। অর্থাৎ তারা আল্লাহর বিধানাবলী পালনে প্রথম সারির অন্তর্গত।

শাইখুল ইসলাম হাফিজ ইব্ন তাইমিয়া (রহ.) স্বীয় ফতোয়ার এগারতম খণ্ডে তাসাউফ সম্পর্কে লিখেন- "তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সূফী শব্দের ব্যবহার ছিল না। তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্তী'- যুগে তার ব্যবহার শুরু হয় এবং বহু ইমাম ও শায়খদের বক্তব্যেও এই শব্দ পাওয়া যায়। যেমন- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.), আবু সুলাইমান দারামী (রহ.), সুফিয়ান ছাওরী (রহ.), হাসান আল-বসরী (রহ.) প্রমুখের নিকট হতে সূফী শব্দ বর্ণিত হয়েছে।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত *'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম'* নামক গ্রন্থে সূফীবাদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> মুসলিম দর্শনে 'তাসাউফ' সূফীবাদ নামে খ্যাত। সূফী শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, সূফী শব্দটি 'আহলুস সুফফা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে, সূফী শব্দটি সূফ বা পশম শব্দ হতে উৎপন্ন। কেননা, পশমী বস্ত্র সরলতা ও আড়ম্বরহীনতার প্রতীক। রাসূলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) বিলাস-বাসনের পরিবর্তে সাদাসিধা পোষাক পরিধান করতেন। তাই এ পশমী পোশাক পরিধানকারীগণ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে 'সূফী' নামে পরিচিত।[৩৬]

"আবার কেউ বলেছেন সূফী শব্দটি 'সাফা' থেকে এসেছে। আর 'সাফা' শব্দের অর্থ হলো পরিস্কার বা পবিত্রতা অর্থাৎ যারা মনের কুপ্রবৃত্তিকে দমন ও পরাভূত করে আত্মা পরিস্কার ও পবিত্র করে সর্বক্ষণ মহান আল্লাহর প্রেমে বিমুগ্ধ তারাই হলেন সূফী।"[৩৭]

---

৩৫. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.), *তা'লিমুদ্দিন*, খ.২, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৯২

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯, অষ্টম সংস্করণ, জুন ২০০৯, পৃ. ৬৮৬

৩৭. ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন, *সূফীবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, ঢাকা:২০০১, ভূমিকা দ্র.

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শামী (রহ.) বলেছেন, ইল্‌মে তাসাউফ হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সৎগুণ সমূহের প্রকার এবং তা অর্জনের গণনা এবং অসৎ স্বভাবসমূহের শ্রেণীবিভাগ এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবগত হওয়া যায়।

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) ইল্‌মে তাসাউফের সজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন,

التصوف علم تعرف به احوال تزكية النفوس ونصفية الاخلاق وتعمير الظاهر والباطل لنيل السعادة الابدية-

সুতরাং ইলমে তাসাউফ অর্থ আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 'মুছাল্লামুস সুবুত' কিতাবে উল্লেখ আছে-

الوجدانيات- هو التصوف الباحث عن الاحوال القلبية التى هى

প্রসিদ্ধ তাফসীরকার আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত মাওঃ কাজী ছানাউল্লাহ পানি পথী (রহ.) তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করেছেন-

واما العلم الذى يسمون اهلها بالصوفيه الكرام-

"যে সমস্ত লোক ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে তাসাউফ লাভ করেছেন তাঁরা সম্মানিত সূফী নামে পরিচিত হয়ে থাকেন।"

আল কুরআন এর অন্যতম সূরা আত- তাওবা এর لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জানানুশীলন করতে পারে)[৩৮] আয়াতের ব্যাখ্যায় *'তাফসীরে রুহুল বায়ান'*-এ বলা হয়েছে-[৩৯]

النوع الثانى علم السر — هو ما يتعلق بالقلب وساعية فيقترض على المؤمن علم احوال القلب من التوكل والانابة والخشية والرضاء فانه واقع فى جميع الاحوال واجتناب الحرص والغضب والكبر والحسد والعجب والرياء وغير ذالك-

সুতরাং তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি বলতে আমরা তাই বুঝব যে বিদ্যা বা সাধনার মাধ্যমে মানুষ তাঁর কুপ্রবৃত্তিগুলো দমন করে চারিত্রিক উত্তমগুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নিজেকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তাই তাসাউফ।

---

৩৮. আল-কুরআন, ০৯ : ১২২

৩৯. *তাফসীর -ই-রুহুল বায়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৭০, তাসাউফ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

এ চারিত্রিক শুদ্ধতা, চেষ্টা সাধনা সবই শুধু আল্লহকে চেনার উদ্দেশ্যে আবর্তিত। হযরত মাওলান মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) লিখিত 'মারেফতের ভেদতত্ত্ব'- গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, "আল্লাহকে চিনতে হলে এবং তার সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বা মারেফাত অর্জন করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একনিষ্ঠ সাধনা করতে হয়।"[৪০] এ বিশেষ প্রক্রিয়ার একনিষ্ঠ সাধনার নামই হল 'ইলমে তাসাউফ।

তাসাউফের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

'তাসাউফ' (تصوف) হলো মহান আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জ্ঞানের স্পর্শমণি, যা শায়েখের সুহবতে থেকে আল-কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর আলোকে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব, নিজে নিজে কিতাব পাঠে সম্ভব নয়।[৪১] সূফীবাদ সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "ঐশী পরিব্যাপ্তির গভীর অনুভূতি, যে অনুভূতি কুরআনের শিক্ষাসমূহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নির্দেশাবলী থেকে উৎপন্ন ও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, এই প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে যে অনুধ্যানমূলক বা ভাববাদী দর্শনের জন্ম দিয়েছে তা-ই সূফীবাদ নাম ধারণ করেছে"।[৪২] তাসাউফ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন-

> আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের (তাযকিয়ায়ে নফস ও তাহযীবে আখলাক) প্রশস্ত ও শক্তিশালী নীতি, যা পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা ও বিষয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রতারণা চিহ্নিতকরণ, চারিত্রিক ব্যাধির প্রতিষেধক, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, গোপন সম্পর্ক অর্জন করার উপায়সমূহ পথের ব্যাখ্যা ও বিন্যস্ত করা যার প্রকৃত ভিত্তি তাযকিয়াহ ও ইহসানের নমুনা ও ধর্মীয় ব্যবহার প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল।[৪৩]

আল্লামা শামী (রা.) বলেন, ইলম তাসাউফ হলো, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান' এ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সৎগুণসমূহের প্রকারভেদ এবং তা অর্জনের পন্থা ও অসৎ স্বভাবসমূহের শ্রেণীবিভাগ এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবগত হওয়া যায়।[৪৪] শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আল আনসারী (রা.) 'ইলম তাসাউফের সংজ্ঞা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "যে

---

৪০. মৌঃ মোঃ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী, *মারেফাতের ভেদতত্ত্ব*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯, পৃ. ৩০

৪১. ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বায়'আত*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১খ্রি., পৃ. ৬

৪২. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্যা স্পিরিট আব ইসলাম* (অনু. ড. রশীদুল আলম), কলিকাতা: মিল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯১খ্রি., পৃ. ১৬

৪৩. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *তাযকিয়াহ ওয়া ইহ্সান* (অনু. মুহাম্মাদ আবুল বাশার আখন্দ), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭খ্রি., পৃ. ১৬

৪৪. অধ্যাপক মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম, *হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ (রহ.) -এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

'ইলমের দ্বারা অনন্ত সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের যাহির ও বাতিন গঠন করা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় তাকে 'ইলম তাসাউফ বলে।"[৪৫]

'সূফী' ও তাসাউফ শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণ

আধ্যাত্মিক মুসলিম দর্শনের তাসাউফ (تصوف) সূফীবাদ নামে খ্যাত। 'সূফী' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষকদের মাঝে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, 'সূফী' শব্দটি 'আহলুস্ সুফ্ফা', থেকে উৎপত্তি। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে, " 'সূফী' শব্দটি 'সূফ' (পশম, উল) শব্দ হতে উৎপন্ন।"[৪৬] কারো কারো মতে, 'সূফ' (কাতার, পংক্তি, সারি অর্থজ্ঞাপক) শব্দ 'তাসাউফ' এর উৎস। কেননা সূফীগণ বিশেষত 'আমলের দিক দিয়ে প্রথম কাতারের লোক। মোল্লা জামী 'সাফা' (পরিচ্ছন্নতা, অকৃত্রিমতা) শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি বলেছেন। কারণ সূফীগণ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী।[৪৭]

পাশ্চত্যের কিছু সংখ্যক পণ্ডিত 'সূফী' শব্দটিকে গ্রীক শব্দ 'সোফিস্ট' (Sophist) বা জ্ঞানী থেকে উৎপন্ন বলেছেন।[৪৮] তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 'সূফী' শব্দটি পূর্বে উল্লেখিত 'সূফ' (পশম, উল) শব্দ হতে নিস্পন্ন। কেননা, পশমী বস্ত্র সরলতা ও আড়ম্বরহীনতার প্রতীক। রাসূলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণ বিলাস, ব্যাসনের পরিবর্তে সাদাসিধা পোশাক পরিধান করতেন। তাই এ পশমী পোশাক পরিধানকারীগণ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে 'সূফী' নামে পরিচিত।[৪৯] অনেক হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) পশমী বস্ত্র পরিধান করেছেন।[৫০] হযুর (স.) পশমী পোশাক পরা অবস্থায় ইনতিকাল করেন।[৫১] হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা যখন হযরত মুসা

---

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. গাওছুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানী সাহেব (রহ.), (অনু. মাওলানা আবদুল জলিল (রহ.)), *সিররুল আসরার*, ঢাকা : হক লাইব্রেরী, ১৯৮৬, পৃ. ৫২ ; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৩৯৩ ; সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনের ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৬৮৬

৪৭. সংকলন, *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৮১; আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), *'ইসলামী তাসাউফের স্বরূপ*, ঢাকা: সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ২০০২, পৃ. ৯

৪৮. খালীক আহমদ নিজামী, *তারীখে মাশায়েখ চিস্ত*, দিল্লি: ১৯৬৩, পৃ. ১৮

৪৯. *সিররুল আসরার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৫০. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দেওবন্দ: কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ, ১৩৯৩, কিতাবুল লিবাস, ১ম খণ্ড

৫১. ইমাম তিরমিযী, *জামি'উ তিরমিযী*, দিল্লী: কুতুব খানায়ে রাশীদিয়া, আবওয়াবুল লিবাস, তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

(আ.)-এর সাথে কথোপকথন করেছিলেন তখন মুসা (আ.) আপাদমস্তক পশমী বস্ত্র পরিহিত ছিলেন।[৫২]

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সাথে হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে কথোপকথন প্রসঙ্গে আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহপাক বলেন-

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

অর্থ : মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, 'মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।' তিনি বললেন, 'হে মূসা ! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট করেছি ; সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।'[৫৩]

'ইলম তাছাওউফ (تصوف) সংক্রান্ত উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ড. সিদ্দিকী সাহেব বলেন, প্রথমেই কোটি কোটিবার প্রশংসা ও পবিত্রতাসহ আল্লাহর যিক্‌র করছি, কারণ এ আয়াতে মহান আল্লাহ বান্দাকে 'ইল্‌ম মা'রিফাত শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর নির্ধারিত স্থানে মূসা (আ.) উপস্থিত হল এবং আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বললেন। অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার সাথে কথা বলেন এবং হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর মহাপবিত্র কণ্ঠ শুনে ধন্য হয়েছিলেন। তারপর মূসা (আ.) আরয করলেন, "আল্লাহ আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখবো"।[৫৪] এখানে বুঝতে হবে কাগজে যেভাবে লেখা হয় আর মুখের ভাষা অনেক পাথর্ক্য হয় অর্থাৎ তখন মূসা (আ.) আল্লাহর কণ্ঠ শুনে আবেগে

---

৫২. *সুনান ইব্‌ন মাজা*, দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো, বাবুল লিবাস, ১ম খণ্ড; প্রাগুক্ত, *জামি'উ তিরমিযী*

৫৩. আল-কুরআন, ০৭ : ১৪৩-১৪৪; *আল-কুরআনুল করীম বাংলা তরজমা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ২১৩

৫৪. ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র*, (সিদ্দিকনগর, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ইং), পৃ. ১০৯

আপ্লুত হয়ে, আল্লাহর 'ইশ্‌কে পরে, তাঁর ক্বলব কম্পিত হয়ে, চোখের পানি ঝরিয়ে আরয করেছিলেন, "আল্লাহ আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখবো"। তখন আল্লাহ বললেন, "তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না, কিন্তু তুমি এই পর্বতের দিকে তাকাও, যদি এটি স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পারবে"। এখানে, তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না এর অর্থ- তুমি আমাকে দেখে ঠিক থাকতে পারবে না, হতে পারে তুমি জ্বলে যেতে পার, কারণ আল্লাহর মহাশক্তির নিকট বান্দাতো খুবই ক্ষুদ্র সামান্য। তারপর আল্লাহ বললেন, "তুমি এই পর্বতের দিকে তাকাও, যদি সেটি স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে" তারপর আল্লাহ যখন পর্বতের উপর জ্যোতিষ্মান হইলেন, তখন পর্বতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলিল, এখানে 'تجلى' শব্দের অর্থেঃ আত্মপ্রকাশ, দ্বীপ্তি, আবির্ভাব ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। তাই এর অর্থে আল্লাহ পর্বতের উপর আত্মপ্রাকাশ করলেন হতে পারে, আবির্ভাব হলেন হতে পারে, জ্যোতিষ্মান হলেন হতে পারে। তারপর আল্লাহর মহাশক্তিতে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এখন এখানে বুঝার বিষয় হল, কিছু কিছু সাধনাহীন ডিগ্রীওয়ালা 'আলিম ('আলিমে সু) সমাজে আছে যারা বলে আল্লাহকে চর্ম চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তারা এটি বুঝে না যে, দেখা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহকে দেখতে হলে যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন তা মানুষের নেই, পাহাড়ই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল, মানুষতো নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে আল্লাহ দয়া করলে দেখা দিতে পারেন যেহেতু হযরত মূসা (আ.) কে দেখা দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহকে দেখা যায় না এটি যারা বলে খুব সহজেই বুঝা যায় তাদের ঈমান দূর্বল, 'আমল ভাল না, জ্ঞান সীমিত, মুরাক্বাবা করে না, গবেষণা করে না, পরিপূর্ণ সুন্নত মানে না। আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে, "আর মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন আরয করল, নিশ্চয় আপনার সত্তা পবিত্র, আমি আপনার হুযুরে ক্ষমা চাইতেছি এবং আমি আগে হতেই বিশ্বাসী"। মুসা (আ.) অজ্ঞান হয়েছিলেন। তারপর জ্ঞান ফিরার সাথে সাথেই মহান আল্লাহর যিক্‌র করে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। উক্ত আয়াতের একটি অংশ চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার মুশাহাদার ২য় সবকে বিশেষ নিয়মে তা'লিম দেয়া হয়।[৫৫]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সূফী সাধক মাওলানা সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহ মূসাকে (আ.) বললেন, তুমি কখনই আমাকে দেখবে না কিন্তু যদি একান্তই না ছাড় তবে পাহাড়ের দিকে নজর করে দেখ অর্থাৎ আমাকে দেখ।[৫৬]

---

৫৫. ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, বিশ্ব তা'লিমে য়িক্‌র, (সিদ্দিকনগর, মানিকগঞ্জঃ সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ইং), পৃ. ১১০

৫৬. *মারেফতের ভেদতত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩*

Dhaka University Institutional Repository

বড়পীর সাহেব (রহ.) কর্তৃক তাসাউফ শব্দটি বিশ্লেষণ

বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) (মৃ. ৫৬১হি./১১৬৬ খ্রি.), (تصوف) শব্দটি বিশ্লেষণ করে বলেন, তাসাউফ توبه, صفا , ولايت এবং فنا فى الله এই চারটি শব্দের প্রথম বর্ণ ت ص و ف নিয়ে تصوف শব্দটি উৎপত্তি।[৫৭] এই শব্দ চারটির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

১. توبه (তাওবাহ) : তাওবাহ বা পাপ করে অনুশোচনা করত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা দুই প্রকার- যাহিরী ও বাতিনী। এ বর্ণ হতে ت বর্ণ নেওয়া হয়েছে।

২. صفا (সাফা) : সাফা অর্থ পবিত্রতা। ছাফা শব্দ থেকে ص বর্ণ নেওয়া হয়েছে। পবিত্রতাও দুই প্রকার – যাহিরী ও বাতিনী।

৩. ولايت শব্দের প্রথম বর্ণ و নেওয়া হয়েছে। বিলায়াতের পবিত্রতায় সর্বদা সুসজ্জিত থাকা।

৪. فنا فى الله শব্দের প্রথম বর্ণ থেকে ف শব্দের শেষ বর্ণ নেওয়া হয়েছে। 'ফানা ফিল্লাহ' শব্দের অর্থে স্বীয় সত্বাকে আল্লাহতে বিলীন করে দেওয়া বুঝায়।[৫৮]

উপরের গবেষণায় আমরা তাসাউফ শব্দটির উৎপত্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূফী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত সাধকগণ যে সকল গুণে গুণান্বিত থাকেন সে সর্ম্পকেও আমরা অবহিত হতে পেরেছি।

তাসাউফের উৎপত্তি ও সত্য হওয়া দলিল

তাসাউফ শব্দটি আল-কুরআনে বা হাদীস শরীফে বা সাহাবীদের জমানাতেও এ শব্দের বা এ পরিভাষার প্রচলন হয় নাই। অবশ্য তাবেয়ীদের যুগে এবং তাবে তাবেয়ীদের যুগে এ শব্দ এবং এ পরিভাষার প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্তু রাসূল (স.) ও সাহাবীদের (রা.) যুগে এ পরিভাষার প্রচলন না থাকলেও এর কর্মধারা ঠিকই প্রচলিত ছিল। বরং রাসূল (স.)-এর রিসালাতের দায়িত্বই হলো তাযকিয়া নাফস তথা সামগ্রীকভাবে মানবজাতির আত্মাকে পবিত্র করার দায়িত্ব। তা হল মানব চরিত্র হতে কুপ্রবৃত্তি দূর করে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান করা। বলাবাহুল্য, একজন মানুষ উত্তম চরিত্রের হওয়াই হল তার জীবনের চরম সফলতা।

---

৫৭. ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, বায়'আত, (সিদ্দিকনগর, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১ইং), পৃ. ৭

৫৮. গাওসুল আযম হযর আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) (অনু. মাওলানা আব্দুল জলিল (রহ.), *সিররুল আসরার*, ঢাকা : হক লাইব্রেরী, ১৯৮৬, পৃ. ৫২; আশরাফুল সাওয়ানেহ-বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত : ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যেই প্রেরিত হয়েছি।'[৫৯] বিশ্বনবী (স.) আরও বলেন, 'মুমিনদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার তারাই যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।'[৬০]

অনুরূপ 'ইলমে ফিকহ্ এর বিস্তারিত সব শাখা-প্রশাখা আল-কুরআনে নেই ঠিক কিন্তু এ শাস্ত্রে মূল উৎস আল-কুরআনুল কারীম। আল-কুরআনে তাসাউফ শাস্ত্র বলতে এ শব্দের পরিবর্তে 'আল-ইহসান', তায্কিয়া ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। রাসূল (স.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা ফরমান-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

এ আয়াতে يزكيهم শব্দ দ্বারা যে তাযকিয়া নাফস উদ্দেশ্য তা নিয়ে সকল ইমাম, মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ ঐক্যমত পোষণ করেন।

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

> আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল নিযুক্ত করে পাঠিয়েছি। তিনি তোমাদেরকে আমার কিতাব পড়ে শুনাবেন, (তোমাদের মধ্যে যত প্রকার খারাপী আছে, যেমন অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যা, নির্বুদ্ধিতা, আত্মকলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, নফস ও শয়তানের দাসত্ব, সুসংস্কার ইত্যাদি হতে) তোমাদেরকে পবিত্র করবেন, তোমাদেরকে আমার কিতাবের গুরুতত্ব এবং সৎবুদ্ধি ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিবেন। আর তোমরা যা না জান তা শিক্ষা দিবেন।[৬১]

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করে বলেন-

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ - لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

---

৫৯. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমদ*, বাকী মুসনাদে মুকসিরীন অধ্যায়, হাদীস নং-৮৫৯৫

৬০. أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا *সুনানু আবূ দাউদ*, আস-সুনান অধ্যায়, হাদীস নং- ৪০৬২

৬১. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ০২ : ১৫১)

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিলায়েত হাছিল হয় দুটি জিনিষের দ্বারা; প্রথমত ঈমান এবং দ্বিতীয়ত তাকওয়া। অতএব, যত বেশী বা কম ঈমান এবং তাকওয়া হবে, ততই বড় বা ছোট বেলায়েত হবে।[৬২]

মানুষের স্বভাব চরিত্র বাহ্যিক বিষয় নয়। অন্তরের শুদ্ধতাই স্বভাব শুদ্ধতার নামান্তর। মানব মাত্রেই দিলের মধ্যে ভাল মন্দ এ দুপ্রকার স্বভাবের বীজ থাকে। ভাল গুণাবলী অর্জন করাকে আরবিতে 'তাহলিয়া' বলা হয়। মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করাকে বলা হয় 'তাখলিয়া'। দিলের এখলাছ অর্জন করা যে একান্ত জরুরী, হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত এবং চিত্তাকর্ষক ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে- "জেনে রেখ! শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে, যদি তা পরিশুদ্ধ হয়, তবে গোটা শরীরই পরিশুদ্ধ হয়। আর যতি তা খারাপ হয়, তবে সমস্ত শরীরই খারাপ হয়। মনে রেখ তা হল কাল্‌ব বা দিল।"[৬৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী- 'অতঃপর আমি তা সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিলাম'।[৬৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী- উম্মতগণের মধ্যে যেরূপ ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে উমর ফারুক সেরূপ।[৬৫]

হাদীস শরীফে রাসূল (স.) ইরশাদ করেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। আর তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আর এটাই হল ইহসান।'[৬৬]

আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'এমন একটি হিসাবের দিন সামনে আসছে যেদিন কারও ধনবল ও জনবল কোন কাজে আসবে না। অবশ্য সেদিন কাজে আসবে একমাত্র রোগ মুক্ত দিল ও পবিত্র আত্মা।'[৬৭] এখান হতে ইসলাহে নাফস এর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়।

---

৬২. বিস্তারিত দ্র. হাকীমুল ইম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.), *তালিমুদ্দিন*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, খ.২, পৃ. ২৫-৩০

৬৩. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ *সহীহ বুখারী*, ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং- ৫০

৬৪. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ (আল-কুরআন, ২১ :৭৮)

৬৫. উদ্ধৃত- দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম; ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ৬৬৮-৮৯

৬৬. أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (*সহীহ বুখারী*, হাসীসে জিব্রাইল, বোখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৪৮)

৬৭. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ- إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (আল-কুরআন, ৭৭ : ৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহর বাণী- 'জীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে তারাই যারা আত্মশুদ্ধি করেছে, আল্লাহর নামের যিকির করেছে অতঃপর নামায আদায় করেছে।' তাসাউফের সারবস্তু ৮টি মৌলিক বিষয়। এই ৮টি বিষয় সবই আল্লাহ আল-কুরআনে সূরা আল-মুযযাম্মিলের শুরুতে উল্লেখ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا - أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا - إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا - إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا - وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا - رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا - وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا - وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا -

অর্থ: হে বস্ত্রাবৃত! রাতে জাগ, কিছু অংশ ছাড়া, অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে; আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী। অবশ্য দলনে রাতের উত্থান প্রবলতর এবং বাকস্ফুরণে সঠিক। দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে। লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদেরকে পরিহার করে চল। ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সমগ্রীর অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদের অবকাশ দাও।[৬৮]

কত চমৎকার ভাবেই না সালিক তথা মুরিদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এ সূরায় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে! এরপরও কি কেউ এ ধারণা করতে পারে তাসাউফ এর ভিত্তি আল-কুরআন ও হাদীসে নাই!

কখন? কবে? কোথা? হতে তাসাউফ তথা সূফী শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে এসব প্রশ্নের সুন্দর উত্তর প্রদান করেছেন হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। তিনি বলেন-

> বাকী রহিয়াছে ছুফি শব্দের তাহক্বীক, এই শব্দ কোথা হইতে, কবে হইতে ব্যবহারে আসিয়াছে? কেননা, খায়রুল কুরুনের মধ্যে তো এ শব্দ ছিলই না। কারণ, ছাহাবী, তাবেয়ী, তাবে' তাবেয়ীন শব্দই আহলে হক্ব হওয়ার যথেষ্ট পরিচায়ক ছিল, তারপর খাস লোকদের আবেদ, যাহেদ ইত্যাদি বলা হইত। কিন্তু পরে যখন বেদআতীদের সংখ্যা বাড়িয়া গেল, তাঁহারাও নিজকে আবেদ, যাহেদ বলিতে লাগিল। তখন যাঁহারা আমল হক্ব ছিলেন, তাঁহারা

---

৬৮. আল-কুরআন, ৭৩ : ১-১১

Dhaka University Institutional Repository

বেদ'আতীদের ধোঁকা হইতে লোকদের বাচাইবার জন্য 'ছুফি' লক্বব এখতিয়ার করিলেন। এমনকি দ্বিতীয় শতাব্দীর ভিতর এই শব্দ সর্বজন পরিচিত হইয়া গেল।[৬৯]

তাসাউফ শাস্ত্রের উষালগ্নে যেসব মহান পুরুষ নিজেদের জীবন বাজী রেখে সাধারণ মানুষের আখলাক চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হলো:[৭০]

- হযরত ইমাম জাফর ছাদিক (রহ.), জন্ম ৮৩ হিজরী, মৃত্যু ১৪৮ হিজরী।
- তাবেয়ী হযরত ওয়াইস ক্বরণী (রহ.) ওফাত ৩৭ হিজরী। ইয়েমেনের ক্বরন গোত্রে এ মহান সাধক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।
- তাবেয়ী হযরত হাসান আল বসরী (রহ.)। জন্ম ২১ হিজরী, মৃত্যু ১১৯ হিজরী।
- তাবেয়ী ইমাম আ'যম আবূ হানিফা (রহ.)। জন্ম ৮০ হিজরী, মৃত্যু ১৫০ হিজরী।
- হযরত রাবিয়া বসরী (রা) জন্ম ৯৩ হিজরী মতান্তর ৯৫ হিজরী, মৃত্যু ১৮৫ হিজরী।
- তাবেয়ী হযরত ওরওয়া ইবন যুবাইব (রহ.) ওফাত ৯৪ হিজরী।
- তাবেয়ী হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.)। ইন্তিকাল ১০১ হিজরী। তিনি ন্যায়পরায়ণতার জন্য ইসলামের পঞ্চম খলিফা হিসেবে অধিক পরিচিত।
- তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ ইবন কা'ব ইবন সালিম (রহ.)। মৃত্যু- ১১৮ হিজরী।
- তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)। মৃত্যু- ১৮১ হিজরী।
- হযরত ইমাম মালিক (রহ.)। তিনি মালিকী মাযহাবে প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। মৃত্যু ১৭৯ হিজরী।
- হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। মৃত্যু ২০৪ হিজরী।
- ইমাম হযরত আহম্মদ ইবন হাম্বল (রহ.)। তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। মৃত্যু ২৪১ হিজরী।
- হযরত আবদুল ওয়াহিদ (রহ.)। মৃত্যু ২৮ সফর ১২৬ হিজরী। যিনি হযরত হাসান আল বসরী (রহ.)-এর খলিফা।
- হযরত ফুযাইল ইবন আয়ায (রহ.)। ওফাত ১৮৭ হিজরী।

---

৬৯. মাও শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) (অনু.), *তা'লিমুদ্দিন*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ. ৯২

৭০. বিস্তারিত দ্র. ড. মুহাঃ মনযুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র*, মানিকগঞ্জ: ছিদ্দিকীয় ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ১৫-২৫

Dhaka University Institutional Repository

- হযরত মালিক ইবন দীনার (রহ.)।
- হযরত মুহাম্মদ ওয়াসে (রহ.)।
- হযরত শাহ্ ইবরাহীম ইবন আদহাম বলখী (রহ.)। ওফাত ২৮ জমাদিউল আউয়াল ২৬২ হিজরী।
- প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী হযরত যুননুন মিসরী (রহ.)। জন্ম ১৮০ হিজরী, মৃত্যু ২৪৫ হিজরী।
- হযরত বায়েযীদ বুস্তামী (রহ.)। জন্ম ১৮৮ হিজরী, মৃত্যু ২৬০ হিজরী।
- হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) জন্ম ২১৫ হিজরী, মৃত্যু ২৯৭ হিজরী।
- হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামীদ আল গাযযালী (রহ.)। জন্ম ৪৫০ হিজরী, মৃত্যু ৫০৫ হিজরী।
- বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)। জন্ম ১ রমযান ৪৭০ হিজরী। মৃত্যু ৮ রবিউল আউয়াল ৫৬১ হিজরী।
- হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.)। জন্ম ৯ জমাদিউস সানি ৫৩৬ হিজরী মৃত্যু ৬ রজব ৬২৭ হিজরী।
- হযরত খাজা কুতুবুদ্দি বখতিয়ার কাকী (রহ.) জন্ম ৫৬৯ হিজরী, মৃত্যু ৬৩৩ হিজরী।
- হযরত আলী আহম্মদ আলাউদ্দিন ছাবির কালীয়ারী (রহ.)। জন্ম ১৯ রবিউল আউয়াল ৫৯২ হিজরী, মৃত্যু ১৩ রবিউল আউয়াল ৬৯০ হিজরী।

তাসাউফের স্বরূপ ও পরিধি

তাসাউফ শুধু জাহিরী কিতাবী ইলমের ও তা'লিমের নাম নয়। বরং ইলম ও তা'লিমের সাথে সাথে সোহবতি ইলম, তরবিয়ত ও আমলের নাম তাসাউফ। সারকথা হল, তাসাউফ চারটি আমলের সমষ্টির নাম।

১। পূর্ণ শরী'আতকে বাস্তব জীবনে রূপায়ণ করতে হবে। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে রাসূল (স.) তাঁর সারা জীবনে যেভাবে আল-কুরআন পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন তা ঠিক সেভাবে আদায় করা বা অনুসরণের চেষ্টায় থাকা।

২। মানুষের নফসের মধ্যে যেসব ময়লা অর্থাৎ কুস্বভাব, কুপ্রবৃত্তি হতে যুক্ত হয়ে নফসের ইসলাহ করা। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- 'নিশ্চয়ই যারা রূহ পরিশুদ্ধ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে এবং যারা রূহকে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।'[৭১]

---

৭১. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (আল-কুরআন, ৯১ : ৯-১০)

Dhaka University Institutional Repository

৩। এক একটি করে আখলাকে নববী নিজের চরিত্রে এবং ব্যক্তি জীবনে ব্যবহারিক হিসেবে কার্যকর করা।

৪। দৃষ্টি পবিত্র, সূক্ষ্ম গভীর করে পূর্ণ শরী'আতকে তার গভীরতম দেশ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে হবে। দাওয়ামে যিকর হাসিল করতে হবে এবং চিরস্থায়ী আনুগত্যের মধ্যে-জীবনের শেষ পর্যন্ত মশগুল রাখতে হবে।

আল্লাহর বাণী- 'যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে শুয়ে অর্থাৎ সর্ব অবস্থায় আল্লাহর যিকরে রত থাকে এবং যারা আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে তারা বলে হে আমাদের রব! আপনি কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেন নি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।'[৭২]

এ পর্যায়ে তাসাউফ পন্থীর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা তথা কি কি বিষয় অনুসরণ করলে সালিক বা মুরিদ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তা বর্ণনার প্রয়াশ পাব ইনশাল্লাহ। যাতে বিস্তারিত ভাবে তাসাউফের স্বরূপ ও পরিধি ফুটে উঠবে।

ক) হক্কানী কামিল-মুকাম্মিল পীরের হাতে বায়াত হওয়া : তাসাউফ শাস্ত্রে সুলুকের জন্য এটাই প্রথম কর্তব্য। পবিত্র কুরআন শরীফে আছে- 'তোমরা (আমাকে চিনার জন্য) একটি অছিলা তালাশ কর।'[৭৩] অছিলার অর্থ এখানে অনেক রকম অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। অছিলা অর্থ উপায়, উপকরণ, নৈকট্যের উপায়, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের একটি বিশেষ পন্থা যা কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেয়া হবে। অছিলা অর্থ-মধ্যস্থ নিমিত্ত[৭৪], সম্বন্ধ করণ ও উপায় নির্ভর[৭৫], সম্বন্ধ করণ[৭৬], নৈকট্য লাভের উপায়।[৭৭]

আল্লাহ অন্যত্র ফরমান, তোমরা সকলেই একজন সাদিক লোকের সঙ্গী হয়ে থাক।[৭৮]

খ) নিয়ত : নিয়ত এর অর্থ-এখানে হবে কোন কাজ শুরুর পূর্বে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক করা। রসূল (স.) বলেন, কাজের বিশুদ্ধতা ও ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[৭৯]

---

৭২. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (আল-কুরআন, ০৩ : ১৯১)

৭৩. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (আল-কুরআন, ০৫ : ৩৫)

৭৪. *লুগাতুল কুরআন*, পৃ. ২৪৫

৭৫. *আল-কাওছার*, পৃ. ৭০১

৭৬. *ফরহঙ্গ-ই-রাব্বানী*, পৃ. ৬৫০

৭৭. *মিসবাহুত লুগাত*, পৃ. ৯৪৬

৭৮. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (আল-কুরআন, ০৯ : ১১৯)

৭৯. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ *সহীহ বুখারী*, বাদাউল ওহী অধ্যায়, হাদীস নং-০১

449931

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গ) ইখলাস : মহান আল্লাহ বলেন 'যেনে রেখ! অবিমিশ্রিত অনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য'।[৮০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন।'[৮১]

ঘ) আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল (স.) ও দ্বীনের প্রতি মহব্বত : আল্লাহর বাণী, 'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন, তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[৮২]

রাসূল (স.) আল্লাহর কাছে যত দু'আ করতে তার মধ্যে অন্যতম হল 'হে আল্লাহ! আপনাকে ভালবাসার তাওফীক আমাকে দিন এবং দান করুন ঐ সমস্ত লোকদের ভালবাসা যারা আপনাকে ভালবাসেন আর দান করুন আমাকে এমন আমলের মহব্বত যে আমল আমাকে আপনার নিকটবর্তী করে দেয়, আর আমার নফস, মাল, পরিবার পরিজন ও সুশিতল পানি অপেক্ষা আপনার মহব্বতকে আমার জন্য অধিক প্রিয় করে দিন।[৮৩]

রাসূল (স.)-এর বাণী, 'তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।'[৮৪]

ঙ) তাওবা ও ইস্তিগফার : তাওবা অর্থ অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। মহান আল্লাহ মু'মিনের তওবা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'[৮৫] রাসূল (স.) বলেন, 'যে ব্যাক্তি পাপ থেকে তাওবা করে, সে এমন হয়ে যায়, যেন তার কোন পাপই নেই।'[৮৬]

চ) তাকওয়া : তাকওয়া আরবি শব্দ এর অর্থ বিরত থাকা, পরহেয করা। শরী'আতের পরিক্রমায় তাকওয়া হল একমাত্র আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখা। সাহাবী হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি

---

৮০. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ আল-কুরআন, ৩৯ : ৩

৮১. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (আল-কুরআন, ৯৮ : ০৫)

৮২. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (আল-কুরআন, ০৩ : ৩১)

৮৩. *জামে' তিরমিযী* সূত্রে *মিশকাত শরীফে* বর্ণিত, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, খ.১, পৃ. ২১৯-২০

৮৪. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *সহীহ্ বুখারী,* ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং- ১৪

৮৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

৮৬. التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ (ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনান,* আয যুহুদ অধ্যায়, হাদীস নং- ৪২৪০)

Dhaka University Institutional Repository

নিজেকে শিরক, কবীরা গুণাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

মুত্তাকী ব্যক্তি সততা আমানতদারী, ধৈর্য, আদল ও ইনসাফ ইত্যাদি ধরণের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। মুত্তাকীর পরিচয় প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা গায়েবের প্রতি ইমান রাখে, নামায কায়েম করে, তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। আর যারা আনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান রাখে, আর তারা আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"[৮৭]

ছ) তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপর ভরসা করা। যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত হলে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে তাওয়াক্কুল যে সব গুণের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহর বাণী-

- 'আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুমিন হও।'[৮৮]
- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।[৮৯]
- যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।[৯০]

জ) যিকর : যিকর এর আভিধানিক অর্থ স্বরণ করা। শরী'আতের পরিভাষায় মনেপ্রাণে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করাকে যিকর বলে। যিকর বলতে বিভিন্ন ইবাদত যেমন নামায, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি বুঝালেও তাসাউফের রাস্তায় যিকর এক বিশেষ সাধনার নাম। বিভিন্ন তরীকার নির্দিষ্ট ওযীফা ও নিয়ম কানুন রয়েছে। পাক-ভারত-উপমহাদেশের ১২৬ টি তরিকার মধ্যে মাশহর ৪টি তরীকার শায়খগণ যিকর এর প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন।

যিকরের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্বরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।'[৯১] আল্লাহর বাণী- 'জেনে রাখ! শুধুমাত্র আল্লাহর স্বরণেই আত্মাসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'[৯২] রসূল পাক (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে এবং যে আল্লাহর যিকর করে না তাদের দৃষ্টান্ত হল

---

৮৭. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ – وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (আল-কুরআন, ০২ : ৩-৪)

৮৮. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (আল-কুরআন, ০৫ : ২৩)

৮৯. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ আল-কুরআন, ০৩ : ১৫৯

৯০. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ আল-কুরআন, ৬৫ : ৩

৯১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا – وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا আল-কুরআন, ৩৩ : ৪১-৪২

৯২. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ আল-কুরআন, ১৩ : ২৮

Dhaka University Institutional Repository

জীবিত ও মৃতের ন্যায়।'[৯৩] শয়তান মানুষকে ধোকায় ফেলে গুণাহের কাজে লিপ্ত হয়। ফলে অন্তরে কালিমার সৃষ্টি হয়। আর এ কালিমা দূর করার উপায় হল আল্লাহর যিকর। রাসূল পাক (স.) বলেন- 'প্রত্যেক বস্তু পরিস্কার করার উপকরণ আছে আর অন্তরের ময়লা পরিস্কার করার উপকরণ হল, আল্লাহর যিকর।'[৯৪]

ঝ) শোকর ও কৃতজ্ঞতা : অনুগ্রহ লাভের কারণে হৃদয় মুখ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে শোকর বলে। আল্লাহর বাণী- 'যদি তোমরা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর তবে আমি তা আরও বাড়িয়ে দিব। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে জেনে রেখ নিশ্চয় আমার আযাব খুবই কঠোর।'[৯৫]

ঞ) ন্যায়পরায়ণতা : আদল হল কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক যাবতীয় কাজে ও কথায় কম ও বেশী না করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আদল করার প্রতি মহান আল্লাহর চিরন্তন নির্দেশ- 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।'[৯৬] জাতি, ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণী- উঁচু-নিচু সবার জন্য বিচারকার্যে আদল প্রতিষ্ঠা করা বিচারকের দায়িত্ব। আল্লাহর বাণী-

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

অর্থ: 'তোমরা যখন মানুষর বিচার করবে, তখন তোমরা ন্যায়পরায়নতার সাথে বিচার করবে।'[৯৭]

ট) ক্ষমা ও উদারতা : দয়া-মায়া, ক্ষমা, উদারতা মহান আল্লাহর অন্যতম গুণ। শরী'আতের পরিভাষায়, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী। আল্লাহর বাণী-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থ: 'আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদিগকে এড়িয়ে চলুন[৯৮]।'

---

৯৩. *মিশকাত শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৯৬

৯৪. إن لكل شيء سقالة ، وإن سقالة القلوب ذكر الله (ইমাম আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান লিল-বায়হাকী, ইদামাতি যিকরিল্লাহি 'আযযা ও জাল্লা, হাদীস নং- ৫৫১)

৯৫. لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ আল-কুরআন, ১৪ : ৭

৯৬. আল-কুরআন, ১৬ : ৯০

৯৭. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৮

৯৮. আল-কুরআন, ০৭ : ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ঠ) বিনয় ও সরলতা : ইসলামে বিনয় ও সরলতা হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনয়ের অর্থ হল আল্লাহর অন্য বান্দাদের তুলনায় নিজকে ছোট এবং অন্যকে বড় মনে করা। বিনয়ী বান্দা হওয়া আবশ্যক। আল্লাহর বাণী-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

অর্থ: 'রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।[৯৯]'

ড) অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা : আখলাকে হাসানার মধ্যে অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা হল অন্যতম। এ গুণ ছাড়া ছালিক তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নাই। দলিল প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমরা কুধারণা পোষণ ধারা থেকে বিরত থাকবে। কেননা কু ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা'।[১০০]

---

৯৯. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৩

১০০. إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ*, নিকাহ্ অধ্যায়, হাদীস নং- ৪৭৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর

তাসাউফ চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর তাসাউফ চর্চা

তাসাউফের উৎস ও সারকথা

তাসাউফের উৎস আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফ এবং তাসাউফের সারকথা ফানাফিল্লাহ বা আল্লাহতে বিলীন হওয়া। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীম, হাদীস শরীফ ও তদনুযায়ী জীবন যাপনকারী বিশ্ব খ্যাত সূফীগণের বাণী ও জীবনের আলোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করছি।

মহান আল্লাহ্ বলেন- صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ

অর্থ : আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রং, রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর ? এবং আমরা তাঁরই 'ইবাদতকারী।[১]

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহর অপার সৌন্দর্য সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা যায়। আরো বুঝা যায় বান্দা আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত হতে পারে, এখানে 'ইল্‌মে মা'রিফাত ও তাসাউফের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে যা ফানাফিল্লাহর দলিল। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও। আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।"[২]

আল্লামা ইমাম আল গাযালী (রহ.) (৪৫০-৫০৫হি./১০৫৮-১১১১ খ্রি.) বলেন, আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে-

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ : পূর্ব ও পশ্চিম আল্লহ্ই এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্র দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।[৩]

এই আয়াতে কারীমাকে আল্লামা ইমাম গাযালী (রহ.) তাঁর 'মিশকাতুল আনওয়ার' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "প্রত্যেক জিনিসের দুটি দিক রয়েছে একটি এর নিজের দিক এবং অপরটি এর প্রভু আল্লাহর দিক। নিজের দিক থেকে জিনিসটি নিছক অবস্তু ও শূন্যতা ; কিন্তু

---

১. আল-কুরআন, ০২ : ১৩৮

২. উদ্ধৃত- মাওলানা নিসার উদ্দিন আহমদ (রহ.), *হাকীকাতু মারিফাতুর রব্বানীয়া,* ছারছীনা: দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, তা.বি., পৃ. ৪-১৪

৩. আল-কুরআন, ০২ : ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর দিক থেকে তা বাস্তব। সুতরাং বোঝা যায় যে, আসলে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই অস্তিত্বশীল নয় "।[৪]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) বলেন, "প্রথমেই অসংখ্যবার মহান আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতাসহ যিক্‌র (তাস্‌বীহ পাঠ) করছি কারণ তিনি এ আয়াতে কারীমায় অতি মেহেরবানি করে তাঁর মহাপরিচয় দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'ولله المشرق والمغرب' এখানে 'المشرق' শব্দের অর্থ: সূর্য উদয়স্থল এবং 'المغرب' শব্দের অর্থ: সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থল। অর্থাৎ: 'المشرق والمغرب' অর্থ: সূর্য উদয় ও অস্তের পরিবর্তন স্থল। গবেষণার বিষয় হলো সূর্য প্রতি দিনই তার অবস্থান পরিবর্তন করে। আজকে যেখান থেকে উঠে আর যেখানে অস্ত যায় আগামী কাল সেখানে থেকে উঠেও না এবং অস্তও যায় না। এভাবে সূর্য বছরে ৩৬৫ দিনই অবস্থানের পরিবর্তন করে এবং এক স্থানে উঠে এবং অন্য স্থানে অস্ত যায়। আবার এ বছর এক স্থানে থাকে অন্য বছর আরেক স্থানে থাকে। সূর্য তার সৌরজগতসহ ছায়াপথের ভিতরে থেকে সকল সময়ই অবস্থানের পরিবর্তন করছে। তাই ৩৬৫ দিন যত অবস্থান পরিবর্তন করল সকল স্থানই আল্লাহর এবং এভাবে মহাবিশ্বের সকল স্থানে আল্লাহই আছেন। তাই আয়াত কারীমার পরের অংশে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান', আয়তের এ অংশটি চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার মুরাক্বাবার (বিশেষ ধ্যানের যিক্‌র) ২য় সবকে বিশেষ নিয়মে মুরিদকে শিক্ষা দেয়া হয়। অর্থাৎ বান্দা যেখানেই থাক, যেমন: কোয়ার্কে (Quark), অণুতে, পরমাণুতে, মাটিতে, মাটির নিচে (কবরে), পানির নিচে, বাতাসে, উড়োজাহাজে, ডুবোজাহাজে, কৃত্রিম উপগ্রহে, সম্পোটলে, চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে (Mars), ছায়াপথে (Milky Way), ব্ল্যাক হোলের ভিতরে, কোয়াসারে, পালসারে, কসমিক এন্যার্জির কেন্দ্রে (Center of the Cosmic Energy), মহাবিশ্ব পার হয়ে বাইরে কোথাও যে কোন অবস্থানেই থাকুক না কেন, আল্লাহর চেহারা সেখানেই বিরাজমান।"[৫]

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমার পৃথিবী ও আমার মহাকাশ আমাকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু আমার ঈমানদার বান্দার ক্বলব আমাকে ধারণ করতে পারে।"[৬] প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, "এমন

---

৪. মাওলানা নিসারউদ্দীন আহমদ (রঃ), *হাকীকাতু মারিফাতুররব্বানীয়া*, প্রাগুক্ত

৫. বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৬. উদ্ধৃত- ড. রেনল্ড নিকলসন, *মিস্টিক অব ইসলাম*, ক্যামব্রিজ; স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম*, (অনু. ড. রশীদুল আলম, কলকাতা: ১৯৯১, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮

Dhaka University Institutional Repository

এক 'ইলম আছে, যা ঝিনুকের মধ্যে গোপন থাকার ন্যায় গুপ্ত। আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানবানগণই এ সম্পর্কে অবহিত"।[৭]

বিশিষ্ট মুসলিম দার্শনিক আল্লামা ইকবাল বলেন, "পবিত্র কুরআনই হচ্ছে সূফী দর্শনের উৎসমূল। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, No idea can seize people's soul unless in some sense it is the people's own "কোন ধারণাই কোন জাতির মনকে অধিক দিন ধরে রাখতে পারে না, যদি যে ধারণা তাদের নিজস্ব না হয়।"[৮]

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, তাসাউফের সারকথা অতি অল্প। তা হল, যে নেককাজে অলসতা অনুভব হয়, অলসতার মোকাবেলা করে সে নেক কাজটি সম্পাদন করবেন এবং গুনাহর চাহিদা হলে তা দমন করতঃ গোনাহের কাজ হতে বিরত থাকবেন। যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে, তার আর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এতটুকুই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী, এটাই তার সংরক্ষক এবং এটাই তাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করবে।[৯]

হযরত মারুফ কারখী (রহ.) বলেন, "তাসাউফ হচ্ছে আল্লাহর সত্ত্বার উপলব্ধি "[১০]

আলী আর রুদবারী (রহ.) বলেন, "পর্থিব জগতকে দূরে নিক্ষেপ করে আল্লাহর পছন্দনীয় পূর্ণ মানব রাসূলে কারীম (সা.)-এর অনুকরণ করাই তাসাউফ তত্ত্বের মূল "।[১১]

শাইখ মুহাম্মাদ কায়সার (রহ.) বলেন, "তাসাউফ হচ্ছে মহান চরিত্রের নাম ; যা পবিত্র যুগে পবিত্র ব্যক্তি হতে পবিত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে "।[১২]

তাপসী রাবিআ' বসরি বলেন, "আমি আল্লাহর ইবাদত করবো এবং তাঁকে ভালোবাসবো শুধু তার জন্যই"।[১৩] বিশিষ্ট সূফী হযরত যুননূন মিসরী (রহ.) (১৮০-২৪৫ হি./৭৯৬-৮৫৯ খ্রি.)[১৪] বলেন, "আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন সূফীর লক্ষ্য। সূফী জীবনে আল্লাহর দর্শন লাভের

---

৭. আল হাদীস দায়লামী, *আইনুল ইলম ও যায়নুন ছিলম*, মিশর : তা.বি., পৃ.১৬

৮. Dr. Muhammad Iqbal, *The Development of Metaphysics in Persia*, (Lahore, Pakistan : Asharaf Press-7, 1965.), P-76

৯. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), *ওয়াযুত তাকওয়া*, ঢাকা : তা.বি., পৃ. ১০৬

১০. আবুল আলা আকিকী, *ফী-তাসাউফিউল ইসলামী*, কায়রো: ১৯৬৯, পৃ. ২৮

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

১২. আ. র. ম. আলী হায়দার, "তাসাউফের তত্ত্বজ্ঞান ", *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম*, সংকলন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খ্রি., পৃ. ৮৫

১৩. C.R. North, *An Outline of Islam*, 2nd edition, London, 1952, P-108

১৪. John Esposito, *The Oxford Dictionary of Islam*, Oxford University Press 2003; tr. A.J. Arberry, *Dho'l-Nun al-Mesri*, from Muslim Saints and Mystics, London: Routledge & Kegan Paul 1983

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে অধিক মূল্যবান আর কিছুই থাকতে পারে না "[১৫] তাই আত্মার পরিপূর্ণ শুদ্ধতা এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভই তাসাউফের সারকথা।

মাওলানা সিদ্দিকী (রহ.)-এর আর্বিভাবের পূর্বাভাস

আধ্যাত্মিক জগতের দিকপাল উপমহাদেশের বিশষ্ট সূফীসাধক অধ্যাপক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) জন্মগত ভাবেই আল্লাহর ওলী ছিলেন। বড় বড় আল্লাহ্‌র ওলীরা দুনিয়াতে আসার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার মহাসৃষ্টি জগতের সব কিছু ঐ আল্লাহ্‌র ওলীর জন্য সব সময় দু'আ করতে থাকে এবং মহান আল্লাহ্ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে পিতা-মাতা, 'ওস্তাদ অথবা সে সময়ের কোন আধ্যাত্মিক সাধককে অবগত করেন। ঠিক তেমনই একটি ঘটনা হলো, মাওলানা সাহেব যখন মাতৃগর্ভে আসলেন তখন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয়া মা স্বপ্নে দেখলেন "স্বয়ং রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (স.) হাসি মুখে এসে একটি সুন্দর লাল গোলাপ তাঁর হাতে উপহার দিলেন এবং সাথে সাথে বেশ কিছু লাল আলো চর্তুদিকে ছড়াচ্ছিল এবং চারিদিক উজ্জ্বল হয়েছিল"। স্বপ্নটির ব্যাখ্যায় মাওলানা সাহেব লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে বাৎসরিক ইসলামী মহাসম্মেলন ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বলেছিলেন, "রাসূলুল্লাহর উপহার দেয়া সেই গোলাপ ফুলটি আমি আর লাল আলোগুলো আপনারা সবাই"

শিশুকালের একটি অলৌকিক ঘটনা এবং পিতার দু'আ ও ভবিষ্যদ্বাণী

যে বিছানায় শিশুকালে তিনি ঘুমাতেন সেই বিছানার পাশের জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পড়তো, কিন্তু একটি সাপ এসে জানালায় এমন ভাবে পেচিয়ে ফনা ধরে ছিল, যাতে মাওলানা সাহেবের গায়ে রোদ না লাগে। এ ঘটনা দেখে তাঁর পিতা বলছিলেন, "ছেলে হিসাবে খোদা আমাকে একটি রত্ন পাঠিয়েছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সুসংবাদ পেয়েছি যে, আমার এ ছেলের যমানায় ইসলামী দর্শনে ওর চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ হবে না।"[১৬]

মাওলানা সাহেবের কিশোর বয়সের একটি অলৌকিক ঘটনা[১৭]

তাঁর বয়স তখন ১৫ বছর হবে। একদিন তিনি তাঁর ভাগ্নে সানাউল্লাহকে নিয়ে তেরশ্রীর শ্রী শ্রী রায় প্রাসাদ জমিদার বাড়ির বড় পুকুরে গোসল করতে গেলেন। পুকুরঘাটে বসে প্রথমে তিনি তাঁর ডান হাতের তালু দিয়ে হালকা ভাবে পানিতে চার-পাঁচটি আঘাত করলেন। উল্লে-

---

১৫. M. Smith, *Studies in Early Mystics*, Al-Ghazali, London, 1944, p.p-2321/3 ; *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

১৬ . সূত্র মাওলানা সাহেবের সেঝ ভাই মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম সিদ্দিকী।

১৭. মাওলানানা মাহবুবুল আলম, "*মরহুম মুর্শিদ কিবলার জীবনী থেকে*" মুহাম্মদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী (সম্পাদিত), *মাসিক ভাটি নাও*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, সংখ্যা- নভেম্বর, ২০০৫; পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

খ্য মাওলানা সাহেব তাঁর মুরিদেরকে হুকুম করেছেন এই বলে যে, "তোমরা যখন কোন পুকুরে অযু করবে, তখন শুধু কোন রকমে অযু করা যায় এতটুকু জায়গার পানিই ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের অধিক পানি ব্যবহার করে পুকুরে অনেক ঢেউ তুলবে না। এটা আদবের খেলাফ, কারণ এতে পুকুরের পানির জিকিরে ব্যঘাত ঘটে"। যেমন- হযরত সোলাইমান (আ.)-এর ছিল, তিনি পশু পাখি ইত্যাদিরও দুঃখ কষ্টও বুঝতেন। যাহোক তারপর তিনি পুকুরে নেমে হেটে হেটে একটু গভীরে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে পানিতে কোন ঢেউ না তুলে একটি ডুব দিলেন। একইভাবে আরো কয়েকটি ডুব দিলেন। প্রায় চার পাঁচ মিনিট হয়ে গেল তিনি উঠছেন না। পুকুরের উপরের পানি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁর ভাগ্নে ভাবলো হয়ত একটু গভীরে গেছেন। কিন্তু সময় কেটে গেল প্রায় পনের মিনিট। এবার ভাগ্নে সানাউল্লাহ ভয় পাচ্ছে। পুকুর পাড় থেকে মামা মামা বলে বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করে কোন সাড়া না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বাড়ীতে গেল এবং গ্রাম বাসীকে বলতে লাগল, "আমার মামা পুকুরের মাঝখানে ডুব দিয়ে আর উঠছেন না"। এদিকে প্রায় ৩০ মিনিট সময় পার হয়ে গেল। ইতোমধ্যে ভাগ্নের চিৎকারে গ্রামের অনেক মানুষ দৌড়ে জমিদার বাড়ীর বড় পুকুরের চর্তুদিকে ভিড় করেছে। কয়েকজন মুরুব্বি বলা বলি করছে এই পুকুরের মাঝখানে তিনটা কুপ ছিল মনে হয় কুপের সাথে আটকা পরে বাচ্চু মারা গেছে (মাওলানা সাহেবের ডাক নাম বাচ্চু ছিল)। এদিকে সময় প্রায় আড়াই তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে তখন দুই জন সাহসী যুবককে পুকুরে নামানো হলো তাঁর খোঁজ করতে দুই যুবক ডুব দেয়ার সাথে সাথে তিনি পানির নিচ থেকে মাথা বের করলেন। পাড়ে এসে তিনি বললেন, "আপনারা যদি জানতেন আমি পানির নিচে কার সাথে কোথায় ছিলাম তাহলে কখনই আমাকে উঠাতেন না , আমাকে না উঠালে যে আমি আরো কত সময় থাকতাম তা কেউই জানে না, আমি পানি সাধনা আয়ত্ত করেছি"। পরবর্তীতে জানা গেল তিনি হযরত খাযা খিযির (আ.)-এর সাথে অবস্থান করছিলেন।

প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী তাঁর আপন ভাগ্নে হযরত মাওলানা সানাউল্লাহ্ চৌধুরীসহ গ্রামের কয়েকজনকে আল্লাহ্ আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং জমিদার বাড়ীর সেই পুকুরটি আজও তাঁর স্মৃতি নিয়ে ধন্য হয়ে রয়েছে।

যুবক বয়সে মাওলানা সাহেবের একটি অলৌকিক ঘটনা[১৮]

২০০৭ খ্রিস্টাব্দের তেরশ্রী দু'আর মাহফিল শেষে সোনামুদ্দি পাগলা, ইঞ্জিনিয়ার রিয়াজুল ও আমান উল্লাহ রিক্সায় ঘিওর বাজারে আসার পর নাস্তা করার জন্য একটি হোটেলে ঢুকলে একজন বয়স্ক লোক জানতে চাইলো আপনারা কি আযহার সিদ্দিক (রহ.)-এর মাহফিল থেকে এসেছেন? সোনামুদ্দি উত্তর দিল- জী! তখন তিনি বললেন, "আমিই প্রথম তেরশ্রীর মাহফিল করার জন্য হুজুরকে অনুরোধ করি। আমার অনুরোধেই তিনি এখানে মাহফিল শুরু করেন"। তখন তার নিকট ইঞ্জিনিয়ার রিয়াজুল হযরত মাওলানা সাহেব (রহ.) সম্পর্কে কোন

---

১৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতি বা কারামত জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, "আমি তাঁকে শিশুকাল থেকেই চিনি। তিনি পীর প্রকাশ হওয়ার বহু আগেই আল্লাহর ওলী ছিলেন। আমি বয়সে তাঁর চেয়ে ২৫/২৬ বছরের বড়। তিনি প্রায়ই হঠাৎ করে কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। এ কথা এলাকার সকলেই জানে। একদিন আমি শুনতে পেলাম তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ পড়া অবস্থায় আবার কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন, তখন তার বয়স ২১/২২ হবে। তখন আমি তাঁদের বাড়ীতে গেলাম তাঁকে দেখার জন্য। গিয়ে তাঁর পিতা নছিমুজ্জামান সিদ্দিকী (রহ.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে, তখন তিনি বললেন, "আজ প্রায় ছয় দিন ধরে সে কারো সাথে কথা বলে না। এখন পশ্চিমের ওই ঘরটিতে আছে"। আমি তখন তাঁকে দেখার জন্য ঘরে যেতেই দেখলাম তিনি সিজদারত অবস্থায় আছেন এবং শূন্যের উপর ভাসমান অবস্থায় (সুবহানআল্লাহ)। তখন আমি প্রায় এক ঘণ্টা দাড়িয়ে ছিলাম তিনি ঐ একই অবস্থায় রইলেন। আমি তখন তাঁর পিতাকে ঘটনা বললাম এবং তিনি আমাকে এ ঘটনা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। আমি আমার জীবনে কারো নিকট এ ঘটনা বলি নাই। কিছু দিন আগে ৭৫ বছর বয়স্ক আমার একটি ছেলে মারা গেছে আমি নিজে কখন মরে যাব তার ঠিক নাই। তাই আমি আপনাদের নিকট এই ঘটনা জানালাম। আপনারা সাড়া বিশ্বে এই ঘটনা ছড়িয়ে দিবেন।" তার নাম হোসেন আলী তিনি এলাকার প্রভাবশালী মাতবর। তখন তার বয়স ৯৫ বছর ছিল। ঘটনার সাক্ষীরা এখনও জীবিত রয়েছে।

'ইল্‌ম তাসাউফের বুৎপত্তি অর্জন

মাওলনা সাহেব (রহ.) শিশুকাল থেকেই একটু ব্যতিক্রমী ছিলেন। অন্য শিশুদের মত অতিরিক্ত খেলাধুলা করেন নি। নিরবে একা একা বসে কি যেন ভাবতেন। তার ভদ্রতা ও উন্নত স্বভাবের জন্য জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের ভালবাসার পাত্র ছিলেন। তিনি তাসাউফ চর্চার বুৎপত্তি অর্জন করেন তার প্রথম পীর কুমিল্লার হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল গনি (রহ.) (আসামের বনবাসী দরবেশ নামে খ্যাত)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করার পর থেকে। তিনি তিনজন প্রখ্যাত সূফী সাধকের নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাসাউফের দীক্ষা প্রাপ্ত হন এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ বকর ছিদ্দিকী (রহ.)-এর নিকট প্রথম বায়'আত গ্রহণ

মাওলানা সাহেবের বয়স যখন খুব অল্প তখন ফুরফুরা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ বকর সিদ্দিকী (রহ.)-এর একটি মাহ্‌ফিলে গিয়ে শিশু অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র ওলীর কথা বুঝতে পেরে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প বয়সের কারণে পরবর্তীতে পীর সাহেব হুজুরের সন্ধান পাননি। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে তিনি বড় হতে লাগলেন। যখন তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে অধ্যায়ন করতেন তখন তিনি হাটহাজারী মাদরাসা থেকে 'ইল্‌ম নাহু ও 'ইল্‌ম ছরফ ভালভাবে তা'লিম নেন।

Dhaka University Institutional Repository

২. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল গনি (রহ.)-এর নিকট দ্বিতীয় বায়'আত গ্রহণ

মাওলানা সাহেব (রহ.) ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল গনি (রহ.)-এর নিকট বায়'আত (মুরিদ) হন। তিনি কাদরীয়া ত্বরীক্বার আসামের বনবাসী দরবেশ নামে খ্যাত। উল্লেখ্য, তিনি একপায়ের বৃদ্ধাংগুলির উপর ভর করে কয়েক বছর যিক্‌রে মশগুল ছিলেন। শুরু থেকেই তিনি তাঁর পীর সাহেব কিবলার সকল নসিহত আদব এবং পূর্ণভক্ত হৃদয় নিয়ে পালন করতেন। সেখানে তিনি সুদীর্ঘ ৯ বছর ভারতের আসাম ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে পাহাড়ে সাধনারত ছিলেন।

কাদরীয়া তরীক্বার বিলায়াতের খিলাফত (সনদ) প্রাপ্তি

একবার তাঁর পীর সাহেব হুযুর আব্দুল গনি (রহ.)-এর পায়ের জুতা ছিড়ে গিয়েছিল। ঐ জুতা পরেই তিনি চলাফেরা করতেন কিন্তু যখন মাওলানা সাহেব দেখলেন, তাঁর মুর্শিদ ছিড়া জুতা পায়ে দিয়ে চলাফেরা করছেন তখন তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন কখন হুযুর একটু আড়ালে যাবেন এবং তিনি জুতাটা শিলাই করে দিবেন। হুযুরের জুতা খাটের নীচে রেখে তিনি একটু বাইরে গেলেন এ সুযোগে তিনি জুতাজোড়া নিয়ে ভালো করে পরিস্কার করে, শিলাই করার জন্য সুঁই জাতীয় কিছু না পেয়ে ছাতার দাশা (শলাকা) দিয়ে সুঁইয়ের মত বানিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে জুতাজোড়া শিলাই করলেন, শিলাই করতে গিয়ে তাঁর হাতের তালু ছিদ্র হয়ে রক্ত বের হয়েছিল। তিনি নিজে ব্যবহারের জন্য সফরের সময় তাঁর ব্যাগে জুতার কালি, ব্রাশ, চিরুনী ইত্যাদি রাখতেন, তারপর সেই জুতা ভালভাবে কালি করে একেবারে চকচকে নতুন করে খাটের নিচে রেখে হুযুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হুযুর বাহির থেকে এসে মাহ্‌ফিলে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে জুতা খুজতে লাগলেন তখন তিনি খাটের নীচ হতে জুতাজোড়া বের করে দিতেই হুযুর বললেন "নতুন জুতা কেন? আমারতো জুতা আছে" তখন তিনি বললেন, "হুযুর এটি আপনার পুরাতন জুতা আমি শিলাই করে কালি করে দিয়েছি, আপনি এটি পায়ে দিন। তখন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল গনি (রহ.) যার সিনায় কাদরীয়া ত্বরীক্বার পূর্ণ ফায়িয বিদ্যমান ছিল, তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী ছাহেবকে জড়িয়ে ধরে সিনার সাথে সিনা ঠেকিয়ে বিশেষভাবে দু'আ করলেন। তারপর চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বললেন, "আপনি এত বড় উচ্চ শিক্ষিত মানুষ হয়ে আমার পায়ের ছেঁড়া জুতা নিজ হাতে শিলাই করে দিলেন, যান আজ থেকে আপনার সকল সাধনা পূর্ণ হলো"। এ সময়ে তিনি মাওলানা সাহেবকে ইস্‌মে আ'যম শিক্ষা দিয়েছিলেন। যা আল্লাহ্‌পাকের একটি বিশেষ নাম। তারপর হুযুর কর্তৃক কাদ্‌রীয়া তরীক্বার খিলাফত (সনদ) প্রাপ্ত হন ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইছহাক (রহ.)-এর নিকট তৃতীয় বায়'আত গ্রহণ

আসামের বনবাসী দরবেশ (রহ.) বলেছিলেন "আপনি এখন আল্লাহ্‌র কুতুব হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইছহাক সাহেবের নিকট যান, মৌলভী অত্যন্ত গরম, বর্তমান বিশ্বে একমাত্র তিনিই আপনাকে 'ইল্‌মে মা'রিফাতের পরবর্তী সবক শিক্ষা দিতে পারবেন"। তখন ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফী সাধক বরিশালের আল্লাহ্‌র কুতুব হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইছহাক (রহ.), চরমোনাই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর, যিনি পানির উপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়তেন,[১৯] তাঁর নিকট গিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র কুতুব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন "বারিষ্টার সাব আইসেন, হ্যা ওয়া কেমুন করিয়া আইসেন" তিনি বললেন "হুজুর আপনার কিতাবে বরিশাল নদীর পূবপার (পূর্বপার) ৪ মাইল দেখছি, দেইখা (দেখে) ঐ কিতাব ধইরা (অনুযায়ী) তারপর আমি আইসি (এসেছি)"। হুজুর বললেন " আহ্‌হা আপনে চেনেন না শোনেন না এত কষ্ট করিয়া আইসেন, ঐ যে হোটল ঐ হোটলো খান"। তখন তিনি আল্লাহ্‌র কুতুবের নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন ও তাঁর পবিত্র পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। তারপর হোটেলে খাওয়া দাওয়া করলেন। আল্লাহ্‌র কুতুব হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইছহাক (রহ.) যেই রাস্তা দিয়ে আসতেন সেই রাস্তাটা অপ্রশস্ত ছিল। মাওলানা সাহেবের ভাষায় "একদিকে পুকুর, অন্য দিকে কুতুবখানা। (অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে তিনি বলেছিলেন) এই চাপা রাস্তার উপর একটি ইট মাথায় দিয়ে রাতের বেলা শুয়ে রইলাম, ভাবলাম যে যদি উনির চরণটা আমার শরীরে লাগে, উনিতো ফযরের ওয়াক্তে এখান দিয়েই যাবেন, যদি তাঁর পবিত্র চরণের একটা পাড়া খাইতাম। তাই তিনি লিখেছিলেন "পথের মাঝে পরে থাকিস বুকে চরণ ঠেকতে পারে"। এ ঘটনা থেকে অনুমান যায় তিনি একজন আনুগত্য ও মুয়াদ্দাব মুরীদ ছিলেন। উল্লেখ্য, তখন তিনি ঢাকা হাই কোর্টে ওকালতি করতেন। তাঁর আনুগত্য ও বিনয় চরমোনাই দরবার শরীফের তৎকালীন মুরীদবর্গের কারোরই অজানা ছিল না।

চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার বিলায়াতের খিলাফত (সনদ) প্রাপ্তি

একবার মাওলানা সাহেব চরমনাই দরবার শরীফে বার্ষিক মাহফিলে 'ইল্‌মে তাসাউফের অতি উচ্চাঙ্গের বয়ান করছিলেন তখন তাঁর মুর্শিদ কিবলা বাড়ীর ভিতরে ছিলেন, তখন আল্লাহ্‌র কুতুব হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইছহাক (রহ.) তাঁর বয়ানে এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি বাড়ীর ভিতর থেকে বের হয়ে এসে মঞ্চে উঠে তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে সিনার সাথে সিনা মিলিয়ে বিশেষভাবে দু'আ করেছিলেন। এ সময় তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) আজমাতুল উজমা (যা 'ইস্‌মে আ'যমের অনেক উপরে) শিখিয়ে দেন।

---

১৯. মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর ধারণকৃত বক্তব্য থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সাহেব সঠিক সাধনার মাধ্যমে মাত্র ৩ বছরের মাথায় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীক্বার খিলাফত প্রাপ্ত হন এবং ১৩ বছর হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.) নিকট তা'লিম ও তালকীন গ্রহণ করেন। বরিশালের হুজুর কিবলা তাঁকে আদর করে "আয্হারুল ইসলাম বারিস্টার সাব" বলে ডাকতেন এবং মাহ্ফিলে তাঁকে সকল মানুষের সামনে বলতেন "আয্হারুল ইসলাম বারিস্টার সাব খাড়াও (দাড়াও) মানুষরে দেহাও (মানুষকে দেখা দাও), এই আযহার আমার কলিজার টুকরা"। উল্লেখ্য, মাওলানা সাহেব (রহ.) চিশতিয়া ও কাদ্রীয়া উভয় তরীক্বা থেকেই খিলাফত (সনদ) প্রাপ্ত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা জীবন

মাওলানা সাহেব যিক্রের জন্য নির্জন স্থানে ৩X৪ বর্গহাত জায়গা কাপর দিয়ে ঘিরে সেখানে যিক্র করতেন যাতে বাইরের কোন লোক তাঁকে না দেখে। অনেক সময় তিনি রাতে যিক্র করতে করতে খোলা মাঠে চলে যেতেন, ভোর হওয়ার পূর্বেই বাসায় ফিরে আসতেন। আবার মসজিদে যিক্র করতেন, কখনও কখনও যিক্রের হালাতে তিনি লাফাতে থাকতেন এ সময় যেন তাঁর মাথা মুবারক প্রায় মসজিদের ছাদে ঠেকত এবং তাঁর দেহের প্রতিটি লোমের গোড়া হতে যিক্র বের হত। আবার তিনি কবর খনন করে সেখানে নেমে আল্লাহ্র যিক্র করতেন, কবরের উপরের অংশ মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতেন। এ সময় তাঁর আদরের সন্তান, বর্তমান পীর সাহেব ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন।

তাসাউফের সবক ও যিক্র

মাওলানা সাহেব (রহ.) যে সকল সবক ও যিকর করেছেন এবং মুরিদকে করার এযাযত দিয়েছেন তাঁর প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী কর্তৃক লিখিত 'বিশ্ব তা'লিমে যিকর' নামক কিতাবের ২১টি সবক থেকে তাঁর এযাযতে নিম্নে হুবহু কয়েকটি তুলে ধরছি।

চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার ২য় সবক নফি এছবাত বা বার তাসবির সবক

এই সবকে বসে প্রথমে চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রেখে মৃত্যুর কথা খেয়াল করবেন এবং মনকে বুঝিয়ে বলবেন যে, কত মানুষ কবরে গেল তোমাকেও কবরে যেতে হবে। মরণের পরে অনন্তকাল যাঁর সঙ্গে থাকতে হবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে ভালবাসা করে না গেলে অন্ধকার কবরে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এইভাবে উত্তম রূপে মরণের খেয়াল করে উল্লেখিত[২০] দরূদ শরীফ ৫ বার পড়বেন এবং "আসতাগফিরুল্লাহ"

---

২০. দরূদ শরীফটি এরূপ: اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم- (বিস্তারিত দ্রঃ মাওলানা মোঃ আযহারুল ইসরাম সিদ্দিকী (রহ.), *মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯, পৃ. ৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

(আসতাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়াতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল অলিয়্যিল আ'যীম)[২১] ১১ বার পড়বেন। এরপর সুবহানাল্লাহ ১০০ শত বার, আলহামদুল্লিাহ ১০০ শত বার, আল্লাহু আকবার ১০০ শত বার, এই তিন তাসবীহ পড়ার সময় প্রত্যেক বারই খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহর দিকে চাইয়া আছি, আল্লাহ আমার দিকে চাইয়া আছেন।" আমি আল্লাহকে দেখে ডাকি, আল্লাহ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন- বান্দা আমারে ডাকো কেন"। যদি কোন সময় পূর্ণ ১০০ শত বার নাও বলতে পারেন তবে সুবহানাল্লাহ ৩৩, আলহামদুল্লিাহ ৩৩, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার বলবেন। কিন্তু হালকায়ে যিক্‌রের দিন পূর্ণ ১০০ শত বার করে বলতে হবে। এরপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বেন ২০০ শত। মুখে বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিলে দিলে মানে খেয়াল করবেন 'আল্লাহ বাদে কেহ মা'বূদ নাই' অথবা যদি কেউ পারেন, তবে নিম্নোক্ত খেয়াল করতে পারেন; লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ- লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ-লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ- লা মা'শুকা ইল্লাল্লাহ অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন যখন "লা" শব্দ বলবেন তখন খেয়াল সাত তবক আসমানের উপরে নিয়ে দেখবেন কোথাও আল্লাহ নেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেয়াল জমিনের দিকে আনবেন এবং হাজার হাজার মাইল জমিন সব ঘুরে আসবেন এবং খেয়ালের দৃষ্টিতে দেখবেন জমিনেও আল্লাহ নেই। অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন "লা" শব্দ যখন বলবেন সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন "জমিন নেই, আসমান নেই, আমার শরীরও নেই, কিছুই নেই। শুধু আল্লাহই আছেন।" সুতরাং এখন খেয়াল ক্বলবের দিকে নিবেন এবং একিনের চক্ষু দ্বারা ক্বলবের দিকে নজর করলে দেখবেন আমার ক্বলবে আল্লাহই আছেন। অথবা অন্য রকম খেয়ালও করতে পারেন। "বেহেশত দোযখ আরশ কুরসী লওহ কলম সাত তবক আসমান জমিনে কোথাও আল্লাহ নেই, কিন্তু একিনের চক্ষু দিয়ে ক্বলবের উপরে নজর করে দেখবেন আল্লাহ ক্বলবেই আছেন। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য এই সমস্ত খেয়াল না করা ভাল, তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" অর্থ খেয়াল করবে "আল্লাহ বাদে কেহ মা'বূদ নাই"। এই ভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ শত বার বলবেন "লা" শব্দ বলার সময় মুখখানা ডান দিকে ঘুরিয়ে ডান কাধের উপর নিবেন। ডান কাধের উপর হতে 'লা' শব্দ উঠাবেন ইলাহা বলতে বলতে মাথাটা খাড়া রেখে বাম দিকে ঘুরিয়ে আনবেন নাকটা যখন বাম স্তনের বোটা বরাবর আসবে তখন খাড়া মাথাটাকে 'ইল্লাল্লাহ' বলে সজোরে বাম স্তনের উপরে নিক্ষেপ করবেন যেন, ইল্লাল্লাহ গলায় না বেধে ক্বলবের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ বলার সময় নাকটা ক্বলব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন। বুকটা বাকা করে নীচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন ইল্লাল্লাহ যেন গলায় আটকিয়ে না যায়। মাথা খুব ঘন ঘন আছাড় পিছাড় করবেন না, শুধু দেহ উঠা নামা করবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় মাথাটা ঝটকা দিয়ে ইল্লাল্লাহ ক্বলবের উপরে জোরে জরব লাগাবেন। এইভাবে ৪০০ শত বার ইল্লাল্লাহ বলবেন।

---

২১. ইসতিগফারটি আরবীতে এরূপ: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Dhaka University Institutional Repository

ইল্লাল্লাহর মানে খেয়াল করবেন, "আমার ক্বলবে আল্লাহই আছেন" ('আকাঈদের মাসআলা নিয়ে বেশি হুলাহুলি করবেন না, তাহলে সবকের আসল মর্ম বুঝতে পারবেন না, শুধু 'আকাঈদই হাসিল হবে, আল্লাহ হাসিল হবে না। কারণ যুক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায় না। ভক্তি রসে অবগাহিত হয়ে তাঁকে পাওয়া যায়।) এরপর ৬০০ শত বার আল্লাহ, আল্লাহ বলবেন, আল্লাহ আল্লাহ বলার সময় কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখবেন এই দৃষ্টি যেন নড়াচড়া না হয় এবং খেয়াল করবেন আমি, "আল্লাহকে দেখে ডাকি, তিনি আমার ডাকের জবাব দিয়া বলেন, বান্দা তুমি আমাকে কেন ডাক?" এই ডাকের জবাব শুনার জন্য দিলের কান সজাগ রাখবেন এবং বিশ্বাস করবেন। হাদীস শরীফে আছে আল্লাহ পাককে একবার ডাক দিলে ১০ বার ডাকের জবাব দেন। পরে ৫ বার দরূদ শরীফ পড়ে মুনাজাত দিবেন।

উক্ত সবকের তাছির

১। যিক্‌র করতে করতে কান্না আসে।
২। আল্লাহর নাম লওয়ার জন্য মনে উদাসীন ভাব আসে।
৩। সুন্নতের তাবেদারী করতে মনে ইচ্ছা করে।
৪। শরি'আতের জন্য কুরবান হতে মনে চায়।
৫। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু নূরানী নক্সায় রূহানী নজরে দেখা যায়।
৬। ক্বলবের মধ্যে ইল্লাল্লাহর নূরানী নক্সা দেখা যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কে যেন নিরবচ্ছিন্ন যিক্‌র করে মা'লুম হয়। আর কোন কোন সময় মনে হয় অনেক দূর হতে আল্লাহর যিক্‌রের শব্দ অজস্র ধারায় ভেসে আসে।
৭। কোন কোন সময় যিক্‌র করতে করতে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

তৃতীয় সবক হাব্‌সে দম

এই সবকে বসে মরণের খেয়াল করার পর দ্বিতীয় সবক বা নফি এছবাত সবকের অর্ধেক আদায় করবেন অর্থাৎ ১০০ শত বার লা-ইলাহা ইল্লালাহ, ইল্লাল্লাহ ২০০ শত বার এবং আল্লাহ আল্লাহ ৩০০ শত বার বলে সবক বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে খুব খেয়াল করে একটা লোক মরণ থেকে কবরে নিয়ে মাটি দিয়ে আসা পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খুব খেয়ালে খেয়ালে চিন্তা করতে থাকবেন। প্রথম সবকে মরণের যে খেয়াল করা হয়েছে সেই সমস্ত খেয়াল করে খুব গভীরভাবে মনকে বুঝাবেন যে, মন এখন চিন্তা করে দেখ তুমি বাড়ীর উঠানে নেমে উত্তর শিয়র হয়েছো, এখন তোমাকে গোসল দেয়া হয়, কে কে গোসল দেয় খেয়াল করবেন, এখন তোমাকে কাফন পরিয়ে জানাজা দিয়ে দুয়ারে শুয়িয়ে রাখা হয়েছে, তোমার বিবি এখন সাদা কাপড় পড়ে বিধবা বেশে নাকের সোনা, হাতের চুড়ি খুলে তোমার নিকট দাঁড়িয়ে কাঁদে আর বলে আমায় তুমি কি করে গেলে? এখন খেয়াল করেন আপনাকে কবরের দিকে নিয়ে যায়, আপনার সন্তানেরা পিছনে পিছনে দৌড়ায় আর আব্বা আব্বা বলে কাঁদে, এরপর খেয়াল করবেন আপনার মরণের খাট নিয়ে কবরের এক পাশে রাখা হল।

Dhaka University Institutional Repository

এখন আপনাকে কবরে নামানো হল। এখন আপনার সন্তান আপনাকে রেখে লাফিয়ে কবরের উপরে উঠল। কিতাবে আছে, সন্তান যখন পিতা মাতাকে কবরে রেখে উঠে আসতে চায়, তখন ঐ পিতা মাতার রূহ সন্তানের পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে বাবা আমাকে একলা ফেলে যেওনা। এখন আপনার কবরের উপরে মাটি ফেলে চাপা দেয়া হল, সবাই বিদায় হয়ে গেল। এখন মুনকার নাকীর দু'জন ভীষণ দর্শন ফিরিশতা কবরে হাজির হল, তাদের হাতে গুর্জ।

রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমায়েছেন, 'সারা দুনিয়ার জ্বীন এবং মানুষ একত্র চেষ্টা করলেও একটি গুর্জকে একটুও নড়াতে পারবে না'। এখন ফিরিশতা দু'জন গুর্জ উঠিয়ে আপনাকে বসিয়ে আপনার ডান এবং বাম কাঁধের দিকে দাঁড়িয়ে আপনাকে সওয়াল করতে উদ্যত হল, আপনি এখন খেয়াল করবেন যে, তাদের সওয়ালের জবাব দিতে না পারলে, এই অন্ধকার কবরে গুর্জের আঘাতে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাব। আপনি এখন মনকে বুঝাবেন, মন! এই ভীষণ অন্ধকার কবরে এখন তোমার কে আছে চিন্তা কর! এখন তোমার আল্লাহ বিনে কোন বান্ধব নেই, এই খেয়ালে আপনি এখন তাসবীহ হাতে নিয়ে একদমে যতবার পারেন আল্লাহকে অত্যন্ত আকুল ভাবে ডাকবেন এবং দম বন্ধ করে ঘন ঘন আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে দেখবেন এক দমে কতবার আল্লাহ আল্লাহ বলতে পারেন। দ্বিতীয় দমে প্রথম দমের চেয়ে আরও কিছু আল্লাহ, আল্লাহ বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করবেন। এই ভাবে দমে দমে আল্লাহ আল্লাহ বলার সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে তবু বলা থামাবেন না। এক দমে আল্লাহ আল্লাহ যত বশী মাত্রায় বাড়িয়ে বলতে পারবেন সবকে তত বেশি তাছির পাবেন। দিনে রাত্রে দমে দমে আল্লাহ আল্লাহর মাত্রা বাড়িয়ে বলতে থাকবেন এবং এক দমে আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে এই কাজটি শেষ করতে পারি কিনা, বা এই গাছ থেকে ঐ গাছ পর্যন্ত এক দমে আল্লাহ আল্লাহ বলে হেঁটে যেতে পারি কিনা। সবকের সময় এমনভাবে আল্লাহ আল্লাহ বলবেন যেন, মুনকার নাকীর আপনাকে প্রশ্ন করার সময় না পায় এবং আল্লাহ আল্লাহ বলা যেন মুহূর্তের জন্য বন্ধ না হয়। আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে যেন কিয়ামত জারী হয়ে যায়।

এই সবকের তাছির

১। যিক্‌র করতে করতে কোন সময় দেখবেন ঘুম হতে জাগ্রত হলেও আপনার জিহ্বা আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একা একা নড়াচড়া করে আল্লাহর যিক্‌রে রত আছে।

২। খেয়াল করলে আল্লাহর সকল সৃষ্ট বস্তু থেকে আল্লাহর যিক্‌র স্পষ্ট শুনতে পাবেন। বিবিকে খাছ পর্দা করে এবং সুন্নতী লেবাছ নিয়ে এই যিক্‌র বেশি মাত্রায় করলে দেহের ৩৬ প্রতিটি পশমের গোড়া দিয়ে আল্লাহর যিক্‌র বের হতে থাকবে। আখিরাত এবং কবরের অন্ধকারের কথা প্রাণে সদা জাগ্রত থাকবে। এই সবকে ভিতরের হালাত কোন কোন সময় এরকম হবে, দেখবেন নাভী হতে দেহের উপরের অংশ কোটি কোটি মাইল

Dhaka University Institutional Repository

উর্ধ্ব দেশে উঠে গিয়েছে। নাভীর নিচের অংশটুকু জমিনে পড়ে আছে। আরও অন্যান্য হালাত হবে যেগুলো বর্ণনা করা নিষেধ।

মুরাক্বাবার প্রথম সবক

মুরাক্বাবার ১ম সবক আল কুরআন শরীফের ৩০ পারায় আছে। যথা: [২২]

' أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى '

কিন্তু এই আয়াতের মুরাক্বাবা করার সময় উক্ত আয়াতের এইভাবে মুরাক্বাবা করতে হবে, যথা:-

' الم تعلم بان الله يرى ' (উচ্চারণ: 'আলাম তা'লাম বি আন্নাল্লাহা ইয়ারা')

মানে খেয়াল করতে হবে "আল্লাহ পাক যেন আপনার সামনে হাজির থেকেই বলেছেন, বান্দা তুমি জাননা আমি তোমার দিকে চেয়ে আছি। মুরাক্বাবা করার সময় এই আয়াত তিলাওয়াতের দরকার নেই শুধু খেয়াল করতে হবে "আল্লাহ পাক হাজির থেকে আমার দিকে চেয়ে আছেন" এবং এই খেয়াল দিলে খুব মজবুত ভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে। যত বেশি সময় পারা যায় এই আয়াতের মুরাক্বাবা করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রতিটি সবক আদায় করার আগে নফি এছবাতের সবক অর্ধেক আদায় করতেই হবে। এই সবকে থাকাকালীন সর্বদা এই খেয়ালে থাকতে হবে যে, আল্লাহ আমার দিকে চেয়ে আছেন। সবকের মধ্যে খুব হুশিয়ার থাকতে হবে দুনিয়ার খেয়াল ও হালাতের দিকে যেন খেয়াল না যায়। শয়তান অনেক রং তামাশার জিনিস দেখাবে এবং নানা রকমের কুচিন্তা মনে উদয় করে দিবে, খবরদার ওদিকে লক্ষ্য দেয়া চাইনা। এই সময় শয়তান বিভিন্ন প্রকার নূর বা জ্যোতি দেখাতে পারে অথবা অন্যান্য নূরও প্রকাশ পেতে পারে, (মুরাক্বাবা এবং মুশাহাদার সবকের হালাত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সালিক নিজে উপলব্ধি করতে পারবে।)

মুরাক্বাবার দ্বিতীয় সবক

'فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ '

এই আয়াতের[২৩] মুরাক্বাবা করার সময়, এই আয়াতের মানে খেয়াল করতে হবে যে, আল্লাহ পাক যেন সামনে হাজির থেকে বলছেন, "বান্দা তুমি যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন আমার কুদরতি মুখ তোমার মুখের সঙ্গে লাগা আছে।" যে দিকেই তুমি খেয়ালের নজর ফিরাবে আমার কুদরতি মুখ তোমার সামনে নি:সন্দেহে দেখতে পাবে।

---

২২. আল-কুরআন, ৯৬ : ১৪

২৩. আল-কুরআন, ০২ : ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

মুশাহাদার প্রথম সবক

'وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ'[২৪]

আল্লাহ পাক সামনে হাজির হয়ে বলছেন, আমি তোমার গর্দানের শাহ্ রগের (জীবন শিরার) চেয়েও নিকটে আছি। আল্লাহ সর্বদা আমার শাহ রগের চেয়েও নিকটে আছেন এই খেয়াল ঠিক হয়ে গেলে সর্বপ্রকার গুনাহর থেকে সে বিরত থাকতে পারবে।

মুশাহাদার দ্বিতীয় সবক

'رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ'[২৫]

মুসা (আ.) আল্লাহ পাককে দেখতে চেয়ে বলেছিলেন "হে আমার মাওলা! আপনি আমাকে দেখা দেন, আমি আপনাকে দেখব।" মুসা (আ.) যেমন- আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, এখন মুসা (আ.)-এর স্থলে আপনি আপনার নিজেকে মনে করে এই আয়াতের মানে খেয়াল করবেন এবং আল্লাহকে দেখার আরজু করবেন।

মাওলানা সাহেবের তাসাউফ চর্চার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্বীকৃতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক সালামের জবাব

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর বাড্ডা সিদ্দিকীয়া 'আলীয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক হজ্ব করতে যাবেন। তখন তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর নিকট দু'আর দরখাস্ত করেন। তিনি প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন " মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে নামায আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রওজা মুবারক জিয়ারতের সময় আমার সালাম ও দরূদ শরীফ দয়াল নবীজীকে পৌঁছায়ে দিয়েন।" প্রিন্সিপাল সাহেব হজ্ব করতে গেলেন, তিনি হুজুর (স.)-এর রওজা শরীফে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা সালাম পাঠিয়ে ছিল একে একে সবার নাম বলে সালাম দিচ্ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর নাম বলে সালাম দিলে সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রওযা শরীফ থেকে সালামের জবাব আসল 'ওয়াকুল্লাহু মিননি সালাম' অর্থাৎ আমার সালামও তাঁহার নিকট পৌঁছায়ে দিও"। নিজ কানে শোনা ও চোখে দেখা সাক্ষী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক ছাহিবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ ঘটনা মাওলানা মোঃ শামসুল হক মানিকগঞ্জে বাৎসরিক মাহফিলে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে বয়ান করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এ ঘটনার লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষী এখনো জীবিত রয়েছে।

---

২৪. আল-কুরআন, ৫০ : ১৬

২৫. আল-কুরআন, ০৭ : ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর দু'আ

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) কে বলছিলেন "আমি আল্লাহর রব্বুল আ'লামীনের নিকট দু'আ করেছি, মা'বূদ একজন ইংরেজী বাংলা শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষকে আপনি আপনার 'ইল্‌মে শরি'আত ও 'ইল্‌মে মা'রিফাতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করুন। আমার এ দু'আ যে আল্লাহপাকের নিকট কবুল হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং আপনি, "আল্লাহ্‌পাক আপনাকে 'ইল্‌মে শরী'আত ও 'ইল্‌মে মা'রিফাতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেছেন। "

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুরের (রহ.) দু'আ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রহ.)-এর সর্বশেষ খলিফা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর 'তারানায়ে-জান্নাত' কিতাবটি পড়ে বললেন "'ইলমে মা'রিফাতের এত উচ্চাঙ্গের তথ্য গজল আকারে এত প্রাণবন্ত ভাষায় কিতাবে লিখতে পারে এমন লোক বাংলার জমিনে আছে তা আমার জানা ছিল না। আমি উনাকে দেখতে যাব"। তারপর তিনি মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে এসে তাঁকে প্রাণভরে দু'আ করে বললেন, "আমি আপনার সাথে দুনিয়াতেও আছি আখিরাতেও আছি"।

গরীবে নিওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আযমিরী (রহ.) কর্তৃক জীবনী সম্পর্কে নির্দেশ

২০০৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের (রহ.) জীবনী লিখতে তাঁর প্রধান খলিফা ও বড় ছাহিবজাদা হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী তাঁর একজন মুরিদ রিয়াজুলকে হুকুম দিয়ে দু'আ করেছিলেন। জীবনী লেখার জন্য সে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলো। এ সময়ে আনুমানিক রাত তিনটার দিকে তন্দ্রাবস্থায় গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আযমিরী (রহ.) রিয়াজুলকে একটা কাগজ হাতে নিয়ে বললেন, "এটা আমার জীবনী তারপর তাঁর জীবনীটা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর জীবনীর উপরে রেখে বললেন, "আমার নামের জায়গায় শুধু তাঁর নামটা বসিয়ে দাও"। তারপর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেল হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহ.) জীবনের অধিকাংশ ঘটনার সাথে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর ঘটনার হুবহু মিল রয়েছে। শুধু স্থানের তফাৎ। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) দুটি আধ্যাত্মিক বাণীর হুবহু মিল রয়েছে তা হলো "যুগে যুগে একই মুর্শিদ চিনে কয়জনা, মুর্শিদের মরণ হয় না কোন কালে। দেখলে তারে দেখার মত সাধনা কি লাগত এত, ভাবলে তাঁরে ভাবার মত ভাবনা রইত না আর"।[২৬]

---

২৬. মাওলানা সাহেবের ধারণকৃত বক্তৃতা (বয়ান) থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত সূফী হিসেবে আবির্ভাব ও দরবার প্রতিষ্ঠা

তা'লিমে যিক্‌র (মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ) প্রতিষ্ঠা

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা সাহেবের মুর্শিদ কিবলা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.)-এর হুকুম ও দু'আ'র মাধ্যমে তা'লিমে যিক্‌র (মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ) প্রতিষ্ঠা করেন ও সমগ্র বিশ্বে ইসলামের 'ইল্‌ম শরী'আত ও 'ইল্‌ম মা'রিফাতের আলো ছড়িয়ে দেয়ার এক অবিরাম মিশন শুরু করেন।

উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে অবদান

মাইলের পর মাইল কখনো পায়ে হেটে কখনো সাইকেল চালিয়ে মাহফিল করতে যেতেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে আনতে লাগলেন। উল্লেখ্য, বরিশালের হুযুর কিবলা জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি কখনই নিজের নামে বায়'আত (মুরিদ) করেন নি, এটা তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। সমাজে হক্বানী 'আলিম বৃদ্ধি করার লক্ষে, এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জামি'আ 'আরাবিয়া ছিদ্দিকীয়া দারুল 'উলুম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। যেখানে আদব, 'ইল্‌মে শরি'আত ও 'ইল্‌মে মা'রিফাত ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তা'লিম দেয়া হয়।

আধ্যাত্মিক জগতের এই দিকপাল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালিভ করে মহান আল্লাহ্‌ পাকের সাথে ভালবাসা স্থাপন করেছেন। মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ হচ্ছে হুযুরপাক (স.) কে ভালবাসার এবং তাঁর সুন্নতকে ভাবে পালন করার দরবার শরীফ। তিনি প্রতি বছর অগ্রহায়ন ও ফাল্গুন মাসে দুইবার বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনের আয়োজন করেন যেখানে তিন দিনে মুরীদগণকে 'ইল্‌মে মা'রিফাত ও 'ইল্‌মে শরি'আতের তা'লিম ও Practical Training এর মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা হুযুরপাক (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ সুন্নত পালনের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

এখানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও সৌদি আরব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও মুরিদগণ 'ইল্‌মে শরি'আত ও 'ইল্‌মে মা'রিফাতের তা'লিম নিতে এবং নবী প্রেমে মশগুল হয়ে সুন্নতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ছুটে আসে। এখানে পর্দা, আখলাক, 'ইল্‌ম থেকে শুরু করে তাসবীহ, পাগড়ী, মিস্‌ওয়াক পর্যন্ত সকল সুন্নতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নেয়া হয়। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফ, তার বাস্তব প্রমাণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে গেলে স্বচক্ষে অবলোকন করা যায়। এ দরবার শরীফে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও 'আলিমের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশী। বর্তমানে তাঁর বড় ছাহিবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী পিতার নির্দেশ ও

Dhaka University Institutional Repository

দু'আর মাধ্যমে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলন ও তা'লিমে যিক্‌র মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটিয়ে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারে বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছেন।

বর্তমান পীর সাহেব হুযুর সম্পর্কে তিনি ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন মাসের বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে বলেছিলেন "তোমাদের জন্য আমি একজন দরদী মনের মানুষকে রেখে গেলাম, আমি আমার 'আমলে যতটুকু ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করেছি আমার আদরের ছেলে তার 'আমলে এর চাইতে দশ গুণ বেশি প্রচার এবং প্রসার করবে, *বাপকা বেটা সিপাহিকা ঘোড়া* ... পিতার ছেলে শক্তিশালী হলেই পিতা শক্তিশালী হয়। আমার এ ছেলে দুনিয়াতে আসার পূর্বে আমি চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌পাকের নিকট দু'আ করেছি মা'বূদ আমাকে একটি ছেলে সন্তান দেন আমি এই সন্তানকে ইসলামের কাজের জন্য নিয়োজিত করবো, আল্লাহপাক আমার এ দু'আ কবুল করেছেন।"[২৭]

উল্লেখ্য, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের সকল মুরিদ ও সালিকগণ ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ, কারণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের পীর সাহেব হুযুর, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে শুধু বাংলাদেশেই নয় সমগ্র বিশ্বে অন্যতম।

চন্দ্রা, গাজীপুর -এ সাধনা

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের চান্দ্রা এলাকায় গভীর বন ছিল। সেই গভীর বনে মাওলানা সাহেব প্রকৃতির পরশে যিকর করতে যেতেন। তাঁর অধ্যাত্মিক সাধনার একটি বড় অংশ কেটেছে বনে বনে। চন্দ্রা বনে বনে মাহফিল শুরু করা এবং যিক্‌র করার ব্যাপরে মাওলানা আবুল হোসেন সাহেব তাঁকে সহযোগীতা করেছেন তিনি এ সময় মাওলানা তাঁর স্নেহে ধন্য হন। এছাড়াও তিনি ভারতের আসাম ও ত্রিপুরার বনে বনে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য সাধনারত ছিলেন।

শ্রীপুর, বরমীতে মাহফিল প্রতিষ্ঠা

গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের বরমীতে সিদ্দিকীয়া নন্দন কানন বনে মাওলানা সাহেব প্রতি বছর নিয়মিত মাহফিল করতেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ মুরিদ নিয়ে তিনি সারা রাত যিক্‌র করতেন। প্রতিদিন রাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের আল্লাহর যিক্‌রের শব্দে শ্রীপুর বন মুখরিত হয়ে উঠতো। শ্রীপুরবাসী আজও তাঁর স্মৃতিতে অশ্রু বিসর্জন করেন। এ বন মাহফিলটি বছরে একবার তাঁর প্রধান খলিফা আজও অবিকল পিতার মত পরিচালনা করেন।

২৭.

Dhaka University Institutional Repository

সফর

তিনি মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, গাজীপুর সহ দেশব্যাপী এলাকায় ব্যাপক সফর করে প্রায় এক কোটি মানুষকে আল্লাহর পথে এনেছেন। এরা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর নামের যিকর করে।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হককে স্বীয় পীরের নিকট বায়'আত (মুরিদ) করা

তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী, শের এ বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবকে তাঁর পীর সাহেব হুজুর চরমোনাইর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক সাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়'আত করে দেন। অর্থাৎ শেরেবাংলা সাহেব মাওলানা সাহেবের পীর ভাই ছিলেন। যারা শেরে বাংলার জানাজায় শরীক হয়ে তাকে দেখেছেন তারা জানেন তিনি বিদায়ের সময় তার নবীর সুন্নত দাড়ি নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। হযরত আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহ.)-এর ভাষায়, "আমি দেখলাম যে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেব মনেপ্রাণে একজন খাঁটি মুসলমান এবং লোকটার দেল ভাল। এই লোকটাকে যদি আমি আমার মোর্শেদ কিবলার হাত বায়'আত করিয়ে দিতে পারি তাহলে তার আখেরাতের একজন বন্ধু হয়। তখন শেরেবাংলা সাহবেকে আমি আমার মোর্শেদ কিবলার কাছে নিয়ে যেয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করিয়ে দেই। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমি মনে মনে ভাবলাম আমার মোর্শেদ কিবলার হাতে বায়'আত হয়ে নবীর সুন্নাত না নিয়ে তিনি ইনতিকাল করতে পারেন না, আমি তখন তাঁর জানাজায় শরীক হই এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে আমার পীরভাইকে দেখতে যাই। গিয়ে দেখি তার খ্রিস্টাব্দে নবীর সুন্নত দাড়ি দেখা যায়, তাঁর দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই মঙ্গল হল।"

চরমোনাইর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক (রহ.) তাঁর কলিজার টুকরা হযরত আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) কে মানুষের সামনে দাড় করিয়ে বলতেন, " এই আযহার আমার কলিজার টুকরা, ও মোর পালা হাতি, ওরে দিয়া মুই বড় বড় জংলা হাতি ধরমু।" এই কথা লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনেছে। এখানে হাতি কথার অর্থ হলো বড়শক্তি। এবং পালা হাতি হচ্ছে নিজে দেখাশুনা করে বড় করা মহাশক্তি এবং জংলা হাতি হচ্ছে বাইরের বড়শক্তি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেব মুলত একটা মহাশক্তির নাম। এবং মাওলানা সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) ছিলেন একটা পালা মহাশক্তি। তিনি পালা হাতি হওয়ার কারণে আরেকটা জংলাহাতিকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন। শেরেবাংলা সাহেবের মত বাঘকে মুরিদ করা সুর সহজ কথা নয়। এবং আশ্চর্যের কথা হল শেরেবাংলা সাহেব যে বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন সেই বছর মাওলানা সাহেব জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ বয়সে ছিল বিরাট তারতম্য কিন্তু 'আল্লাহর ওলীদের জবান আল্লাহর তরবারী' হওয়ার কারণে এটা সম্ভব হয়েছিল। বয়স কম হলে কি হবে তিনি তো লালিত মহাশক্তি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাসাউফ গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা

তিনি বিশ্ববাসীর জন্য ৮টি কিতাব উপহার দিয়েছে যার বিস্তারিত আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলে।

০১. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা : সমাজের নর-নারীকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ও চরিত্রবান আদর্শ নর-নারীর সুশৃংখল জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসাবে মনোবিজ্ঞানের আলোকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সমাজকে উপহার দিয়েছেন 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা' নামক মহাগ্রন্থটি।

০২. তারানায়ে জান্নাত : তারপর তিনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'তারানায়ে জান্নাত' বা বেহেশতের সুর নামক তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ অধ্যাত্মিক গজলের কিতাব প্রকাশ করে তাঁর কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যা সালিককে আল্লাহ পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়।

০৩. মহাস্বপ্ন : হুযুরপাক (সা.)-এর পর সুদীর্ঘ প্রায় ১৫ শত বছর পর তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত 'মহাস্বপ্ন' নামক কিতাবে একটি হাদীস শরীফের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

০৪. জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব : ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব' নামক কিতাবের মাধ্যমে জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহপাক অতি দয়া করে মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

০৫. মা'রিফাতের ভেদতত্ত্ব : ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'মা'রিফাতের ভেদতত্ত্ব' নামক মা'রিফাতের উচ্চাঙ্গের তথ্য ও দিক নির্দেশনা সম্বলিত কিতাব লিখেন যা চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীক্বার সালিকদের পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

০৬. মহা-ভাবনা : এ গ্রন্থে তিনি মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষ কতটুকু, মহাবিশ্বের অনেক অজানা দূর্লভ তথ্য, মানবদেহের বিস্ময়কর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যিক্‌র বা আধ্যাত্মিক মহাসাধনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন, যার ফলে অনেক অমুসলিমও নিয়মিত যিক্‌র করছে।

০৭. ধূম পিপাসা সর্বনাশা : ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'ধূম পিপাসা সর্বনাশা' কিতাবের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন কি উপায়ে ধূমপান করলে কোন ক্ষতি হয়না এবং কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করা যায় তার একটি অব্যর্থ উপায় বলেছেন। ইহা বহু পরীক্ষিত।

০৮. পীর ধরার অকাট্য দলিল : 'পীর ধরার অকাট্য দলিল' লিখে প্রমাণ করেছেন আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য পেতে হলে একজন হক্বানী পীর অবশ্যই ধরতে হবে। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্‌র ওলীগণ পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলো সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ সম্পর্কিত একটি মজার ঘটনা

একবার মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) স্টিমারে বরিশাল যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশের আসনে একজন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁর লিখিত 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা' কিতাবটি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন। পড়া শেষ করে ভদ্রলোক কিতাবের লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। ভদ্রলোক বললেন কিতাবে লেখক অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি হবেন, তাই এ ধরনের একটি কিতাব লেখা সম্ভব হয়েছে যা আধুনিক যুগের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এই কিতাবটি পড়ে অনেক পথভ্রষ্ট উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পর্দা কেন ফরয এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাবে। তার কথা শুনে তিনি নিজের পরিচয় গোপন রেখে বললেন- "কিতাবটি একটু দেখা যাবে কি?" তখন তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কিন্তু তাঁর পরনে লম্বা জুব্বা, মাথায় টুপি অর্থাৎ গায়ে পূর্ণ সুন্নতী পোশাক। ভদ্রলোক তাঁকে "বললেন আপনার মত মৌলভী কি এ ধরনের বিজ্ঞানের কিতাব বুঝবেন?" তিনি বললেন, না বুঝলাম; অনুগ্রহ করে দেন একটু দেখি। সে কিতাবখানা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে একটি ইংরেজী জার্নাল বের করে পড়তে পড়তে জিজ্ঞাসা করলেন, মৌলভী সাহেবের বাড়ী কোথায়? তিনি একটু মৌনতা অবলম্বন করলেন। ভদ্রলোক তখন জার্নালটি পড়ে পড়ে এর সারমর্ম বঙ্গানুবাদ করে তাঁকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি অবুঝ শিশুর মত মনোযোগ দিয়ে ভদ্রলোকের কথা শুনতে লাগলেন। হঠাৎ একটি বাক্যের শব্দার্থ ভুল বলায় মাওলানা সাহেব তাকে বললেন, "বাক্যটির অর্থ যথার্থ হল না মনে হয়, এ বাক্যটির অর্থ হয়ত এ রকম হবে"। বলতেই সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি করেন "একটু শিক্ষকতা করি"। লোকটি বললেন, "প্রাইমারী স্কুলে কী?", তিনি বললেন " আর একটু উপরে"। লোকটি বললেন, তাহলে "নিশ্চয়ই হাই স্কুলে", ভিনি বললেন " আর একটু উপরে"। বলতেই ভদ্রলোকটির চেতনায় আঘাত করল এবং তার বিছানা ছেড়ে মাওলানা সাহেবের বিছানায় এসে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার পরিচয় কি? আপনাকে একজন সাধারণ মৌলভী ভেবে অবজ্ঞা করেছিলাম" অবশেষে তাঁর আসল পরিচয় পেয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কিতাবখানা পড়ে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, সময় করে লিখকের সাথে দেখা করব, কিন্তু ভাগ্য আমার এমন সুপ্রসন্ন, যে আল্লাহ্পাক নিজ কৃপায় সে ব্যবস্থা করেই দিয়েছেন। তিনি কখনও নিজের আমিত্ব প্রকাশ করেন নি, সদাসর্বদা নিজেকে লুকিয়ে রেখে অতি সাধারণ মানুষের ন্যায় জীবনযাপন করতেন। তাই তাঁকে অনেকেই চিনতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সাহেব (রহ.) সর্বশেষ তাসাউফের বয়ান

তারিখ : ১১ই মে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ (১৪২১ হিজরী), মসিক মাহ্‌ফিল (সময় : সন্ধ্যা)
স্থান : মাসিক মাহ্‌ফিলের স্থান (তৎকালীন মসজিদ প্রাঙ্গন), সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ।

এটি ছিল মাওলানা সাহেব (রহ.)-এর সর্বশেষ মাহ্‌ফিল, দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার মাত্র দশদিন আগের বয়ান, এই মাহ্‌ফিলে অধিক সংখ্যাক ভক্ত উপস্থিত হয়েছিল। ভক্তবৃন্দকে সর্বশেষ দেখা দিয়েছিলেন এই দিন। অসুস্থতার জন্য বেশ কিছু দিন যাবৎ আব্দুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের কাঁধ হাত রেখে ভর করে মসজিদে জামায়াতে আসতেন। তারপর কয়েকদিন পর শরীর আরো অসুস্থ ও দুর্বল হওয়ায় আর বাইরে আসেন নি।[২৮]

বাদ মাগরিব তওবা করিয়ে মুনাজত করার পর...

এখন যারা নতুন বয়াত হইলেন তারা মাগরিব বাদ দুই দুই রাকায়াতে ছয় রাকায়াত আওয়াবিন পরবেন। একদিন আওয়াবিন পড়লে বার বছরের সগীরা গুনাহ্ আল্লাহ্‌পাক মাফ কইরা দেন। পইড়া লইয়া কেবলা দিক হইয়া বসবেন, বইসা কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি আনবেন। এটা জানি ছুটে না কোন সময়। দৃষ্টি আইনা লইয়া একটা লোক মরণ থাইকা কবরে যাইতে যা ঘটে, নিজের উপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটাইয়ে যাইবেন। খেয়াল করবেন আমি মইরা গেলাম, আমারে দুয়ারে বাইর করলো, বাইর করে আমারে গোসল দেয়, আমারে এখন কাফন দিয়া দুয়ারে শুয়াইয়া রাখছে। কাফনের তলে আপনারে কেমন দেখা যায়, চোখ দুইটা আধা চাওয়া হইয়া রইছে, পাজরের হারগুলা বাইর হইয়া গেছে। ঘরের বিবি একখানা মার্কিনের কাপর পইরা আপনার সামনে আইসা দুয়ারে আপনার মুখের দিক উপুর হইয়া কাফনখান গুছাইয়া কয় যে, আমাকে কি কইয়া গেলা। চাইয়া দেখবেন হাতে তার চুরি নাই, নাক খালি, গলা খলি। এই দেখলে দেখবেন দিলটা নরম হবে।

যতই বুদ্ধি খাটাও পেছনে তো পইরা গেলা, আল্লাহ্‌কে তো এখনও পাইলা না, এখনও তো পাওয়ার লাইনে পরলা না। তোমারে লইয়া মুসকিল যে, তা তো তুমি নিজে জানো না। কাজেই আজকে থেকে খাছ তওবা কইরা এই সবক আদায় কর। আর অতীতের দিন গুলা মুছে ফেল। সামনে একটা অন্ধকার, এই যে সামনে অন্ধকার দেখা যায়, এমনি একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ, সেইদিন তোমার কবরের কাছে কে দাড়াবে! মনে রাখবে একটা হাক্কানী মানুষ ধইরা যদি আমল কইরা যাইতে পার, তোমার আমলই কবরের পাশে মোর্শেদ রূপ ধারন করে দাড়াবে। তোমার মরণ কালে তোমার আমল এসে পীরের সূরত ধইরা দাড়াবে, তোমাকে তলকিন করে ঈমান দিয়া কবরে নিয়ে যাবে। বিশ্বাস কর আর না কর, বিশ্বাস না

---

২৮. মাসিক ভাটিনাও অবলম্বনে বয়ানটির ভাষার কোন পরিবর্তন না করে, হুবহু দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

কইরা কি যে মরা কাঠ হইয়া রইলা তাতো তুমি বোঝাই। তোমার চোখে পানি আসে না, মন তোমার নরম হয় না, শান্তি তুমি কেন পাও না, একটা মানুষের সংস্পর্শ নাই।

বেঁচে আছ এই আশ্চর্য্য,
নাই মানুষের সহচর্য্য,
ধাকতো যদি একটু ধর্য্য,
ঐশ্বর্য্য আর গায়ে ধরতো না,
মরণ বলে স্মরণ রাখো,
বেশী দিন আর বাঁচবে নাকো।

তুমি যে বাঁচার এত আশা কর, কোরআন শরীফে দেখছি আমি যে, হে আমার দোস্ত মুহাম্মদ (স.) আপনার কাছে আমার তরফ থেকে শাস্তি আসার আগেই আপনি হুঁশিয়ার হইয়া যান, আপনি হুঁশিয়ার হওয়ার আগে শাস্তি এসে পরতে পারে। মাবুদ আপনি আমাদের দয়া করে রক্ষা করে নিয়েন। আমাদের তো খুব আশা ছিল আপনার দরবারে আমরা যাবো, সেজন্যে আমরা এত মানুষ ছুটা ছুটি করি। কাজেই যারা বসে আছেন এখনও, এখন বসে থাকার সময় আর নাই। সামনে একটা অন্ধকার পথ কি দূর্গম রাস্তা। এ রাস্তা পারি দিতে হবে, তাইতো মরণ বলে স্মরণ রাখ, কবি বলেন দুঃখ করে-

বেশী দিন আর বাঁচবে নাকো
কথার মত কথা শিখো
মরণে যাবে জানা।

এই যে, আমি কথার মত কথা শিখাইয়া দেই এই কয়টা কথা লইয়া পুঁজি কইরা কবরে যাইবেন। আমি আমার মোর্শেদের পেছনে বাইশ বছর ঘুরছি, আমি এই কথা শিখে এসেছিলাম।

এই *সুবহানআল্লাহ্* ই, এই *আলহামদুলিলাহ্*। কিন্তু আপনি একজনকে বলে দেন তাছির হবে না, আবার যার বলে দেয়ার হুকুম আছে সে যদি বলে দেয় তাছির হবে। তেইশ বছর হলো আমার লেখাপড়ার বয়স আর বাইশ বছর ধইরা আমি চারটা কথা শিখছি সুবহানআল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, *আল্লাহ হু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্*। বলবেন কি কায়দায়, এই কায়দাটা শিখতে হইছে আমার তের বছর কষ্ট করে। কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি আইনা চক্ষু বন্ধ কইরা বইসা খেয়াল করবেন মরণের। মরণের খেয়াল করলে দিলটা নরম হবে তখন পাঁচ বার দরূদ শরীফ পড়বেন। খেয়াল করবেন যে এই দরূদ শরীফ আমি রওজা মোবারকে পাঠাইয়া দিলাম। খেয়াল করবেন রওজা মোবারক সামনে লইয়া দরূদ শরীফ পড়ি, এরপর *আস্তাগফিরুল্লাহ্* পড়বেন এগার বার, খেয়াল করবেন আমি আমার গুনার জন্য আমি তওবা করি। *অস্তাগফিরুল্লাহ্ অস্তাগফিরুল্লাহ্ অস্তাগফিরুল্লাহ্* পড়বেন এগার বার।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর একটা তজবী লইয়া *সুবহানআল্লাহ্* কইবেন একশ, *আলহামদুলিল্লাহ্* কইবেন একশ, আল্লাহ হু আকবার কইবেন একশ এই তিন কথারই লফজ মানে খেয়াল করবেন না।

খেয়াল করবেন তিনটা কথাই আল্লাহ্র তিনটা নাম। এভাবে *সুবহানআল্লাহ্ সুবহানআল্লাহ্* , খেয়াল করবেন আল্লাহ্রে আমি দেইখা ডাকি আল্লাহ্পাক জবাব দিয়া কন বান্দা আমারে কেন ডাকো। এরপর *আলহামদুলিল্লাহ্* কইবেন একশবার, *আলহামদুলিল্লাহ্ আলহামদুলিল্লাহ্* একই খেয়ালে আল্লাহ্রে আমি দেইখা ডাকি আল্লাহ্পাক জবাব দিয়া কন বান্দা আমারে ডাকো কেন, কি জন্যে ডাকো জবাবটা এই কানে শোনার চেষ্টা করবেন। এরপর *আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার* বালবেন না *আল্লাহু আকবার* আলাদা আলাদা আলাদা বলবেন। একই মানে খেয়াল করবেন আল্লাহ্রে আমি দেইখা ডাকি আল্লাহ্পাক জবাব দিয়া কন বান্দা আমারে ডাকো কেন। এরপর ডান দিকে মুখখান ঘুরাইয়া নিয়া লা উঠাইবেন ইলাহা কইতে কইতে বামে মাথা সোজা কইরা নিয়া আসবেন, নাকটা যে সময় বাও দুধের বোটা সোজা আসবে, মনে রাখবেন ইলাহা কওয়ার সময় মাথা বাকা করবেন না। লা ইলাহা কইয়া প্রাথমিক অবস্থায় মাথাটা একটু উচা কইরা ইল্লাল্লাহ্ কইবেন। ইল্লাল্লাহ্ মুখ দিয়া কইবেন কণ্ঠ দিয়া বলবেন না। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ডগ ডগা কইরা কইবেন, তারপর কল্ব থেকে একটা চিকন সূর বাইর হবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কইবেন পাঁচশো বার। পরে পাঁচবার দরূদ শরীফ পড়ে মোনাজাত দিয়া যাবেন।

এই জেকের ফজর বাদ করবেন একবার বেলা উঠলে ছয় রাকাত এশরাক নামজ পড়বেন, মগরেব বাদ আওয়াবিন পরে এই জেকের করবেন, না পারলে এশার নামাজ পইড়া করবেন মনে রাখবেন, এশার নামাজ পইড়াও জিকের হবে। তাতে না পারেন, শোয়ার আগে করবেন, তাতে না পারেন বিছানায় বইসা করবেন। এক সময় যদি ওযু না থাকে ওযু ছাড়াই করবেন, টুপি নাই টুপি ছাড়াই কইবেন, বাসে গাড়িতে বইসা করবেন। কোন কোন ব্যক্তি সবক দুই বেলা জিকের করবেন তারা একটু আল্লাহু আকবার কইয়া হাত উঠান, আলহাদুলিল্লাহ্ কইয়া হাত নামান। দুই বেলা এই সবকটা করতে পারেন এশরাক আওয়াবিন পড়তে পারেন তাহলে দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টায় আপনার মৃত্যু হইলে আপনার শহীদী মৃত্যু হয়ে যাবে। হাদিস শরীফে আছে মা'য়াতা শাহীদান মেশকাত শরীফে আমি দেখছি, আর মিয়াতা হাজ্জুন অন্য হাদীস শরীফে আছে একশ হজ্জ আর ওমরার নেকী তার আমলে জমা হবে।

একটা লোকরে কষ্ট কইরা আল্লাহ্র পথে আনেন। এই যে আমি কথা কইতেছি আমার কষ্ট হইতেছে, তবুও আমি আসি, যে আমার কষ্টের বদলে যদি একটা লোক আল্লাহ্র পথে আসে। কারন আমি সবক বাতিয়ে দেওয়া আর অন্য মানুষ সবক বাতিয়ে দেওয়া বেশকম আছে। একই কথা একজন বললে একই কথা অন্যজন বললে বেশকম হয়। আর যার যার পীরের কথা তার কাছে ভাল লাগে। অন্য কথা ভাল লাগে না। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, পীর চিনার আগে, পীর চিনা, পীর ধর শুনছেন তো বারে বারে। আপনারাও

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াজের মধ্যে কন। পীর যদি হবে লইলে পীরের ধন কতকাল খাবে। এই ধন রক্ষা করতে হইলে তাকে চিরজীবন একনিষ্ঠ থাকতে হবে।

আমার এ কথাটা গলার মইধ্যে গাইথা রাইখ, সিনার মইধ্যে গাইথা রাইখ। পীর ধইরা যদি চুল পরিমান বেশকম কর আর চুল পরিমাণ বেশ কম কর, যতটুক বেশ কম করবা অতটুক শাস্তি আলাহপাকের তরফ থাইকা তোমার সিনার উপর দিয়া চালান হইয়া যাবে।

বিসমিল্লাহ্ হির রহমানির রাহিম ফা মান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ান কুসুহুয়া নাফসিন- হুজুর কেবলা এই আয়াতে কারিমার তাফসিরে লেখছেন যে, পীর ধইরা যে নাকি বেশকম করল যে পরিমাণ বেশকম করল ঐ পরিমাণ তার জীবনের উপর দিয়া দুঃখ কষ্ট এবং বেদনা এবং আল্লাহ্পাকের গজব চালান হইয়া যাবে। হইয়া যাবেই ফিরাইতে পারবেন না, কাগজ আনেন আমি দস্তখত দেব, আর না হয় আমার হাতে চুরি দিবেন।

আমি যাহা বলি আল্লাহ্র ফজলে সত্য কথা বলি। আমি ছোট বেলার থেকে আমি মিথ্যা কথার মধ্যে আমি যাই নাই। পীর ধরাওয়ালা মানুষ এখনও মিথ্যার মধ্যে ডুইবা আছো, এখনও মিথ্যা ছাড়, এখনও নানান হাবিজাবি কাজের থেকে তওবা হও। তা যদি তুমি না কর, এখন গায়ের জোড়ে পাহাড় ঠেইলা নিবা, কিন্তু ভবিষ্যতে কিন্তু এর অমঙ্গলটা তুমি বুঝতে পারবা। আমি থাকবো না কিন্তু তোমার কাঁদতে হবে। এই কয়ডা কথা লেখ। আমার কথার ভিতরে না থাক, আর পীর ধইরা যদি সই মত না চল, তাইলে তোমাকে কাঁদতে হবে একদিন, লেইখা রাখ আমি দস্তখত দিয়ে যাব।

আমি চিরকাল টিকব না, আমার হুজুরও চিরকাল টিকে নাই। হুজুরে আকরাম (স.) কে, রসুলুল্লাহকে আল্লাহপাক ছাড়েন নাই। মাবুদরে আপনি আমারে মাফ কইরা দিয়েন। আপনের দোস্তরে আপনি ছারেন নাই। আমি জানি আমার ভূল থাকতে পারে যদি আমাকে আপনি ধরেন। রব্বানা লা তুয়াখ্খিযনা ইন্না সিনা, হে মাবুদ যদি আমার ভূল হইয়া যায়, লা তুয়াখিযনা আমাকে তাইলে পাকড়াও কইরেন না। রাব্বানা ইন্না সিনা ওয়াখতানা, যদি আমার ভূল হইয়া যায়, যদি আমার ভূল হইয়া যায়, আমার খাসাখুসুল হইয়া হইয়া যায়, তবে আল্লাহ্পাক আপনি আমাকে, লা তুয়াখিযনা, আপনি আমাদের পাকড়াও কইরেন না। আপনি আমাকে আটকাইয়েন না, আমার সঙ্গে আমীন কন। দেখ আমি অনেক কথা কিন্তু ভইঙ্গা কই না। অনেক কথাই আমি ভাঙ্গি, ভাইঙ্গা কইয়া দেই। এই কওয়ায় ও যদি যুইতবরাদ্দ (হুঁশ) শরীরের মধ্যে না আসে।

তাহলে আল্লাহ্র কসম কইরা কইতে পারি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি আমি। আমি আমার ছেলের মঙ্গলও যেরকম কামনা করি, একটা আদনা মুরিদের মঙ্গলও একইরকম কামনা করি। তোমরা নিজেরা মিছা কতা কও, কাজেই মনে কর হুজুরেও বুঝি মিছা কতা কয়। যদি আমার কথা, আমি ভদ্রলোকর সন্তান, আমার পিতায় প্রফেসার ছিলেন, আমার বাপজান প্রফেসার ছিলেন, তাঁর বাপজান উনি বিলাত ফেরত সার্জেন ছিলেন। বিলাত ফেরত সার্জেন

Dhaka University Institutional Repository

আমার দাদায়, আমি সেই ফ্যামিলি, আমার মার নাইনাল দাইদাল মা বাপের কোলে একটা সৈয়দের মেয়ে, আমি তাঁর সন্তান। আল্লাহ্‌র ফাজলে আমি মিথ্যা মিথ্যির মধ্যে আমি নাই।

আমি যা বলি কোরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফের বাইরে যদি কেউ কিছু পাও, আমার কান কাটো, ধইরা নাক ধর, কান ধর, সঙ্গে সঙ্গে ধর। কোরআন শরীফে যেমন লেখা আছে ফামান্নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ানকুসু আলা নাফসি। দেখ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পরে হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ)'র যমানায়, তাঁর খেলাফতের আমলে তিরিশ জন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তিরিশ জন নবী দাবী করল। আমি জানি আমার মন্‌যুর বিরুদ্ধে মেলাই মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, ওর জন্যে আমি খাস দোয়া করছি। অজর অমর অক্ষয় হইয়া ইনশাল্লাহ্‌তায়ালা ও থাকবে। আর ওর যোগ্যতা তুমি দেখ, আমি বাছাই কইরা দেখছি, আমার কোন একটা মুরিদের ভিতরে এরকম যোগ্যতা তালাশ কইরা পাওয়া যায়। আমি তো যোগ্যতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো তাকে আমি খেলাফত দিতেছি। আমিতো টোকাইতেছি, আমার টোকায় যদি উঠে তাইলে আমি খেলাফত দেই। এই যে দুই জনরে দিলাম। আরো যে দেব না তার তো কোন মানে নাই। কাকে স্বাব্যস্ত করবো না করবো, আমার টোকায় উঠতে হবে তো। এখন, তবে মন্‌যুকে আরো পরে, কিছু পরে দেয়া হত, একটু আগে হয়ত ছয়মাস আগে দেয়া হইছে কারণবশত। আমার বাপজানের আর মায়ের দুইজনের কবরের কাছে দাড় করাইয়া আমি খেলাফত দিছি। যেখানে বছরে একবার আমার যাওয়া পরে না, একবছর পরে একবার আমি যাই। মরি না বাছি তা বলা যাবে না। এরপর আমার টোকায় যদি কিছু উঠে তারপর দেখবেন যে বলা লাগবে না তার কাছে একাই যাবে।

মাওলানা সাহেবের (রহ.) খিলাফত (সনদ) প্রদান ও ইন্‌তিকাল

১. ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ফাল্গুন তাঁর সুযোগ্য বড় ছাহিবজাদা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকীকে, চিশতিয়া ছাবিরিয়া ও কাদ্‌রীয়া উভয় তরীক্বার পূর্ণ খিলাফত দিয়েছেন ।

২. ২০০০ খ্রিস্টাব্দে মুফতী 'আযম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীমকে কাদ্‌রীয়া তরীক্বা থেকে সনদ দিয়েছেন। তিনি বর্তমানেও মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে আদবের সহিত নিয়মিত তালকিন নেন।

৩. ২০০০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মাওলানা মোঃ অব্দুস সাত্তার আশরাফীকে চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীকার নফিএসবাত (২য় সবক) পর্যন্ত সবক বাতাবেন এবং হাব্‌সে দম সবকের জন্য মুরিদকে মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে নিয়ে আসবেন এই সনদ দিয়েছেন।

৪. ২০০০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মাওলানা মোঃ মাসুম বিল্লাহ জিহাদীকে, চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার নফি এসবাত (২য় সবক) পর্যন্ত সবক বাতাবেন এবং হাব্‌সে দম সবকের জন্য মুরিদকে মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে নিয়ে আসবেন এই সনদ দেন। তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হুজুরপাক (স.)-এর খাঁটি ওয়ারিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথাটি বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে সুন্নত স্বরূপ তাঁর আদরের নাতী-নাতনী ভাইদেরকে বলেছিলেন। তিনি সারা জীবনের অজস্র পরিশ্রমে ৬৭ বছর বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পরেছিলেন। সেদিন ছিল ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে রবিবার দিবাগত রাত্রি অর্থাৎ সোমবার, তাঁর কন্যাদেরকে বললেন আমাকে ভাল করে গোসল করিয়ে দাও। সবাই তাঁকে গোসল করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন আমাকে খাবার দাও আমি আজকে খাব, তিনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেন। তারপর ইস্তিঞ্জা থেকে এসে অযু করে বিছানায় শুতেই শরীর খুব খারাপ লাগছিল, বিছানায় শুয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে পাছ আন ফাছ সবক (নিঃশায নিতে আল্লাহ্ ছাড়তে হু) করতে ছিলেন। কিছুক্ষণ সবক করতে করতে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের নয়নমণি, কুতুব উল আকতাব, হুযুরপাক (সা.)-এর এই খাঁটি ওয়ারিস সকলের বুক খালি করে দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়াল হয়ে যান।

ইন্তিকালের তিন দিন পূর্বে তাঁর আদরের সন্তান আল্লাহর বান্দা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকীকে ৫ দিনের জন্য ফরিদপুর সফরে যেতে হচ্ছিল। সব সময় সফরে গেলে হুযুর খুব খুশি হতেন। কিন্তু সেদিন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তারাতারি চলে এসো, সোমবারের ভিতরে। তিনি সফরে গেলেন রবিবার রাতেই তিনি ফোল পেলেন আব্বা খুব অসুস্থ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তারপর তিনি রওয়ানা হয়ে রাত ১ টার দিকে মানিকগঞ্জে এসে পৌঁছলেন। ইতিমধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক শত মুরিদ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে হাজির হয়েছে, তারা অনেকেই তখনও জানে না তাদের হুযুর আর নেই। এত মুরিদের সমাগম দেখে তিনি চিন্তিত হলেন কিন্তু ভাবলেন হয়তো অসুস্থতার খবর পেয়ে সবাই এসেছে। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখলেন কিছু বাঁশ কাটা হয়েছে তারপর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে তিনি আব্বা বলে জোড়ে চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করলেন। সেই চিৎকারের শব্দে বাইরের সকলেই বুঝে গেল তাদের নয়নমণি আর নেই। শুরু হলো কান্না। অনেকেই অজ্ঞান হয়ে গেল। সারা বাংলাদেশে মুহূর্তেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। ভোর হতেই হাজার হাজার মানুষ আসতে শুরু করলো মানিকগঞ্জে। সেদিন মানিকগঞ্জের আকাশে বাতাসে শোকের ছায়া নেমে এলো। সারা শহরব্যাপী দোকান পাট সব বন্ধ ছিল। আশে পাশে থেকে হিন্দুভাইয়েরা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছিল। কবর খনন করা হচ্ছে হুযুরের ওসিয়ত করা নির্দিষ্ট জায়গায়। হুযুরকে গোসল করিয়ে মদীনা শরীফ থেকে আনা কাফনের কাপড় পড়িয়ে দিলেন তার জামাতা মাওলানা মুজিবুর রহমান খান। যোহর নামাযের পর হুযুরকে বাহিরে মুরিদের মাঝে আনা হলো তখন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য ঘটলো। কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে গেল। শুরু হলো কান্না। প্রকৃতিও যেন একসাথে কাঁদছিল সেদিন। দুপুর ২ টার দিকে তাঁর প্রথম জানাজা নামায পড়ানো হলো। জানাজা পড়ালেন তাঁর আদরের সন্তান আল্লাহর বান্দা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী। প্রথম জানাজায় প্রায় লক্ষাধিক মানুষ হয়েছিল, এ সময় সমগ্র আকাশ অন্যরকম কালো হয়েছিল এক চিলতে বৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। 'আলিমদের মতে তখন ফিরিশতা ও জীনরা জানাজায় শরীক হয়েছিল। তারপর তাঁকে আবার বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপার ঘণ্টা খানিক পর আবার বাহিরে আনা হলো এ সময় দ্বিতীয় জানাজা নামাজ পড়ানো হলো, এ জামায়াতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ হয়েছিল। তারপর আবার বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বাদ আছার আবার বাহিরে আনা হলো এ সময় তৃতীয় জানাজা নামায পড়ানো হলো। এ জামাতেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ হয়েছিল। তারপর আছর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময় আল্লাহর ওলীকে দাফন করা হয়েছে। দাফনের আধা ঘণ্টা পরই আল্লাহর ওলীর ইন্তিকালে প্রকৃতি কাঁদা শুরু করলো। সেদিন হঠাৎ করেই দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল। এভাবেই যুগ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জগতের এই মহান দিকপালের দাফন সম্পন্ন হলো। পরদিন দেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে আল্লাহর ওলীর নূরানী ছবিসহ ইন্তিকালের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল।

মাওলানা সাহেব (রহ.)-এর চিশতিয়ায়ে ছাবিরিয়া তরীক্বার শাজারা শরীফ[২৯]

১. হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মাদ মন্‌জুরুল ইসলাম সিদ্দিকী। (মাওলানা সাহেবের প্রধান খলিফা)
২. তাঁর পীর ও পিতা কুতুব-উল-আকতাব অধ্যাপক (অব.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)। (১৩৫৭-১৭ সফর, ১৪২১হি./১৯৩৭ - ২০মে, ২০০০ খ্রি.)।
৩. তাঁর পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.)। (১৩১৯-১৩৯৩ হি./১৯০৩ - ১৯৭৩ খ্রি.)।
৪. তাঁর পীর হযরত মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)। (মৃ. ৯ রবি. আও, ১৩৫০ - হি./১৯৩১ খ্রি.)।
৫. তাঁর পীর কুতুবে আলম রশীদ আহম্মাদ গাঙ্গুহী (রহ.)। (৬ যিলকদ, ১২৪৪ হি.- ৯ জমা.সানি, ১৩২৩ হি./ ১৮২৬ - ১২ আগষ্ট, ১৯০৫ খ্রি.)।
৬. তাঁর পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.)। (১২৩০-১৩১৭ হি./ ১৮১৪ - ১৮৯৯ খ্রি.)।
৭. তাঁর পীর মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝানজানবী (রহ.)।
৮. তাঁর পীর হাজী শাহ আব্দুর রহীম শহীদ বেলায়েতী (রহ.)।
৯. তাঁর পীর শাহ আব্দুল বারী আমরহী (রহ.)।
১০. তাঁর পীর মাওলানা শাহ অব্দুল হাদী আমরহী (রহ.)।
১১. তাঁর পীর মাওলানা শাহ আজদুদ্দীন (রহ.)।
১২. তাঁর পীর শাহ মুহাম্মাদ মক্কী (রহ.)।

---

২৯. ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র*, মানিকগঞ্জঃ সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৪৮-৫১

Dhaka University Institutional Repository

১৩. তাঁর পীর মাওলানা শাহ মুহাম্মাদী (রহ.)।
১৪. তাঁর পীর মাওলানা শাহ মহিবুল্লাহ এলাহাবাদী (রহ.)।
১৫. তাঁর পীর মাওলানা শাহ আবু সাঈদ গঙ্গুহী (রহ.)।
১৬. তাঁর পীর শাহ নিজামুদ্দীন বলখী (রহ.)।
১৭. তাঁর পীর শাহ জামালুদ্দীন (রহ.)।
১৮. তাঁর পীর আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (রহ.)।
১৯. তাঁর পীর শাইখ মুহাম্মাদ ফারুকী (রহ.)।
২০. তাঁর পীর শাইখ মোখদম আরেফ ফারুকী (রহ.)।
২১. তাঁর পীর মাওলানা শাইখ আহম্মদ আব্দুল হক (রহ.)।
২২. তাঁর পীর শাহ জামালুদ্দীন (রহ.)।
২৩. তাঁর পীর মাওলানা শাইখ শামসুদ্দীন তুর্ক (রহ.)।
২৪. তাঁর পীর শাইখ আলাউদ্দীন (রহ.), (১৯ রবি. আও. ৫৯২ - ১৩ রবি.আও. ৬৯০ হি./১১৯৬ - ১২৯১ খ্রি.)।
২৫. তাঁর পীর শাহ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (রহ.), (১১৭৩-১২৬৬ খ্রি. অথবা ১১৮৮-১২৮০ খ্রি.)।
২৬. তাঁর পীর কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) (৫৬৯- ১৪ রবি.আও, ৬৩৩ হি./১১৭৩- ২৭ নভেম্বর, ১২৩৫ খ্রি.)।
২৭. তাঁর পীর খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী আযমিরী (রহ.)। (৯ জমা.সনি ৫৩৬ - ৬ রজব, ৬২৭ হি./১১৪১-১২৩০ খ্রি.)।
২৮. তাঁর পীর খাজা উসমান হারুনী (রহ.)। (মৃ. ৬ শাওয়াল, ৬১৭ হি./ ১২১৯ খ্রি.)।
২৯. তাঁর পীর মাওলানা শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ.)। (ও.৩রজব,৬২১হি./১২৩৫ খ্রি.)।
৩০. তাঁর পীর খাজা মওদুদ চিশতী (রহ.)। (মৃ. ২ রজব, ৫৫৭ হি./১১৬১ খ্রি.)।
৩১. তাঁর পীর মাওলানা শাহ আবু ইউছুফ (রহ.)।
৩২. তাঁর পীর শাহ আবু মুহাম্মাদ চিশতী (রহ.)। (মৃ. ২ রজব, ৪১১ হি./১০১৩ খ্রি.)।
৩৩. তাঁর পীর শাহ মুহাম্মাদ আবদাল চিশতী (রহ.)।
৩৪. তাঁর পীর শাইখ আবূ ইসহাক শামী (রহ.)।
৩৫. তাঁর পীর খাজা শামশাদ (রহ.)। (১৪ মহররম, ২৯৮হি. / ৯০৯ খ্রি.)
৩৬. তাঁর পীর হযরত আমিন উদ্দীন আবূ হুরায়রা বছরী (রহ.)।
৩৭. তাঁর পীর হযরত শাহ হুজায়ফা মারাশী (রহ.)।
৩৮. তাঁর পীর শাহ ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী (রহ.)। (মৃ. ২৮ জমা. আও. ২৬২ হি./৮৭৬ খ্রি.)
৩৯. তাঁর পীর হযরত ফুজাইল ইব্ন আয়াজ (রহ.)। (মৃ. ১৮৭ হি./ ৮০৩ খ্রি.)
৪০. তাঁর পীর খাজা অব্দুল ওয়াহিদ (রহ.)। (মৃ. ২৮ সফর, ১২৬ হি./৭৪৪ খ্রি.)
৪১. তাঁর পীর হযরত হাসান বসরী (রহ.)। (২১-১১৯হি./৬৪১-৭৩৭ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৪২. তাঁর পীর হযরত 'আলী (রা.)। (যিলহজ্জ ১৩, ২০হি.পূ.- রমযান ২১, ৪০হি./ মার্চ ১৭, ৫৯৯- জানুয়ারী ২৮, ৬৬১ খ্রি.)

৪৩. তাঁর পীর সাইয়্যেদেনা নাবিয়্যেনা অছিলাতিনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (দ.)। (৫২ হি.পূ.- ১১হি./ ৫৭০- ৬৩২ খ্রি.)

তাসাউফ চর্চায় মাওলানা সাহেব (রহ.)-এর পূর্ববর্তীগণের মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন বিখ্যাত সূফী সাধকের পরিচয়[৩০]

হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.) (১৩১৯-১৩৯৩ হি./১৯০৩ - ১৯৭৩ খ্রি.):

তিনি মাওলানা সাহেবের তৃতীয় পীর ছিলেন । তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি উজানীর ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর খলিফা এবং সুবিখ্যাত বিশ্ব তা'লিমে যিক্র মনিকগঞ্জ দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর কুতুব উল আকতাব অধ্যাপক (অব.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর মুর্শিদ কিবলা। তিনি সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। আল্লাহর 'ইশ্কে তিনি সব সময় একটি বিশেষ হালাতে থাকতেন। তিনি যখন কথা বলতেন মানুষের ক্বলব জাগ্রত হয়ে যেত। তাঁকে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) খিলাফত দিয়ে বলেছিলেন, বাবা মৌলভী ইসহাক তুমি বিনা চাষে জমিনে দানা রোপন করবে। অর্থাৎ আম বায়'আত (মুরিদ) করতে এজাজত দিলাম। ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) একদিন হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.)-এর মাথার উপর হাত রেখে বলেছিলেন, মৌলভী ইসহাক তোমার দ্বারা কুতুব উল আলম রশীদ আহম্মাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর তরিক্বার মাধ্যমে কলেমার দাওয়াত আল্লাহ তা'য়ালা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছাবে ইন্শাআল্লাহ। বাস্তবেও তাই হয়েছে তিনিই প্রথম বাংলায় যিক্র জলি এবং মসজিদে মসজিদে হালকায়ে যিক্র চালু করেন। এখন বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ মসজিদেই চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বর হালকায়ে যিক্র চলছে। তিনি পানির উপর জায়নামায বিছিয়ে নামায আদায় করতেন।[৩১] তিনি সর্বক্ষণ অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করতেন।

---

৩০. ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বিশ্ব তা'লিমে য়িক্র*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ২৪৬-২৯০

৩১. মাওলানা সাহেবের (রহ.)-এর ধারনকৃত বক্তব থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কয়েকটি অমূল্য বাণী-

১. যিক্‌র করতে করতে করতে করতে দেখবে কি বের হয়।

২. ইংরেজী ভুল বললে গুনাহ হবে না, আরবী ভুল বললে গুনাহ হবে।

৩. নিজের 'আমলে মাফ পাবে না একটি মানুষ ধরে আল্লাহর রাস্তায় নিয়ে আসলে সেই ওসিলায় আল্লাহ মাফ করে দিবেন।

৪. তিনি বলতেন, মাগরিবের তিন রাকাআত ফরয পড়বে বাংলার জমিনে আর দুই রাকাআত সুন্নত পড়বে আল্লাহর ঘর কাবা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে। তখন তাঁর প্রিয় মুরিদ অধ্যাপক (অব.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) বলেছিলেন, হুযুর এটি কি অনুমানে না বর্তমানে। তারপর তিনি বলেছিলেন, "হ্যা কি বললে বারিস্টার সাব! আল্লাহর ঘর দেখে সিজদা দিবে "।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল গনি (রহ.) (বনবাসী দরবেশ)

তিনি মাওলানা সাহেবের দ্বিতীয় পীর ছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল গনি (রহ.) আসামের বনবাসী দরবেশ নামে পরিচিত। তিনি কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাদরীয়া তরীক্বার বোনাফাইড খলিফা ছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল গনি (রহ.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকীকে (রহ.) 'ইসমে আ'যম' শিক্ষা এবং কাদরীয়া তরিক্বার খিলাফত দিয়েছিলেন। তিনি ডান পায়ের বৃদ্ধাগুলির উপর ভর করে সাধনারত অবস্থায় আড়াই বছর আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল ছিলেন। তিনি অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌র করতেন।

হযরত আবূ বকর ছিদ্দিকী (রহ.) (১২৭৪-১৩৫৮ হি. /১৮৫৭ - ১৭ মার্চ, ১৯৩৯ খ্রি.)

তিনি মাওলানা সাহেবের প্রথম পীর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের একজন আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি হযরত আবূ বকর ছিদ্দিক (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা সূফী ফতেহ আলী (রহ.)-এর নিকট বায়'আত হন। তাঁর পীরের সান্নিধ্যে অল্প সময়েই তিনি 'ইলম তাসাউফ হাসিল করেন এবং খিলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি সমাজ থেকে বিদ'আত ও গোঁড়ামী দূর করে সমাজের ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ৮ শত মাদরাসা ও ১১ শত মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতেন।

উজানীর হযরত ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) (মৃ. ৯ রবি. আও, ১৩৫০- হি. / ১৯৩১ খ্রি.)

তিনি মাওলানা সাহেবের প্রথম দাদাপীর ছিলেন। তিনি জগদ্বিখ্যাত 'আলিম হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর খলিফা এবং চরমোনই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর সাহেব আল্লাহর কুতুব হযরত মাওলান সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.)-এর মুর্শিদ কিবলা। হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গুহী (রহ.) হযরত ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) কে খুব স্নেহ

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। হযরত ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) আল্লাহ পাকের উচ্চ স্তরের ওলী ছিলেন। তিনি যখন তার পবিত্র কণ্ঠে আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতেন তখন ৪০ হাত নিচের কুপের পানি উপরে চলে আসতো এবং লোকজন সেখান থেকে পানি নিয়ে যেত। প্রকৃতি তাঁর তিলাওয়াতে সাড়া দিত। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর যিক্‌র করতেন। যিক্‌র করতে করতে তাঁর যখন হালাত সৃষ্টি হতো তখন তিনি বেত বনের ভিতর দৌড় দিয়ে চলে যেতেন। হযরত মাওলান সৈয়দ ইসহাক (রহ.) বলেন, স্বাভাবিক ভাবে ঐ বনে প্রবেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর হালাত দীর্ঘ সময় ধরে থাকতো ৭ দিন, ১০ দিন এমনকি ২০ দিন পর্যন্ত তাঁর হালাত থাকতো। তিনি যখন যিক্‌র করতেন তখন পুরো উজানী গ্রামটিই কাঁপতে থাকতো। তিনি যখন ইন্‌তিকাল করেন তখন যিক্‌র রত ছিলেন। এ সময় তাঁর ছেলে মৌলভী শামসুল হকের ভাগ্নে দেখতে পেলো তিনজন নূরানী সূরাতের মানুষ তাঁর পাশে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হলো আপনারা কোত্থেকে এসেছেন, একজন বললেন আমি ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ আর এরা দুইজন দুই ফিরিশতা আমরা ক্বারী ইব্রাহীম ছাহিবকে এগিয়ে নিতে এসেছি। এর কিছুক্ষণ পরেই একবার উচ্চস্বরে আল্লাহ বলে যিক্‌র করে ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান। উল্লেখ্য, তিনি এতই যিক্‌র করতেন যে, লোকে তাঁকে পাগল বলতো এবং তখন তিনি চিৎকার দিয়ে বলতেন, "মাবূদ একটি মানুষ স্বাক্ষী দিয়েছে আমি তোমার যিক্‌রে পাগল, তুমি এটি গ্রহণ কর।"

যিক্‌র সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি বাণী :

১. ক্বলব হলো সাগরের মতে। সাগরে যেমন জোয়ার আসলে নদী নালা পূর্ণ হয়ে যায়, তেমনি ক্বলবে আল্লাহর নূর আসলে সকল লতীফা পূর্ণ হয়ে যায়।

২. মানুষের ৩৬ কোটি লতিফা আছে। ক্বলবে যিক্‌র আরম্ভ হলে সমস্ত পশমে যিক্‌র হতে থাকে।

৩. মানুষে যে পথে তাড়াতাড়ি আল্লাহর প্রেম হাসিল করে আল্লাহর দরবারে যেতে পারে সে পথ দেখানো দরকার।

৪. তোমরা কিছুতেই আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফিল হবে না।

হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গুহী (রহ.) (৬ যিলকদ, ১২৪৪ হি.- ৯ জমা.সানি, ১৩২৩ হি./ ১৮২৬ - ১২ আগষ্ট, ১৯০৫ খ্রি.)

তিনি হযরত আবূ আইয়ূব আনাছারী (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতা হযরত হিদায়েত আহম্মাদ শায়খ হযরত গোলাম 'আলী ছাহিবের (রহ.) খলিফা ছিলেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গগুহী (রহ.) বিখ্যাত সাধক হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (রহ.)-এর খলিফা ও উজানীর ক্বারী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম (রহ.)-এর মুর্শিদ কিবলা ছিলেন। তিনি সর্বক্ষণই আল্লাহর যিক্‌র করতেন এবং সঙ্গে তাজবীহ রাখতেন। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন বর্বর ভাবে প্রখ্যাত 'আলিম ও খাঁটি মুসলমানদেরকে সন্দেহবশত জেলে ঢুকিয়েছে এবং অনেককে

Dhaka University Institutional Repository

ফাঁসিও দিয়েছে। তখন তারা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (রহ.), হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গগুহী (রহ.) ও হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী (রহ.)-এর নামেও গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করে। এ সময় বিখ্যাত সাধক হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (রহ.) হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করেন এবং ১২৭৫ হি./১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে হাকীম জিয়াউদ্দীনের বাড়ী থেকে হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গগুহী (রহ.) কে গ্রেফতার করা হয়। তখন বিচারপতী তাঁকে প্রশ্ন করে, আপনার কাছে কোন অস্ত্র আছে কি? তিনি তাঁর আল্লাহর যিক্‌রের তাসবীহ দেখিয়ে বলেন, আমার কাছে এ অস্ত্র রয়েছে। তারপর ব্রিটিশ সরকার তাদের সাজানো মিথ্যা মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এ ঘটনা উল্লেখ করার কারণ তিনি সর্বাবস্থায় যিক্‌র করতেন এবং তাসবীহ রাখতেন এবং তাসবীহর কারণেই সম্মান লাভ করেছেন তা পাঠক মহলকে জানানো। তিনি তাঁর মুরিদানকে অধিক পরিমানে যিক্‌র মুরাক্বাবা ও মুশাহাদা করার হুকুম দিতেন এবং পাশাপাশি তিনি সুন্নতের প্রতি বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তাই বেশি বেশি যিক্‌র করতে হবে।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (রহ.) (১২৩০-১৩১৭ হি./১৮১৪-১৮৯৯ খ্রি.)

তিনি 'ইল্‌ম তাসউফের একজন দিকপাল ছিলেন। ফলে জগদ্বিখ্যাত 'আলিম হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গাঙ্গুহী (রহ.) এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গাঙ্গগুহী (রহ.) একটি হাদীস শরীফের মতন, রাবী ও বালাগাত ইত্যাদি কোন কিতাবেই খুজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তখনই তাঁর সে তথ্যগুলো জানা খুবই প্রয়োজন ছিল। এ সময় তিনি হাজী ইমদাদুল্লহ মুহাজির মাক্কী (রহ.)-এর কামালিয়াতের কথা শুনেছিলেন। তখন কোন উপায় না পেয়ে তিনি হাজী ইমদাদুল্লহ মুহাজির মাক্কী (রহ.)-এর দরবার শরীফে হাযির হয়ে হুযুরের নিকট খবর পাঠালেন তিনি এসেছেন। তারপর হাজী ইমদাদুল্লহ মুহাজির মাক্কী (রহ.) বেরিয়ে আসলেন এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গুহী (রহ.) তাঁর সমস্যার কথা হুযুরকে জানালেন। তিনি বললেন রশীদ আহম্মাদ তুমি এত বড় 'আলিম হয়ে আমার কাছে এসেছো, তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি। তারপর হাজী ইমদাদুল্লহ মুহাজির মাক্কী (রহ.) তাঁর হুযরায় গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর এসে তিনি বললেন, রশিদ আহম্মাদ তোমার হাদীস শরীফের মতন এই, রাবী এই, বালাগাত এই। হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গুহী (রহ.) উত্তর পেয়ে খুব খুশি কিন্তু তিনি অবাক হয়ে হুযুর কে আদবের সহিত জানতে চাইলেন হুযুর আমি এত পরিশ্রম করে যা কিছুতেই পেলাম না আপনি কিভাবে এত সহজে তা বের করে দিলেন, আমাকে দয়া করে বলেন। তখন হাজী ইমদাদুল্লহ মুহাজির মাক্কী (রহ.) বললেন, তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছো আমি তখন আমার হুযরায় গিয়ে দুই রাকাআত নামায পরে হুযুর (স.) কে বললাম, রশিদ আহম্মাদ আমার কাছে এসেছে এই হাদীস শরীফ সম্পর্কে জানতে চায় তখন দয়াল নবীজী (স.) বললেন, রশিদ আহমদকে এই

Dhaka University Institutional Repository

এই বলে দাও। আমি তখন উনি যা যা বলেছেন তাই তোমার কাছে বলে দিয়েছি। আমি কোন কিছু বুঝিও নি আমার বুঝার ঠেকাও নেই। রশীদ আহমদ, তোমার হলো হাদীস শরীফের ঠেকা আমার হাদীস শরীফের ঠেকা নেই আমার ঠেকা হলো হাদীস শরীফের মালিকের।"[৩২] বলার সাথে সাথে হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মাদ গঙ্গুহী (রহ.) বললেন হুযুর আপনি দয়া করে আমাকে বায়'আত করে নিন। তখন হাজী ইমদাদুল্লহ মুহাজির মাক্কী (রহ.) তাঁকে বায়'আত (মুরিদ) করে নেন। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর যিক্‌র করতেন।

হযরত আলী আহম্মাদ আলাউদ্দিন ছাবির কালীয়ারী (রহ.) (১১৯৬ - ১২৯১ খ্রি.)

তিনি চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বার দিকপাল ছিলেন। অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের প্রখ্যাত সুফী সাধক ও আল্লাহর ওলী ছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত পীর হযরত ফরিদ উদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর (রহ.) (১১৭৩-১২৬৬ খ্রি. অথবা ১১৮৮-১২৮০ খ্রি.)-এর নিকট বায়'আত হন। তিনি দীর্ঘ দিন তাঁর সান্নিধ্যে থেকে 'ইল্‌ম মা'রিফাত হাসিল করে খিলাফত লাভ করেন। তিনি চিশতিয়া তরীক্বারা ব্যাপক প্রসার ঘাটান। পরবর্তীতে তাঁর নাম অনুসারেই এ তরীক্বার নাম চিশতিয়া ছাবিরিয়া তরীক্বা হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। তিনি অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌র করতেন। সারারাত্রি তিনি 'ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। আল্লাহর উচ্চ পর্যায়ের আশিক হওয়ার ফলে তাঁর চোখে বিশেষ জ্যোতি লক্ষ্য করা যেত। হযরত আলী আহম্মাদ আলাউদ্দিন ছাবির কালীয়ারী (রহ.) আল্লাহর দীদারে ডুবে থাকতেন ফলে দুনিয়ার কোন কিছুর মোহে তিনি পড়তেন না। তিনি তাঁর মুর্শিদ কিবলাকে অত্যধিক ভালবাসতেন। বিবাহের বয়স পার হয়ে যায় ভেবে তার পিতা মাতা তাঁকে বিয়ে করিয়ে দেন। তখন বাসর রাতে তিনি তাঁর বিবিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কে ? তাঁর বিবি উত্তর করেছিলেন আমি তোমার মাশুকা। এ কথা শুনে হযরত আলী আহম্মাদ আলাউদ্দিন ছাবির কালীয়ারী (রহ.) 'আল্লাহ' বলে একটি চিৎকার দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মাশুক শুধু আল্লাহই। চিৎকার দেয়ার সাথে সাথে তাঁর বিবি বাতাসের সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায়। তার কোন কবর হয় নি। তিনি আজও নেই কালও নেই। এত উচ্চ পর্যায়ের গরম হালাতের ওলী ছিলেন হযরত আলী আহম্মাদ আলাউদ্দিন ছাবির কালীয়ারী (রহ.)। তিনি সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্‌র করতেন।

হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.) (১১৭৩ - ১২৩৫ খ্রি.)

তিনি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি ৬১৩ হি./১২১৬ খ্রি. হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.)-এর নিকট বায়'আত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মুর্শিদ কিবলাকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তিনি হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.)-এর সান্নিধ্য পেয়ে 'ইলম মা'রিফাত অর্জন করে ধন্য হন। হুযুর (স.)-এর আদেশে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.) তাঁকে খিলাফত দান করেন। খিলাফত দেয়ার পর হযরত

---

৩২. মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর ধারণকৃত বক্তৃতা থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.) স্বীয় মাথার পাগড়ী তাঁকে পরিয়ে দিলেন এবং উসমান হারূনী (রহ.) থেকে প্রাপ্ত জায়নামায, জামা, জুতা, লাঠি এবং নিজ হাতে লিখিত এক জিলদ আল কুরআন শরীফ হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.) কে দেন। তাই হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মর্যাদা অতি উচ্চ। তিনি অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌র, মুরাক্বাবা, মুশাহাদা করতেন।

হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.) (১১৪১-১২৩০ খ্রি.)

তিনি পিতা এবং মাতা উভয় দিক থেকেই হুযুর (সা.)-এর নাতী ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বংশধর। তাঁর মাতা উম্মুল ওয়ারাহ (রহ.) ছিলেন হযরত বড় পীর আবদুল কাদীর জিলানী (রহ.)-এর চাচাতো বোন। তাই হযরত বড় পীর আবদুল কাদীর জিলানী (রহ.) ছিলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.)-এর মামা। হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.) মাত্র ২২ বছর বয়সে তৎকালীন ইসলাম শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র ইরাকের বাগদাদে গাওসুল আ'যম হযরত বড় পীর সাহেব (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। এ সময় তিনি ৫৭ দিন তাঁর নিকট অবস্থান করেন এবং 'ইলম তাসাউফের ফায়িয লাভ করেন। হযরত বড় পীর সাহেব (রহ.)-এর ইন্‌তিকালের পর তিনি ৫৬৩ হি./১০৮০ খ্রিস্টাব্দে কোহে ফিরজেন শ্যামস কুঞ্জে অবস্থিত মাশহাদের বিখ্যাত পীরে কামিল ও মুকাম্মিল হযরত উসমান হারূনী (রহ.)-এর নিকট ২৩ বছর বয়সে বায়'আত গ্রহণ করেন। হযরত উসমান হারূনী (রহ.) তাঁকে সাথে নিয়ে হজ্জ পালন করে মদীনা শরীফ গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রওযা মুবারকের সামনে হাযির হয়ে বললেন, হে মঈনুদ্দীন হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে সালাম দাও। তখন হযরত মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.) 'আসসালামুয়ালাইকুম ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.)' বলার সাথে সাথে রওযা শরীফ থেকে উত্তর আসল, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া কুতুব উল আকতাব'। সালামের জবাব তাঁর পীর এবং তিনি পরিষ্কারভাবে শুনেছিলেন। পরবর্তীতে হুযুর (স.)-এর নির্দেশে তিনি ৫৭৭ হি./১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। তিনি চিশতিয়া ত্বরীকার ইমাম।

'ইবাদত ও যিক্‌র

তিনি সারা রাতই আল্লাহর 'ইবাদতে কাটাতেন। সারা রাত তিনি বিছানায় পিঠ লাগাতেন না ইশার নামাযের অযু দিয়েই তিনি সারা রাত 'ইবাদত সালাত যিক্‌র করে ফযর নামায আদায় করতেন। এ জন্য তাঁকে সারা রাত জাগরণকারী ও সারা দিন রোযা পালনকারী হিসেবে আখ্যা দেয়া হতো। তিনি সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তিনি প্রায়ই মুরাক্বাবা ও মুশাহাদায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন। এ অবস্থায় পর্থিব জগতের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকতো না, তাঁকে ডাকলেও কোন সাড়া পাওয়া যেত না। তিনি শরী'আত মুতাবিক হামদে বারী তা'য়ালা ও নাতে রাসূল লিখতেন নিজেই সূর করতেন এবং আল্লাহর 'ইশ্‌কে চোখের পানি ঝরিয়ে গাইতেন। উল্লেখ্য, হাসান ইব্‌ন সাবিত (রা.) স্বয়ং হুযুর (স.) কে হামদে বারী তা'য়ালা ও নাতে রাসূল শুনাতেন এবং হযুর (স.) তাঁকে উচু স্থানে বসাতেন যাতে সকল

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবায়ে কিরাম দেখতে পায়। তাই হাদীস শরীফ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা না করে হামদে বারী তা'য়ালা ও না'তে রাসূল সম্পর্কে কোন কটু মন্তব্য করা উচিৎ নয়।

তাঁর কয়েকটি অমূল্য বাণী :

১. সংসারের সকল কাজের সময় আল্লাহর যিক্‌র কর।

২. হক্কানী ওলী ও হক্কানী দরবেশদের কথা বেশি বেশি শ্রবণ কর।

৩. আশিক সব সময় মাশুকের প্রেমে নিমগ্ন থাকে। সে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁরই যিক্‌র করে, বসে থাকলে তারই প্রতীক্ষায় থাকে, বেঁচে থাকলে তার এশকের জন্যই বেঁচে থাকে এবং মারা গেলে তাঁর এশকেই মারা যায়।

৪. তিনটি গুণ মানব মনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ- শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, নিজের অভাব গোপন রাখা, নিজের দুঃখ অন্যের নিকট প্রকাশ না করা।

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহকে তালাশ করে, সে নিশ্চয় তাঁকে লাভ করে, আর সে ব্যক্তি তাঁকে পেয়ে নীরব থাকে যেহেতু তার চাওয়ার মত আর কিছু নেই।

হযরত উসমান হারূনী (রহ.) (মৃ. ৬ শাওয়াল, ৬১৭ হি./ ১২১৯ খ্রি.):

তিনি হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রহ.) (৯ জমা.সনি ৫৩৬ - ৬ রজব, ৬২৭ হি./১১৪১-১২৩০ খ্রি.)-এর মুর্শিদ কিবলা ছিলেন। তিনি হযরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ.)-এর নিকট বায়'আত হন। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁর মুর্শিদ কিবলার সান্নিধ্যে থেকে 'ইলম মা'রিফাত হাসিল করে খিলাফত প্রাপ্ত হন। হযরত উসমান হারূনী (রহ.) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে আল্লাহর ওলীদের সাথে সাক্ষাত লাভ করতেন। তিনি কাশফ কারামত বিশিষ্ট অতি উচ্চ মর্যাদার আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তিনি মুরাক্বারা ও মুশাহাদায় ডুবে থাকতেন।

হযরত শাহ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম বলখী (রহ.) (মৃ. ২৮ জমা. আও. ২৬২ হি./৮৭৬ খ্রি.)

তিনি বর্তমান আফগানিস্তানের বলখের বাদশা ছিলেন। তিনি হযরত ফুযাইল 'ইব্‌ন আয়ায (রহ.)-এর খলিফা ছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম (রহ.) যখন বনে জঙ্গলে ঘুরছিলেন তখন একদিন একজন বুযুর্গ লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে আল্লাহ্‌ পাকের 'ইস্‌মে আ'যম' (শ্রেষ্ঠতম নামের যিক্‌র) শিখিয়ে দেন। তিনি ঐ নামে আল্লাহ্‌ তা'আলার যিক্‌র করতে আরম্ভ করেন। অকস্মাৎ তিনি একদিন হযরত খিযির (আ.) কে দেখতে পান। তিনি বললেন, হে ইব্‌রাহীম! যিনি আপনাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার ইস্‌মে আ'যম শিখিছেন, তিনি আমার ভাই ইল্‌য়াস," অতঃপর তাঁর ও খিযির (আ.)-এর মধ্যে বহু বিষয়ে আলাপ আলোচনা হল। তিনি খিযির (আ.)-এর মুরীদ হলেন। এর বদৌলতেই হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তিনি অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌র করার ফলেই 'ইসম আ'যম লাভ করেছিলেন। তাই বেশি বেশি যিক্‌র করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক মহাসাধনার সামান্য প্রকাশ

হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম (রহ.) একটি পাহাড়ের টিলায় বসে একজন বুযুর্গের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। উক্ত বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ্‌ওয়ালা কামিল লোকের চিহ্ন কি?" হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম (রহ.) বললেন, "কামিল লোক যদি পাহাড়কে চলতে বলে, তখনই উহা চলতে আরম্ভ করবে।" তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই পাহাড়টি চলতে আরম্ভ করল। হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম (রহ.) বললেন, "হে পাহাড় আমি তোমাকে চলার জন্য আদেশ করিনি, আমি শুধু তোমার দ্বারা দৃষ্টান্ত দিয়েছি।" তৎক্ষণাৎ পাহাড় থেমে গেল।

প্রখ্যাত তাবি-তাবি'ঈ হযরত ফুযাইল 'ইব্‌ন আয়ায (রহ.) (মৃ. ১৮৭ হি./ ৮০৩ খ্রি.)

তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.) (৮০-১৫০হি./৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.)-এর নিকট দীর্ঘকাল 'ইল্‌ম হাসিল করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সর্ম্পকে তিনি বলেন, " ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন পরহিযগারীতে ছিলেন অনন্য, তিনি একজন দানবীর ধনী ছিলেন কাউকে বঞ্চিত করতেন না, দিন রাত ইল্‌ম চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন, কথা কম বলতেন, চুপচাপ বেশী থাকতেন, হালাল-হারামের মাসাআলা 'আমলে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করতেন এবং রাজা বাদ্‌শাদের কাছ থেকে দুরত্ব বজায় রাখতেন।" হযরত ফুযাইল 'ইব্‌ন আয়ায (রহ.) হযরত হাসান ইয়াসার আল বসরী (রহ.) (২১-১১৯হি./৬৪১-৭৩৭ খ্রি.)-এর খলিফা হযরত খাজা অবদুল ওয়াহেদ (রহ.) (মৃ. ২৮ সফর, ১২৬ হি./৭৪৪ খ্রি.)-এর খলিফা ছিলেন। হযরত ফুযাইল 'ইব্‌ন আয়ায (রহ.) থেকে হাম্বালী মাযহাবের ইমাম ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল (রহ.) (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.) 'ইলম হাসিল করেছেন।

যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র করা হয় সে ঘর আসমান ওয়ালাদের নিকট এভাবে চম্‌কাতে থাকে, যেভাবে দুনিয়া বাসীদের নিকট আসমানের তারকাসমূহ চম্‌কিয়ে থাকে। একটি সহীহ হাদীসে এসেছে, যিক্‌রের মজলিসে সাকীনা অবতীর্ণ হয়। ফিরিশতাগণ তাদেরকে ঘিরে তাদের আলোচনা করেন। আবূ রজীন (রা.) সাহাবীকে একদিন হুযুর (স.) বলেন, দ্বীনকে শক্তিশালী করে এমন জিনিস তোমাকে শিক্ষা দিতেছি। তা এই যে, যিক্‌রকারীদের মজলিসকে তুমি মজবুত করে ধর এবং যথাসম্ভব নির্জনে বসে আল্লাহর যিক্‌র করতে থাক। যিক্‌রের মজ্‌লিস যে নূরের দ্বারা ঝল্‌মল্‌ করতে থাকে বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত ফুযাইল 'ইব্‌ন আয়ায (রহ.) প্রমুখ বুজুর্গ তা স্বচক্ষে দর্শন করতেন।

হযরত ফুযাইল 'ইব্‌ন আয়ায (রহ.) বলেন, "কোন 'আমল এই জন্য না করা যে, লোকে দেখে কি বলবে ? এটিও শির্‌ক-র মধ্যে শামিল। একটি হাদীস শরীফে এসেছে, কোন কোন লোক যিক্‌রের কুঞ্জি স্বরূপ। যেহেতু তাদের চেহারা দেখেই আল্লাহর নাম মনে এসে যায়। অন্য একটি হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্‌র ওলী ঐ ব্যক্তি যাঁকে দেখেই আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়ে। অন্য হাদীস শরীফে আছে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঐ ব্যক্তি যাকে দেখে আল্লাহর যিক্‌র তাজা হয়ে যায় এবং তাঁর কথার দ্বারা 'ইল্‌মের মধ্যে তরাক্কী হয়, তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

'আমলের দ্বারা আখিরাতের প্রতি আসক্তি জন্মে। এই কথা তখনই হাসিল হয় যখন কোন ব্যক্তি বেশি বেশি করে যিক্‌রের অভ্যস্ত হয়। আর যার নিজেরই অভ্যাস নেই তাকে দেখে কি করে আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়িবে ? " তাই বেশি বেশি যিক্‌র করতে হবে।

হযরত আবদুল ওয়াহিদ (রহ.) (১২৬ হি./৭৪৪ খ্রি.)

তিনি হযরত হাসান ইয়াসার আল বসরী (রহ.) (২১-১১৯হি./৬৪১-৭৩৭ খ্রি.)-এর সুযোগ্য খলিফা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুযুর্গ ও উচ্চস্তরের পীর ছিলেন। হযরত আবদুল ওয়াহিদ (রহ.) হযরত ফুযাইল 'ইব্‌ন আয়ায (রহ.)-এর পীর ছিলেন। তিনি অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌র করতেন।

প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত হাসান ইয়াসার আল বসরী (রহ.) (২১-১১৯ হি. / ৬৪১-৭৩৭ খ্রি.):

তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু ইরাকের বসরায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করায় তাঁকে বসরী বলা হয়। হযরত হাসান বসরী (রহ.) ১৩০ জন ছাহাবার সোহবত লাভ করেন। হযরত 'আলী (রা.) (যিলহজ্জ ১৩, ২০হি.- রমযান ২১, ৪০হি./ মার্চ ১৭, ৫৯৯- জানুয়ারী ২৮, ৬৬১ খ্রি.) তাঁকে খুব ভালবাসতেন। হযরত হাসান বসরী (রহ.) তাঁর পবিত্র হস্তে বায়'আত (মুরিদ) গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে 'ইল্‌ম হাসিল করেন। তিনি ইমাম হাসান ইব্‌ন 'আলী (রা.) (মার্চ ১, ৬২৫ খ্রি.- মার্চ ২৭, ৬৭০ খ্রি.) হতেও হাদীস, তাফসীর শিক্ষা করেন। তিনি অনেক উচ্চ পর্যায়ের 'আলিম ছিলেন এ প্রসঙ্গে ইমাম যূহরী বলতেন, "বর্তমান পৃথিবীতে মাত্র চার জন প্রসিদ্ধ 'আলিম রয়েছেন, মদীনায় ইব্‌ন মাজিদ বসরায় হাসান (২১-১১৯হি./৬৪২-৭৩৭ খ্রি.), সিরিয়ায় মাকহুল এবং কূফায় আশ শা'বী (মৃ.১০৪হি./৭২২খ্রি.)।"

আধ্যাত্মিক সাধনায় জ্বিনদের উপস্থিতি

আবদুল্লাহ্ বলেন, "একদিন হযরত হাসান বসরীর (রহ.) সাথে এক সঙ্গে ফযরের নামায জামা'আতে পড়ার জন্য মসজিদে যেয়ে দেখলাম, মসজিদের দরজা বন্ধ। বাহির হতে শুনতে পেলাম, তিনি মসজিদের ভিতরে দু'আ করছেন এবং বহু লোক 'আমীন আমীন' বলছে। আমি মনে করলাম, হয়তো তিনি তাঁর শিষ্য বা মুরিদ সহ দু'আতে মগ্ন রয়েছেন। কাজেই আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, ফর্সা হয়ে গেলে তিনি নিজেই মসজিদের দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করে তাঁকে একাকী দেখে বিস্মিত হলাম। নামায আদায় করার পর আমি এই রহস্য জানার জন্য তাঁর খিদমতে আবেদন করলাম। তিনি বললেন, "সাবধান! কারও নিকট এ ঘটনা প্রকাশ করবে না। প্রত্যেক জুমু'আর রাত্রে জ্বিন্ সম্প্রদায় এবং পরীরা আমার এখানে আসে। আমি তাদেরকে শরী'আতের আহ্‌কাম শিক্ষা দিয়ে মুনাজাতে মশগুল হই, তাঁরা 'আমীন আমীন' বলতে থাকে।" হযরত হাসান বসরী (রহ.) অত্যধিক পরিমাইে যিক্‌র করতেন। তাই বৃহস্পতিবারের মাসিক মাহফিল অত্যন্ত বরকতময়।

Dhaka University Institutional Repository

'ইল্‌ম মা'রিফাত সম্পর্কে তাঁর কিছু অমূল্য বাণী-

১. যখন দেখবে তোমার মধ্যে কারও সঙ্গে শত্রুতাভাব এবং ঝগড়া কলহের স্পৃহা নেই, তখন বুঝবে যে, তোমার 'মা'রিফাত' হাসিল হয়েছে।

২. তোমার চিন্তাশক্তি তোমার জন্য একটি দর্পণস্বরূপ, তুমি এর সাহায্যে তোমার যাবতীয় নেক ও বদ কাজগুলি দেখতে পাবে।

৩. যার কথা ও যুক্তি লক্ষ্যহীন সে ব্যক্তি বিপদ সদৃশ, তাঁর দ্বারা যে কোন মুহূর্তে তুমি বিপদগ্রস্ত হতে পার।

৪. মুহূর্তকালের জন্য দুনিয়ার প্রতি বিরাগ সহস্র বৎসরের রোযা-নামাযের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ পাকের মহিমা সম্বন্ধে গবেষণা ও চিন্তা করা এবং পরহিযগারী অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের অপছন্দনীয় কার্য হতে বিরত থাকা সর্বোত্তম কাজ।

৫. দুনিয়াদার লোক তিনটি আক্ষেপ নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে- (ক) ধন সঞ্চয়ে তৃপ্তি না হওয়ার আক্ষেপ, (খ) আশা অপূর্ণ থাকার আক্ষেপ এবং (গ) পরকালের সম্বল সংগৃহীত না হওয়ার অনুতাপ।

৬. আমার মতে বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে তার ভগ্নস্তুপের উপর আখিরাতের অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং দুনিয়ার মোহে মত্ত হয়ে আখিরাত নষ্ট না করে; আর আখিরাত নষ্ট করে দুনিয়ার অট্টালিকা নির্মাণে মত্ত না হয়।

৭. খোদাকে যে ব্যক্তি চিনতে পেরেছে, সে তাঁর সঙ্গে মহব্বত স্থাপন করেছে আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনেছে, সে দুনিয়ার মোহে মত্ত হয়েছে, এবং খোদার সাথে শত্রুতা গড়ে তুলেছে।

৮. যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দুষ্ট ও মন্দ লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করে, তবে বুঝতে হইবে সে নিজেও দুষ্ট এবং মন্দ।

৯. ধর্মীয় ভ্রাতা আমার নিকট নিজের পরিজনবর্গ এবং সন্তান-সন্ততি হতে অধিক প্রিয়। কেননা, ধর্ম-ভ্রাতাগণ ধর্মকর্মে আমার সহায়ক ও বন্ধু, পক্ষান্তরে পরিবার-পরিজন ও সন্তানগণ আমার জন্য কেবল পার্থিব কাজ-কর্মেরই সহায়ক এবং ধর্ম-কর্মের প্রতিবন্ধক। পিতা-মাতাকে লোকে যে জীবিকা প্রদান করে তার যথাবিহিত হিসাব হবে; কিন্তু ধর্মীয় বন্ধু বান্ধব ও মুসলমান ভাইদিগকে যে খাদ্য প্রদান করা হয় তার হিসাব দিতে হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামত

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামত

'কারামত' শব্দের অর্থে ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, সম্মানিত হওয়া, আল্লাহর দেয়া দান, সম্পূর্ণ মুক্ত, অবারিত অনুগ্রহ ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায়:

ظهور امر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوة النبوة

অর্থ: নবী হওয়ার দাবীদার নয় এমন কোন গুণী ব্যক্তির থেকে আলৌকিক কোন কিছু সঙঘটিত হওয়াকে কারামত বলা হয়।[১]

এটি আল্লাহর ওলীদের অলৌকিক ঘটনাবলীকে নির্দেশ করে। এই সমস্ত ঘটনা সাধারণত বস্তু জগতের সংঘটিত অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত, নচেৎ ভবিষ্যতের পূর্ব সংকেত, নয়তো আধ্যাত্মিক বিষয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ। বস্তুত ওলীগণ হতে কারামত প্রকাশিত হওয়া সত্য। কুরআন মাজীদে বহু কারামতের উল্লেখ রয়েছে। যেমন- হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট আলৌকিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছা এবং হযরত সুলায়মান (আ.) এর উযীর আসাফ ইবন বারখিয়্যা কর্তৃক মুহূর্তের মধ্যে ইয়ামান হতে রাণী বিলকিস এর সিংহাসন নিয়ে আসার ঘটনা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওলী দরবেশগণের জীবনে অসংখ্য ঘটনায় কারামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।[২]

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) -এর জীবনেও বহু কারামত সংঘটিত হয়েছে। যার বিরাট অংশই আজও অজানা। এখানে ততটুকু তাদের নিকট হতে বর্ণনা করার আশা রাখি, যারা সর্বদা মাওলানার সাথে থাকতেন এবং বিশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারে পরীক্ষিত।

শূন্যে নামায আদায়

স্থান: সাটুরিয়া, নন্দেশরী। মাওলানা সাহেব একদিন আসরের নামায আদায় করতে বিলম্ব হয়েছিল অর্থাৎ নামাযের সময় প্রায় শেষের দিকে। তখন সাথে কয়েকজন মুরিদ ছিল তাদেরকে তিনি বললেন "মসজিদের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দাও আমি নামায

---

১. ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী, 'শরহে আকাইদিন নাসাফিয়্যা, দিল্লী: তা.বি, পৃ. ১৩২

২. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আদায় করি"। মসজিদের ভিতরে তিনি একাই নামায আদায় করছিলেন। দরজা জানালা বন্ধ করে মুরিদরা বাইরে বসে ছিল, একটু পরে তাঁর খাদিম আবদুল কাদির মোল্লা ভাবলেন কোন জানালা খোলা আছে নাকি দেখে আসি, তিনি মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখেন তাঁর জায়নামায মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে আছে এবং তিনি শূন্যের উপরে নামায আদায় করছেন। চোখে দেখা সাক্ষী মোল্লা ভাইকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

পানির উপর নামায আদায় ও আসমানী নূর

স্থান গোলাকান্দা। মাওলানা সাহেব রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সাথে মাওলানা মজিবুর রহমান লাহোরী ও শওকত নামে দুই জন মুরিদ ছিলেন। তারাও ঘুমালেন। গভীর রাতে লাহোরী উঠে দেখলেন হুযুর বিছানায় নাই তখন তিনি ভাবলেন হুযুর কি এস্তেঞ্জায় গেলেন, ভাল করে খুজে দেখলেন নেই। মসজিদেও নেই। এদিকে ওদিক খুজতে গিয়ে মাওলানা মুজিবুর রহমান লাহোরী ও শওকত দেখলেন পশ্চিম পাশের পুকুরের মাঝখানে আকাশের উপর থেকে একটি উজ্জ্বল আলো এসে পরছে সেই আলোর মাঝখানে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর জায়নামায সহ তিনি পানির উপর দিয়ে ভেসে পুকুরের কিনারের দিকে আসতে লাগলেন উপর থেকে আলোটাও আসতে ছিল। তখন মুরিদ দুইজন ভাবলেন তিনি যদি তাদেরকে দেখে রাগ করেন , এই ভেবে দুইজন এসে ঘরে শুয়ে পরলেন। কিন্তু আল্লাহ্র ওলী বুঝতে পেরেছিলেন এরা দুই জন দেখে ফেলেছে, ঘরে এসে দুইজনকে বললেন "যা দেখছো আমি জীবিত থাকা অবস্থায় কখনও কারো নিকট বলবে না"। চোখে দেখা সাক্ষী মাওলানা মজিবুর রহমান লাহোরীকে, বর্তমান বয়স প্রায় ৭০, আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। শওকতক ভাই কিছুদিন পূর্বে ইন্তিকাল করেন।

মুরিদকে শুন্যে ভাসিয়ে নিয়ে আসা

৭০ দশকের শেষের দিক। মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের তখন প্রাথমিক অবস্থা। হেদায়েতের অমীয় বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আমাদের মুর্শেদ কেবলা। একবার তিনি মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানার ঘড়িয়ালা নামক গ্রামে মাহফিল করছিলেন। সে অঞ্চলে তথা ঘড়িয়ালা, আগ কলিয়া, ঝগতলা, ছোনকা আকাসী গ্রামে ছিল মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। এ সময় বেশ কিছু মহিলারাও মানিকগঞ্জ দরবারে মুরিদ হয়ে, পূর্ণ শরী'আত অনুযায়ী চলতেন। মাহফিল ছিল ঘড়িয়ালার ড. আব্দুল লতিফ সাহেবের বাসায়। তিনি অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার বাড়ীর বিশাল উঠানে ছিল মাহফিলের প্যান্ডেল। আর ঘরের মধ্যে ছিল মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। ঝগতলা গ্রামে আনোয়ারা নামে মুর্শিদ কেবলার একজন ভক্ত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় মুর্শেদ কেবলা তার নাম দিয়েছিলেন হরি পাগল্লী। তিনি খুব পর্দানশীল মহিলা ছিলেন। তার কোন ভাসুররা পর্যন্ত তাকে কোন দিন পর্দা ছাড়া অবস্থায় দেখেনি। তিনি কখনও

Dhaka University Institutional Repository

একা একা বাড়ী হতে বের হননি। তখন মহিলারা মাহফিল শুনার জন্য দলবেধে চলে এল কিন্তু বিশেষ কারণে আনোয়ারা (হরি পাগল্লী) যেতে পারলেন না। মাহফিলের সময় যখন হল তখন তিনি মাহফিলে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতে লাগলেন। কিন্তু বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ ছিল না সবাই মাহফিলে যোগ দিয়েছেন। সারা রাত তিনি কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিয়ে ভোরের দিকে একাই রওয়ানা হলেন। কিন্তু তিনি রাস্তা চিনলেন না। ঝগতলা থেকে ঘড়িয়ালা এক থেকে দেড় মাইলের দূরত্ব। তখন ছিল আখের মৌসুম। বড় বড় আখ গাছের মাঝে এসে তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। এবার তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আর অনবরত মুর্শিদ কেবলার উছিলা দিয়ে বলছেন : "আল্লাহ আমার 'আযহারের' উছিলায় আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাও। আল্লাহ আমার সোনার হরিণ চাই। সোনার হরিণ চাই।" কিছুক্ষণ পরে তিনি বুঝতে পারলেন তিনি মাটি হতে শূন্যে ভাসছেন। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখেন আখ গাছের উপর দিয়ে তিনি শো শো করে ছুটে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর এক বড় টিনের ঘরের পিছনে চলে আসলেন এবং দেখলেন দূরে দাঁড়িয়ে তাঁরই মুর্শেদ কেবলা মিটি মিটি হাসছেন। এ সময় মুর্শেদ কেবলা আনোয়ারার ভাসুরকে বললেন ঘরের পিছনে এক পাগল্লী দাঁড়িয়ে আছে ওরে নিয়া আয়। হরী পাগল্লী নাম্নী আনোয়ারা বেগম দুই বছর পূর্বে ইনতিকাল করেন।

আল্লাহর কুতুবের আঙ্গুলের শক্তি

দক্ষিণ মাদারটেকের মোঃ নূরুল ইসলাম মিয়া বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি কুল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। লাখো দরুদ ও সালাম সেই মহামানব রাসূলে পাক (স.) জন্য যিনি না হলে এই আকাশ-বাতাস, জীন-ইনসান কিছুই হতো না। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে একজন মহান মুর্শিদে মুকাম্মিলের হাত ধরার তৌফিক এনায়েত করেছেন। আমার মুর্শিদ কিবলার হাজারো কারামতের মধ্যে আমার নিজ চোখে দেখা একটি ছোট্ট কারামতের কথা এখানে উল্লেখ করলাম। এখন যেখানে উত্তর বাড্ডা, খান্‌কায়ে ছিদ্দিকীয়া, মহানগর কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে ঐ জায়গার ঘটনা। তখন জায়গাটিতে নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমরা কয়েকজন মুরিদান ভক্তরা কেউ কেউ মাটি কাটছি আর কয়েকজনে তা এনে ভিটির উপর ফেলছি। মরহুম মুর্শিদ কিবলা তখন খানকার পশ্চিম পার্শে জানে আলম ভাই তার বাড়ীতে থেকে কাজ তদারকী করতেন। তখন মূল বিল্ডিং এর কাজ পিলার পর্যন্ত হয়ে চারদিকে বিম ঢালাই হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকের ভিমের ৬ সুতা রড, ৪ টি রড প্রায় দুই আড়াই হাত বাহির হয়ে আছে। এখন যেখানে আম বাগানটি সেটা ছিল এমনিতে নিচু তার উপর মাটি কেটে আরো নিচু হয়ে গেছে। তখন বেলা আনুমানিক ১১ হবে। মাওলানা সাহেব কাজ দেখতে জানে আলম ভাইয়ের বাড়ী থেকে বের হয়ে বিল্ডিং পর্যন্ত আসলেন। পিছনে পিছনে হাজী দীন ইসলাম ভাই, দীদার ভাই, আমি এবং আরো দুই একজন ঠিক মনে নাই। দাদা হুযুর কিবলা বিল্ডিং এর উত্তর পাশ হতে দক্ষিণ দিকে যাবেন ঠিক এই সময় বাড়তি রডে লেগে একটু

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধাগ্রস্ত হলেন। তিনি তখন থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এক সেকেন্ড কি জেনো ভাবলেন আর এদিক ওদিক তাকালেন। ঠিক মুহূর্তের মধ্যে ডান হাত দিয়ে দুটি রড আস্তে বাম দিকের পিলারের সংঙ্গে মিলিয়ে দিলেন এবং বাম হাত দিয়ে দুটি রড ডান দিকের পিলারের সংঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। এতে যেন তার কোন কষ্টই হল না। আমি তখন মাটির টুকরী নিয়া আল্লাহ কুতুবের কাছাকাছি এসে গেছি। এই দৃশ্য দেখে আমিতো হতবিহবল হয়ে গেলাম। পরে তিনি যখন বাসায় চলে গেলেন, আমরা দুই তিন জনে একটি রড ধরে পিলারের সংঙ্গে মিলানতো দূরের কথা কাছাকাছিও নিতে পারলাম না। আজও যখনই বাড্ডা মাসিক মাহফিলে যাই আমার ঐ দৃশ্যটির কথা মনে পড়তেই চোখে আপনা আপনি পানি এসে যায়। আর মনে মনে কল্পনা করি হে পরোয়ারদিগার, যেদিন আমার পরপারের ডাক এসে যাবে সেদিন আমার দয়াল মুর্শিদের হাজারো কারামতির মধ্যে আমার দেখা যে কোন একটি তুমি আমার সামনে হাজির করে দিও আমি যেন তা দেখতে দেখতে আমার দয়াল মুর্শিদের কাছে চলে যেতে পারি"।

আম গাছ কথা শুনলো

মাওলানা সাহেব (রহ.) একবার ট্যাংরার মোঃ মহিউদ্দিন মাষ্টারের বাড়ীতে সফরে যান। বাড়ীর ভিতর বড় একটি আম গাছের নীচে তাঁর গাড়ি রাখা হয়। তখন হুযুর বললেন, গাড়ী দূরে সরিয়ে রাখ, আম গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়তে পারে। মোঃ মহিউদ্দিন মাষ্টার বলল, আব্বা এটি অনেক বড় ও পুরাতন গাছ ডাল ভাঙ্গবে না। তখন তিনি বললেন, বুদ্ধি খাটাইও না। তারপর গাড়ী গাছ থেকে দূরে গ্যারেজ করে সেখানে রাখা হলো। কোন ঝড় নেই বৃষ্টি নেই রাত ৩টার সময় ঠিক ঠিক আম গাছের অনেক বড় একটি ডাল ভেঙ্গে পরলো।

মৌমাছি কথা শুনলো

ঐ বাড়ীতেই মাওলানা সাহেব (রহ.) মোঃ মহিউদ্দিন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখানে মধু হয়না? মোঃ মহিউদ্দিন মাষ্টার বলেছিল, জ্বী না আব্বা এখানে মধূর ঝাক বসে না। তখন তিনি বললেন, বহে না ন্যা! এর ঠিক তিন দিন পর সেখানে ৬ হাত লম্বা দুটি মধুর চাক বসেছিল এবং সেখানে এক মণ সাড়ে বার কেজি মধূ হয়েছিল।

বড়ই গাছ কথা শুনলো

ঐ বাড়ীতেই একটি বড়ই গাছ ছিল। মাওলানা সাহেব (রহ.) বলেছিলেন, এটি কি গাছ, মোঃ মহিউদ্দিন মাষ্টার বলেছিল, আব্বা বড়ই গাছ। তিনি বললেন, বড়ই ধরে না। মোঃ মহিউদ্দিন মাষ্টার বলল, আব্বা সিজন আসলে ধরে। তিনি বললেন, ক্যা সারা বছর ধরতে পারে না! ঠিক ঠিক এরপর থেকে ঐ বড়ই গাছে বার মাসই বড়ই ধরা শুরু করেছিল। এ ঘটনার স্বাক্ষী শ্রীপুরের মোঃ মহিউদ্দিন মাষ্টারকে আল্লাহপাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সাহেবের প্রধান খলিফা ও সাহিবজাদা ড. মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী মোঃ মহিউদ্দিন মাষ্টারের বাড়ীতে গেলে তিনি তাঁকে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলেন এবং গাছগুলি দেখান। এ সময় ক্বাজী আবদুর রহমান ও রাজু উপস্থিত ছিল।

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর 'ইলমে কাশ্‌ফ

ঘটনা : ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিচারপতি মোঃ আব্দুস সালামকে হাফেজ্জী হুজুরের খলিফা অধ্যাপক জনাব শামসুল আলম, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) -এর লেখা 'কাসদুল সাবিল' নামক 'ইলমে মা'রিফাতের একটি কিতাব পড়তে দিয়েছিলেন। বিচারপতি সাহেবের ভাষায়- 'কাসদুস সাবিল' কিতাবখানা পড়া অবস্থায় আমি একদিন মানিকগঞ্জের হুজুর কেবলার সহিত জামাতে আসর নামায পড়ার জন্য মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ যাই। আসরের নামাজ পড়ার পর আমি মোর্শেদ কেবলাকে সালাম প্রদান করি। সালামের জবাব দেয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, 'আসর নামাজের পূর্বে আমার এখানে আসার সময় আপনি 'কাসদুস সাবিল' কিতাবখানা পড়ে এসেছেন।' আমি বললাম, 'জ্বী হুজুর' এবং তাঁর ইলমে কাশফ সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলাম।

ঘটনা : ২

জনাব জানে আলম ভাই মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে কাজ করতেন। তখন দরবারের উন্নয়ন মূলক কাজ চলছিল। যথারীতি জানে আলম ভাইও অন্য সব ভাইয়ের সাথে কাজ করছিলেন। কাজের ব্যস্ততায় দুপুর গড়িয়ে খাবারের সময় প্রায় শেষ। দুপুরে কি খাবেন তা নিয়ে মনে মনে চিন্তা করছিরেন। এ সময় মুর্শিদ কিবলা বাসা থেকে বের হয়ে জানে আলম ভাইকে ডাক দিলেন এবং বললেন, 'শওকতের বাড়ী যা, ঐহানে কৈ মাছ ভাজছে, জিয়াল মাছ রানছে, দুপুরে খাইয়া আয়'। জানে আলম ভাই শওকতের বাড়ী গিয়ে দেখেন যা যা মুর্শিদ কিবলা বলছেন যেভাবে বলছেন তাই রান্না করা হয়েছে। খেতে বসে জানে আলম ভাই দুচোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিলেন। আজ জানে আলম ভাই আর বেঁচে নেই।

ঘটনা : ৩

আব্দুল কাইয়ূম নামে মানিকগঞ্জে একজন ট্রাক ড্রাইভার ছিল। তিনি মানিকগঞ্জ হতে মাল নিয়ে চট্টগ্রাম যাবেন। মানিকগঞ্জ দরবারের কাজে নিয়োজিত আজমত ভাই আব্দুল কাইয়ূমের সাথে কথা বললেন ফেরার পথে ঢাকা হতে রড, সিমেন্ট আনতে হবে। এটা আশির দশকের ঘটনা। তখন মানিকগঞ্জে ভাল রড সিমেন্টের দোকান ছিল না। কথামত

Dhaka University Institutional Repository

আজমত ভাই রড সিমেন্ট নিয়ে আব্দুল কাইয়ূম ভাইকে নিযে মানিকগঞ্জের দিকে রওয়ানা হলেন। দীর্ঘ যাত্রাপথে আব্দুল কাইয়ূম ভাই হেমায়েতপুর আসার পর গাড়ী চলা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেন। নবী-নগর (হেমায়েতপুর থেকে নবী-নগর প্রায় তিন মাইল জায়গা) আসার পর আজমত ভাই লক্ষ্য করলেন গাড়ী রাস্তা হতে অন্য দিকে যাচ্ছে, সাথে সাথে আব্দুল কাইয়ূম ভাইকে ডাক দিলে তিনি জাগ্রত হয়ে গাড়ী নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং তিনি বলেন, ভাই আমি তো ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। তারা আশ্চর্য হন। মানিকগঞ্জ পৌঁছার পর মুর্শিদ কিবলা বাসা হতে বের হয়ে আব্দুল কাইয়ূম ভাইকে বকাঝকা করতে লাগলেন এবং বললেন, 'ঠিক মত ঘুম পইরা নিবা না- এ তিন মাইল রাস্তা গাড়ী কেডা চালাইলো'।

মহান আল্লাহর অসীম দয়ায় মাওলানা (রহ.) এর অসিলায় বিপদ হতে মুক্তিলাভ

ঘটনা : ১

মানিকগঞ্জ জেলার ধামরাই থানার আসছে মোড় গ্রামের শওকত ভাই অনেক আগের মুরিদ ছিল। ঐ এলাকার চেয়ারম্যান সহেবও মাওলানার মুরিদ ছিল। পুরাতন বাড়ীতে থাকার সময় ঘটনা। তখন শওকত ভাই দরবারে থকতেন। একদিন তিনি মাওলানার সামনে বসা ছিলেন সাথে ছিলেন শুধু মাওলানার একান্ত খাদিম আব্দুল কাদের মোল্লা ভাই। তখন হঠাৎ মাওলানা শওকতকে বললেন, 'একটা লাঠি সুন্দর কইরা চাইছা (পরিষ্কার করে) কাপড় দিয়া পেচাও। দুই মাথা ভাল কইরা বান্‌ধো, যেন কান্ধে ঝুলানো যায়।' শওকত ভাই তাই করলেন। মাওলানা তখন বললেন, 'এবার কান্ধে ঝুলাও। চুপ কইরা চোখ বন্ধ কইরা বস'। শকওকত ভাই তাই করলেন। মাওলানা তার মাথায় তিনটা টোকা দিলেন। মাওলানা চোখ খুলতে বললেন। শওকত ভাই চোখ খুলে দেখেন, তিনি (শওকত) নদীর চড়ে বসে আছেন। তারই সামনে ৫/৬ জন পরিচিত লোক তার পীরভাই চেয়ারম্যান সাহেবের হাত পা বাধা অবস্থায় ফেলে রাখছে। চেয়ারম্যান সাহেব দুচোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন, তিনি মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে গেছেন। আর একসাথে আল্লাহকে স্মরণ করছেন। আর ঐ ৫/৬ জন লোক তাকে জবাই করার জন্যও তৈরী হয়েছে। এমন সময় শওকত ভাই দাঁড়িয়ে ঐ ৫/৬ জন লোককে উদ্দেশ্য করে জোরে ধমক দিলে তারা সবাই ভয়ে পালিয়ে যায়। তখন মাওলানা শওকতকে প্রশ্ন করলেন কি দেখলা? শওকত যা যা দেখলেন তাই বললেন। তখন মাওলানা বললেন, ঐ ৫/৬ জন লোকরে তুমি চিন না? শওকত ভাই বললেন, 'জ্বি; আমি তাদের চিনি'। মাওলানা বললেন, ওরা কি দেইখা পালাইল জিজ্ঞাসা কইরো। কয়েকদিন পর বাজারে তাদের সাথে দেখা হলে শওকত ভাই তাদের পালানোর কথা জিজ্ঞাস করলে তারা এ রকম ঘটনাই অস্বীকার করল। শওকত ভাই তখন সব বর্ণনা দিলে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্তের কথা জানালো এবং বলল- 'আমরা দেখেছিলাম এক পুলিশ সার্জন (অফিসার) কান্ধে বড় বন্দুক লইয়া আমাগো বিকট ধম দিল। ভয়ে আমরা সবাই পালাইছি। অর্থাৎ তারা শওকত ভাইকে

Dhaka University Institutional Repository

চিনেনি। পরে চেয়ারম্যান সাহেবও তাদের মাফ করে দেন। নিজ কানে শুনা তথায় উপস্থিত আব্দুর কাদের মোল্লা ভাই আজও জীবিত আছেন।

ঘটনা : ২

মানিকগঞ্জের দক্ষিণে কালীগঙ্গা নদী পার হয়ে বরুন্ডী বাজার। বাজার হতে চইল্লা গ্রাম প্রায় ২ কিলোমিটার। এ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন হোসেন আলী মাদবর। তিনি একবার মাওলানা সাহেবকে মাহফিলের জন্য দাওয়াত দিলেন। মাহফিলের নির্ধারিত দিন সকালে গিয়ে মাওলানা (রহ.) হাজির হলেন। কিন্তু বাড়ীর সবাই ছিলেন চিন্তিত। কারণ হল- মাহফিল উপলক্ষে ও হুজুরের আগমন উপলক্ষে মাদবর সাহেব নৌকা দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন বাজারে। নৌকা ফেরার পথে বাজারসহ তৎকালীন খরস্রোতা নদী কালীগঙ্গায় ডুবে যায়। নদীতে নৌকা ডুবে গেছে, হুজুর বাড়ীতে এসেছেন, তখন কি দিয়ে কি করবেন মাদবর ভেবে পাচ্ছেন না। এ সময় মাওলানা সাহেব হোসেন আলী মাদবরকে ডাকলেন। তাঁর ভাষায়- 'মাদবর নৌকা কই?' মাদবর সাব নৌকা ডুবার কথা গোপন করে বললেন: আব্বা বাজারে দেছে, আইসা পড়বে। তিনি পুনরায় বললেন, দেহ গিয়া নৌকা আসছে কিনা? মাদবর তো জানেন নৌকা ডুবে গেছে মাঝিরা চলে এসেছে, নৌকা আসবে কিভাবে? তিনি আবার বললেন, দেহ গিয়া নৌকা ঘাটে আইছে কিনা? মাদবর হুজুরের কথা মানতে গিয়ে নদী ঘাটে গিয়ে দেখে বাজারসহ নৌকা ঘাটে বান্ধা আছে। (সুবহানাল্লাহ)। এ ঘটনায় ঐ নৌকার মাঝিরা এবং আশপাশের সবাই মুরিদ হয়ে যান এবং খুব অল্প দিনেই চইল্লা গ্রামে ইসলামের আলো জ্বলে উঠে।

ঘটনা : ৩

আশির দশকের শুরুর কথা। তখন মাওলানা সাহেব তিন চাকার টেম্পুতে করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাহফিলে যেতেন। একবার মাহফিলের স্থান ঠিক হলো- যশোর। মাহফিল শেষ করে ফেরার পথে খেজুর নামক স্থানে এসে টেম্পুর চাকা খুলে যায়। সবাই গাড়ী হতে নেমে পড়লেন। চাকা পুনরায় লাগানোর সময় চাকার নাট পাওয়া যাচ্ছিল না। গাড়ীর ড্রাইভার, খাদিম আব্দুল কাদির মোল্লাহ ভাই সহ তন্নতন্ন করে নাট খুজলেন কিন্তু নাট পাওয়া গেল না। তখন মাওলানা সাহিবকে বলা হল- নাট পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বললেন, ভাল কইরা তালাশ কর। আবার খুঁজা হল, এবারও পাওয়া গেল না। তিনি পুণরায় বললেন, 'যাও ভাল কইরা তালাশ কর'। এবার দেখা গেল চাকার পাশেই নাট পড়ে আছে, এখানে আগেও খোজা হয়েছে কিন্তু তখন পাওয়া যায়নি। তখন গাড়ী ঠিক করে মাওলানা (রহ.) সহ সবাই মানিকগঞ্জ চলে আসলেন। তথায় উপস্থিত মোল্লা ভাই আজও জীবিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

হিদায়েতের পথে আহবান

ঘটনা : ১

বর্তমানে দরবারে থাকেন জালাল ভাই; দরবারের একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি প্রথম বিসমিল্লাহ শাহ দরগায় কাজ করতেন। তার নিজের ভাষায়- 'ভাই এমন কিছু নাই, যা খাই না। সরকারী মাজার টাকা চুরিতো প্রতিদিন করতাম। হঠাৎ একদিন আমার ভাইরা কইলেন, চলেন মানিকগঞ্জ যাই, হুযুরের কাছে মুরিদ হন। তো ভাইরার চাপাচাপিতে মুরিদ হলাম। কিছু দিন জিকিরও কিছু করলাম। কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না। একদিন হুজুর স্টেজ থেকে নামার সময় পাও জড়ায়া ধরলাম। পাও ধরার জন্য তিনি খুব রাগারাগি করলেন। তাও আমি ছাড়ি না, পরে তিনি লাথি মারলেন। আমি পাও ছেড়ে দিলাম। সে দিন রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আকাশ হতে এক তীব্র আলো আমার দিকে আসছে। আমি ভয়ে দৌড়াতে লাগলাম। দৌড়ে গর্তে পড়ে গেলাম। তখন ঐ তীব্র আলো হতে পরিপাটি হয়ে হুজুর বেরিয়ে আসলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'জাগাটা ভাল'। সেদিন হতে আমার জীবনের পরিবর্তন হয়ে গেল। জালাল ভাই এখনও সে ঘটনা মনে করে আবেগে আপ্লুত হয়ে যান।

ঘটনা : ২

হুজুরের এবারের মাহফিল পড়লো চট্টগ্রাম। সবাই বিশেষ আনন্দ নিয়ে তৈরী হচ্ছেন। চট্টগ্রামে হুজুর কিবলার প্রথম সফর। আগ্রাবাদের এক জায়গায় মাহফিলে তিনি বয়ান করছিলেন। বয়ানের শুরু থেকে একটি লোক দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে মুর্শিদ কিবলার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বয়ান শেষে হুজুর তাকে কাছে ডাকলেন এবং এভাবে দাড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটির নাম ছিল আব্দুস সামাদ। তিনি চট্টগ্রাম চাকুরি করতেন। আব্দুল সামাদ ভাই বললেন, হুজুর আপনার কাছে আমি ৫ বছর আগে স্বপ্নে মুরিদ হইছি। এ চেহারার মানুষ আমি ৫ বছর ধইরা খুঁজতাছি। এ কথা বলেই লোকটি কান্না শুরু করলো। তিনি আবার পুনরায় মুরিদ হলেন। আব্দুস সামাদ ভাইয়ের ছেলে ফারুক আজও জীবিত আছেন।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)

স্থান বায়রা। মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বায়রা গ্রামে আব্দুল হালিম নামে একজন মুরিদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি ঐ বাড়ীতে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাটির নীচ দিয়ে তো ইলিশ মাছের ঝাক দেখা যায়।' ঐ ভাই তখন কিছু বুঝতে পারলো না, বুঝার কথাও না। বয়রা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে পদ্মা নদী ছিল। কিছু দিনের মধ্যে এই সাড়ে পাঁচ মাইল

Dhaka University Institutional Repository

জায়গা ভেঙ্গে মুরিদের বাড়ীসহ নদী হয়ে গেল। এখন সেই জায়গায় ইলিশ মাছের ঝাঁক দেখা যায়। জেলেরা অধিক সংখ্যক ইলিশ মাছ ধরার জন্য সেখানে যায়।

ফরিদপুর জেলার কানাইপুরের একটি গ্রাম হল সালেংগা। এ গ্রামের মরহুম জামাল উদ্দিন মোল্লা হুজুর কেবলার ভক্ত ছিলেন। একদিন হুজুর কেবলাকে দাওয়াত দিয়ে বাড়ীতে নিয়েছেন। হুজুর কেবলা ছিলেন মধ্যম আকৃতির। লোকে তাকে খাটো বলতো। জামাল উদ্দিন মোল্লার বাড়ীতে গিয়ে খাটের উপর দাড়িয়ে হুজুর কেবলা বললেন, 'মোল্লা সাব আমি খাটা (খাটো) না? জামাল উদ্দিন মোল্লা তাকিয়ে দেখেন খাট হতে ফ্যান তো অনেক উপরে কিন্তু হুজুর কেবলা মাথা নিচু করে আছেন এবং ফ্যান তাঁর ঘাড়ে ঠেকে আছে। তখন জামাল উদ্দিন মোল্লা উত্তর দিলেন, 'না হুজুর, আপনি মোটা তো তাই দেখতে খাটো, আসলে আপনি খাটো না'। কিছুক্ষণ পর মুর্শিদ কেবলা নফল নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন, তখন মোল্লা সাব দেখলেন তাঁর মাথা হতে ফ্যান দেড়/ দুই ফুট উঁচুতে। চোখে দেখা সাক্ষী আব্দুল কাদের মোল্লা এবং মরহুম জামাল উদ্দিন মোল্লার ছোট ছেলে বাচ্চু মোল্লা আজও জীবিত আছেন।

রাসূল (স.)-এর খাটি প্রেমিক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদারাসার প্রিন্সিপ্যাল ও গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেব হজ্জে যাবেন, তখন তিনি মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর নিকট দোয়ার দরখাস্ত করলেন। হুজুর কেবলা প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বললেন, 'মদীনা মোনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (স.) -এর রওজা মোবারক জিয়ারতের সময় আমার সালাম ও দরূদ শরীফ দয়াল নবীজীকে (স.) পৌঁছিয়ে দিয়েন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হজ্জ করতে গেলেন, তিনি হুজুর (স.) -এর রওজা মুবারকে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা সালাম পাঠিয়েছিল একে একে সবার নাম বলে সালাম দিচ্ছিলেন। যেই মাত্র প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মুর্শিদ কেবলার নাম বলে সালাম দিলেন সাথে সাথে হুজুর পাক (স.) -এর রওযা হতে সালামের জবাব আসলো, 'ওয়াকুল্লাহু মিননি সালাম' অর্থাৎ আমার ছালামও তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দিও। (সুবহানাল্লাহ)।

এ তরীকার ইমাম গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) এর মত মাওলানা সাহিব (রহ.) দয়াল নবীজির পক্ষ থেকে সালামের জবাব পেলেনে। নিজ কানে শোনা সাক্ষী আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেব আজও জীবিত আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর তাসাউফ সংক্রান্ত কিছু অমূল্য বাণীঃ

১. ভাল মন কখনও মরে না।

২. মূর্খ লোকের ঈমান কচুপাতার পানি।

৩. তোমার দুর্বল ঈমানের সঙ্গে একটা সবল ঈমানের যোগ কর।

৪. 'ইল্‌মের যখন মৃত্য হয় 'আলিম তখন 'আলিম হয়।

৫. প্রায় দের হাজার বছর আগে রাসুলুল্লাহ্ (স.) কি কথা বলেছেন, যুদ্ধের সময় কোন কথা বলতেন, হযরত 'আলী (রা.) কে ঘারে করে পানি আনতে বলেছেন। সব কথা আজও বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

৬. হুজুর (স.) বলেছেন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাত্র ৭০ হাজার খাঁটি ঈমানদার থাকবে, তুমি বসে বসে ভাব তুমি এ পরীক্ষায় টিকো কিনা।

৭. বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কলেমা " লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ " ধ্বনীতে প্রতিধ্বনীত হবে।

৮. যদি কেহ আমার একটা মুস্তাহাবেরও খেলাফ পান তাহলে, আমার গাড়ী থামাবেন, তারপর আমাকে সংশোধন করে দিবেন। অন্যথায় হাশরের ময়দানে ঠেকা থাকবেন। উল্লেখ্য, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মুস্তাহাবেরও খেলাফ করতেন না।

৯. আমার একটা অনুরোধ হাদীস শরীফে যা আছে যেমন আছে এবং কুরআন শরীফে যা আছে যেমন আছে এর বাইরে আমার নিকট যারা মুরিদ হয়েছো চলতে পারবে না। কোন বুদ্ধি খাটাতে পারবে না, যদি খাটাও আমি তার পীর না সে আমার মুরিদ না।

১০. মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানে ক্রমাগত ভাবে এমন উন্নতি করছে যে, এরপর মানুষ আর মানুষ থাকবে না শুধু জ্ঞান-ই হবে, যদি কেউ হেটে যায় মানুষ বলবে একটা জ্ঞান হেটে যায়, এত জ্ঞানী মানুষ হবে এরকম হতে হতে আল্লাহরাব্বুল আ'লামীনকে অস্বীকার করবে (নাউজুবিল্লাহ), করতে করতে আবার খুব যদি জ্ঞানী হয় তখন সে ফিরে আবার আল্লাহ্পাকের কুদরতী পায়ে পরে কান্দা শুরু করবে ।

১১. বান্দার চোখের পানির সঙ্গে ও আল্লাহ্পাকের যিক্‌রের সঙ্গে একটা দারুন রকমের সর্ম্পক রয়েছে।

১২. জ্ঞানের জন্য ঔৎসুক্য থাকা ভাল। কিন্তু ভাল যখন বল্‌গাহীন হয় তখন মন্দতে যে সবচেয়ে মন্দ, তার চেয়েও মন্দ হয়ে যেতে পারে।

১৩. বিশ্ব ভুবনের বুকে মানুষের জ্ঞানের বাহিরে অনেক ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে, যার সম্বন্ধে মানুষ কোন জ্ঞানই রাখে না।

১৪. মৃত্যু একটা মহা একশন সুতরাং মরণের সঙ্গে সঙ্গে একটা রি-একশন জীবনের উপর হওয়াটাই বিজ্ঞানের মাতে স্বাভাবিক।

১৫. আসলে জ্ঞানই হচ্ছে ধ্যান, সুতরাং জ্ঞান জ্ঞান খ্যান খ্যান না করে ধ্যান করতে শেখ।

১৬. উঠ, জাগ, অভিষ্ট সিদ্ধির আগে ক্ষান্ত হইও না।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. কোন শব্দ শুরু হলে সেটা কোথায়ও যেয়ে শেষ হয় না, যেতেই থাকে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেয়েও শেষ হয় না, এভাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায় যেতে যেতে আল্লাহ্পাক পর্যন্ত যায়।

১৮. বান্দা বুঝে না আল্লাহর ব্যথা, উম্মত বুঝে না নবীর ব্যথা, সন্তান বুঝে না মায়ের ব্যথা, মুরিদ বুঝে না পীরের ব্যথা।

১৯. বিশ্বাস হচ্ছে পাকা তালের মত গোল ও রসাল ছোবড়াযুক্তও বটে। কেউ রস পায়, কেউ তালের গোলা পায়, কেউ ছোবড়া কামড়ে কামড়ে হুমড়ি খেয়ে থাকে।

২০. মানুষ মানুষের কাছে না গেলে মানুষ মানুষ হয় না

২১. হক্কানী পীরের চুল পরিমাণ সুন্নতের খেলাফ সহ্য হবে না।

২২. গুনাহ করতে ইচ্ছা করবে না এটাও একটি বড় হাল।

২৩. Forgive and Forget,

২৪. Don't order be ordered,

২৫. A good idea does never die,

২৬. A rolling stone does gather no moss,

২৭. টিনাসিটি বা লেগে থাকা স্বভাব না থাকলে কোন কাজে সফল হওয়া যায় না। (১৯৯৬)

২৮. পড়ি পড়ি করলেই পড়া হয় না, করি করি করলেই করা হয় না, পড়ার নাম পড়া করার নাম কর। এই মুহূর্ত থেকে শুরু করতে হবে। (১৯৯৭)

২৯. পীর সম্পর্কে মুরিদ সমান্য কু-ধারনা করলে মুরিদ ৫০০ বছর পিছনে চলে যাবে। বাকী জীবন আর সে আগের অবস্থানে না-ও আসতে পারে। (১৯৯৭)

৩০. টাকা রাখলে ব্যাংকেতে, নিতে পারে কোন ডাকাতে, ফেলে রাখলে ঘাটে পথে সাধু কয়জনা পাওয়া যায়, কি না হইলো বেপর্দায়। (১৯৭৪)

৩১. দুর্নীতি কেউ করিতে পারে না জয়, আইন দিয়া তারে ঠাসিয়া রাখিলে সাময়িক ফল হয়।

৩২. মরণের খেয়াল হচ্ছে মা'রিফাত অর্জনের জন্য জমি চাষতুল্য।

৩৩. তোমার দূর্বল ঈমানের সঙ্গে একটা সবল ঈমান যোগ কর।

৩৪. যেখানে ভালবাসা বেশী আইন সেখানে শিথিল।

৩৫. অযুতে নাক পরিষ্কার করার সময় মুখ বন্ধ রাখতে হবে। অন্যথায় নাকের ময়লা মুখে যেতে পারে। (১৯৯৮)

৩৬. নামায শুরুর আগে বাম হাতের ঘড়ি ডান হাতে পরতে হবে। (১৯৯৭)

৩৭. দাঁড়ি পাঁচবার আচড়ানো সুন্নত, আমি দৈনিক পাঁচবার দাঁড়ি আচড়াই। (১৯৯৬)

৩৮. প্রস্রাব করে ঢিলা কুলুব (টয়লেট পেপার) ব্যবহার না করে শুধু পানি ব্যবহার করলে নাপাকি আরো ভাল করে কাপড়ে লাগে। (১৯৯৬)

৩৯. যিক্র করতে করতে করতে করতে দেখবে কি বের হয়। (১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

৪০. মানুষের হাত যিকর করে, কান যিক্‌র করে, সব কিছুই যিক্‌র করে, শুধু মানুষ যিক্‌র করে না। (১৯৯৯)

৪১. দুই হাত কনে দিয়ে দেখেন যিক্‌র শুনতে পাবনে।

৪২. এক ভাল করতে যেয়ে জীবনের অনেক ভাল ছাড়তে হয়।

৪৩. ধর্মের সারকথা হলো- মানুষ হওয়া।

৪৪. ভবিষ্যৎ যতই সুন্দর হোক অমঙ্গল করে দেখ তাকে।

৪৫. অর্থহীন 'ইবাদত আর ফলহীন বৃক্ষ এই দুই-ই সমান কথা।

৪৬. এই দুনিয়া বন্দেগীর জায়গা কোন একটা খেল তামাশার জায়গা নয়।

৪৭. যার বিবি যিক্‌র করে না, মনে রাখ তার ঘরে একটা সাপ পাল, সে তোমাকে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

৪৮. মৃত্যুকে যত দূরে জানবে, মা'রিফাতকে তত দূরে জানবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) কর্তৃক লিখিত

গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) কর্তৃক লিখিত গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

যুগে যুগে যুগশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক দিকপালগণ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে যুগ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোড়ামী বিদুরিত করেছেন। তার ব্যতিক্রম ঘটেনি অধ্যাপক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের আল কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর আলোকে গবেষণামূলক, আধ্যাত্মিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখনীর ক্ষেত্রেও। মাওলানা সাহেবের লেখনীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি আল-কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর বিধানকে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এ যুগে বিজ্ঞানের নির্যাস দিয়ে সুরভী ছড়িয়েছেন। যা সকল ধর্মের মানুষের নিকট সাদরে গৃহীত হয়েছে। আমরা এ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় নিম্নলিখিত আটখানা কিতাব রচনা করেন; যা তাঁর সুযোগ্য সহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা
২. তারানায়ে জান্নাত
৩. মহাস্বপ্ন
৪. জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব
৫. মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব
৬. ধূম পিপাসা সর্বনাশা
৭. মহা ভাবনা
৮. পীর ধরা অকাট্য দলিল[১]

---

১. ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বিশ্ব তা'লিমে যিকর*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ২১; মুহাম্মদ শাহজাহান খান (সম্মপা.), *তাযকিরাতুল আওলিয়া*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৪, পৃ. ৪৬৫; মোঃ আযহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, ঢাকা: সুপার অফসেট প্রিন্টার্স লি., ২০০৮, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে গ্রন্থ সমূহের বিস্তারিত পরিচিতি ও পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো

১. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৯৭৪ইং সালে মাওলানা সাহেব 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা' নামক কিতাবটি রচনা করেন। এটি তাঁর লিখিত সর্বপ্রথম কিতাব। এ কিতাবে তিনি নারী ও পুরুষের শালীনতা, ভদ্রতা ও সুখী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। খুব সম্ভবত, এটিই বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরের দৃষ্টিতে আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের বিধান 'পর্দা' বিষয়ক বাংলাদেশের প্রথম কিতাব। মহান আল্লাহপাক তাঁর ওলীগণকে যে যুগে প্রেরণ করেন সেই যুগের সর্বদিকের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দ্বারা তাঁর ক্বালব আলোকিত করেন তার প্রমাণ রাখে মাওলানা সাহেবের 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা' কিতাবটি। কারণ, তিনি মাদরাসা ও মানবিক বিভাগের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও গবেষণা বিজ্ঞানের (Research Science) অতিসূক্ষ্ম বিভাগ দর্শন (Philosophy), মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Medical Science) আলোকে পর্দার উপকারিতা ও বেপর্দার বিষক্রিয়া তুলে ধরেছেন।

কিতাবের শুরুতেই তিনি বলেন,

"মেয়েলোক কিন্তু কম নয়,
যার পেটে মানুষ হয়।"[২]

এ কথার মাধ্যমে তিনি নারীর মর্যাদা সম্পর্কে সুধী পাঠক মহলকে সজাগ করেন। আজ থেকে প্রায় ৩৭ বছর পূর্বে এবং বর্তমানেও আমাদের সমাজে অধিকাংশ পরিবারে নারীরা অবহেলা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্লের স্বীকার হয়। তাই তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মানের কথা এবং সাথে সাথে নারী-পুরষ উভয়ের কিছু পারিবারিক দূবর্লতাও উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর দিকে স্বামী-স্ত্রী দৃষ্টিপাত করলে খুব সহজেই পারিবারিক অশান্তি দূর হয়ে সুখী জীবন যাপন করা সম্ভব।

তারপরই মাওলানা সাহেব মানুষের চক্ষু, কর্ণ ও মস্তিষ্কের অপব্যবহার কিভাবে মানুষকে তার নিজের অজান্তেই ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেয় তার বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, এ দুনিয়ায় নারী-পুরুষের যত অবৈধ ব্যপার ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে চোখ। যদিও দেখতে ছোট কিন্তু অতি ক্ষুদ্র আকারে এ জিনিসটি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে

---

২. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৪, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিল, মজনুর কপাল থেকে বাদশাহী কেড়ে নিয়েছিল এবং ট্রয় নগরীকে ধ্বংস করেছিল।[৩]

কিভাবে নিজের স্ত্রী নিজের অজান্তে এবং নিজের স্বামী নিজের অজান্তেই বেপর্দার ভয়ংকর থাবায় অতি সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করে এ প্রসঙ্গে তিনি কাব্যিক ভাষায় রশিক জ্ঞান দান করে বলেন,

"পরের বাড়ীর পিঠা, খাইতে লাগে মিঠা
পরের হাতের পান, খাইলে আসে গান"।[৪]

আমরা উপরের দুটি লাইন গবেষণা করলে দেখতে পাই মাওলানা সাহেব মুলত মনস্তত্ব বিদ্যার জটিল বিষয়কে পাঠকের মানসপটে ফুটিয়ে তুলে নারী-পুরুষ উভয়কে সর্তক করেছেন। সাধারণত অনেক সত্য এবং ভাল কথাও উপস্থাপনের ভঙ্গির কারণে মানুষ মানতে চায় না বা গুরুত্ব দেয় না। কাজেই কাব্যিক ভাবটি থেকে আমরা মাওলানা সাহেবের অতি উচ্চ উপস্থাপন ভঙ্গি অনুধাবন করতে পারি। যা সকল লেখকের থাকে না।

বেপর্দা নারী যখন অশালীন পোশাক পরে বা উগ্র আধুনিকা হয়ে সমাজে বিচরণ করে এবং সমাজের বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মানুষের কু-দৃষ্টি তার দেহে নিক্ষিপ্ত হয় তখন ঐ নারীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক বিভিন্ন জটিল সমস্যা বা বর্তমানে ইভটিজিং ছাড়াও আরও নানাবিধ ফিৎনার সম্মুখিন হয়ে সারা জীবন অশান্তিতে ভোগে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা সাহেব চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণ করে বলেন, উচ্ছৃঙ্খল বেপর্দা নারীর সন্তান অনেক কাল্পনিক পিতার স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং আসল পিতাকে মর্যাদা দিতে জানে না, মাতা তো ঝি চাকরাণি হয়েই থাকে।[৫]

তারপর তিনি পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আবারও কাব্যিক ছন্দে বলেন,

"টাকা রাখলে ব্যাংকেতে
নিতে পারে কোন ডাকাতে ?
ফেলে রাখলে ঘাটে পথে
সাধু কয়জনা পাওয়া যায়
কি না হইল বেপর্দায়"।[৬]

উপরের পংক্তিগুলোর মাধ্যমে মাওলানা সাহেব সুধী পাঠক মহলকে বুঝাতে চেয়েছেন, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত থেকে অনেক বেশী মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে ঘরের স্ত্রী, সন্তান।

---

৩. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তাই টাকা যেভাবে অনেক সর্তকতার সাথে যত্ন করে রাখতে হয় ঠিক এর চেয়ে অনেক অনেক বেশী যত্ন করে সর্তকভাবে স্ত্রী সন্তানকে রাখা স্বামী অথবা পিতার কর্তব্য।

যাদের স্ত্রী কথা শুনে না বা বেপর্দা চলাফেরা করে তাদেরকে কিভাবে খুব সহজে পর্দা করানো যায় সে প্রসঙ্গে ১৪টি উপায় লিখে দিয়ে বলেন' অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করতে না পারলে সংসার একটা সং হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কোনই সার থাকে না।[৭]

তারপর আর্দশ চরিত্রগঠনের কিছু উপায় এবং পুরুষের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

কিতাবের শেষের দিকে মাওলানা সাহেব লম্বা জামা বা জুব্বা পরিধানের উপকারিতা চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Medical Science) এর আলোকে সঠিক যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মটর সাইকেল যে ইঞ্জিনিয়ার সৃষ্টি করেন তিনিই তো সবচেয়ে ভাল জানেন, কোন ভাবে চালালে বা হিফাজত করে রাখলে সাইকেল বেশীদিন টিকবে। যিনি সাইকেল কিনে চড়েন, তিনি কি সাইকেল সম্বন্ধে ভাল জানেন ? আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সাইকেল সৃষ্টি করেছেন। আপনার দেহ সাইকেলটা কার নির্দেশমত চালালে ভাল চলবে এবং দীর্ঘায়ু হবে বলে মনে করেন ? কাজেই মৌলভী সাহেবরা লম্বা জামা পরে বেশী বুদ্ধিরই পরিচয় দেন।[৮]

সারকথা

সমাজের নর-নারীকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ও চরিত্রবান আদর্শ নর-নারীর সুশৃংখল জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে মনোবিজ্ঞানের আলোকে সমাজকে উপহার দিয়েছেন 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা' নামক গ্রন্থটি। যার ফলে নর-নারী বেপর্দার বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছে। গবেষণায় জানা যায়, গ্রন্থটি পাঠ করে অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত বোরখা পরে পর্দা করা শুরু করেছে। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি শান্তিপ্রিয় সমাজের জন্য এক অনন্য উপহার।

নামকরণের সার্থকতা

মাওলানা সাহেব গ্রন্থটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুলত পর্দা সম্পর্কিত গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি দর্শন (Philosophy), মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Medical Science) আলোকে পর্দার উপকারিতা ও বেপর্দার বিষক্রিয়া তুলে ধরেছেন। যার ফলে সুধী পাঠক মহল প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লাভ করেছে। এতে সাধারণ পাঠক ও 'আলিমগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে, যারা বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো খুব সহজে জানতে পারতো না। বর্তমান যুগ

---

৭. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর যুগ এবং বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিস্কার বরাবরই মানুষের নজর কেড়ে আকর্ষণ করে, তাই 'বিজ্ঞান' শব্দটি সংযোজন করা খুবই যুক্তিসংগত এবং আলোচ্য কিতাবটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট সাদরে গৃহীত হওয়ায় এর নামকরণ 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা' যথার্থ এবং সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি করেন কিতাবটির প্রকাশক, মাওলানা সাহেবের বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব। পরিকল্পনাটিতে তিনি দুটি হীরা সদৃশ মূল্যবান বস্তুকে মানবদেহ হিসেবে কল্পনা করেছেন। এখানে একটি মূল্যবান হীরা খোলা মেলা রেখেছেন এবং অপরটিকে একটি জাল সদৃশ পর্দার ভিতরে রেখেছেন। মূল্যবান হীরা দুটির পাশ থেকে লাল রংয়ের বিসাক্ত অসস্তিকর রশ্মি যা তিনি মানুষের কু-দৃষ্টি হিসেবে দেখিয়েছেন, দুটি হীরার উপরই পতিত হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাই, যে হীরাটি খোলামেলা রয়েছে এবং বেশী উজ্জ্বল হয়েছিল, বিষাক্ত রশ্মি সেটিকে বেশী আঘাত করছে। ফলে সেটির মূল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে ঝরে পড়ছে। এবং দ্বিতীয় হীরা যেটি পর্দার ভিতর রয়েছে সেটির গায়ে বিসাক্ত রশ্মি বা মানুষের কু-দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে না ফলে সেটির সৌন্দর্য এবং সুস্থতা অক্ষত রয়েছে। প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক প্রকাশকের পরিকল্পনায় প্রচ্ছদটি নিখুঁতভাবে অংকন করেছেন।

২. তারানায়ে জান্নাত

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অধ্যাপক সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আশিকিন, যাকিরিন, সালিকিনের সাধনার দুই প্রকার কাম্য বস্তু তথা আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করে উপহার দেন 'তারানায়ে জান্নাত' নামক কিতাবটি।[৯]

'তারানায়ে জান্নাত বা বিহিশতী সুর' কিতাবের পরতে পরতে তাঁর কবি প্রতিভা সূধী পাঠক মহলের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। আল্লাহ প্রেমিক মহাসাধক মাওলানা সাহেব এ কিতাবে বলেন-

"ওগো খোদা তুই রহমান রাহিম
তুমি সৃজিয়াছ মহাবিশ্ব
আমি দীন হীন নিঃস্ব
তবু আমারি মাঝে তোমারি বিকাশ
অনুতে বিরাজ তুমি হইয়া অসীম॥"[১০]

---

৯. ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী, *জ্ঞানের স্পর্শমণি*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরের কয়েকটি পংক্তি থেকে মাওলানা সাহেবের মহাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দুটি মহাপরিচয় 'মহাদয়ালু' ও 'মহাবিশ্বের মহাসৃষ্টিকর্তা' ফুটে উঠেছে এবং অতি ক্ষুদে মানুষের 'ইল্‌ম তাসাওউফ ও ইল্‌ম মা'রিফাত অর্জন এবং অসীম মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের মহাক্ষমতা তুলে ধরেছেন। অসীম মহাস্রষ্টার বিশালতা সম্পর্কে তিনি 'মহা ভাবনা' নামক একটি কিতাব রচনা করেছেন, যা আমরা সংশিস্নষ্ট অংশে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

'তারানায়ে জান্নাত' কিতাবটি দুটি খণ্ডে রচিত হয়েছে। গবেষণায় জানা যায়, তিনি ১৯৭৭ খিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় ১৩ বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফরকালে ১০৭টি আধ্যাত্মিক গজল রচনা করেন। প্রায় প্রতিটি গজলে তিনি রচনাকাল ও রচনাস্থান উল্লেখ করেছেন যা তার উচ্চপর্যায়ের বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে এবং আমাদের গবেষণাকে অনেকাংশে সহজ করেছে।

মাওলানা সাহেব তাঁর মুর্শিদ কিবলাকে অত্যধিক ভালবাসতেন তিনি তাঁর স্মরণে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি জামসা যাওয়ার পথে লিখেন-

"কে যাও পথিক মোর্শেদেরে কইও খবর
আছি বনবাসে
কেমন করে ঘরে আছে আমায় রেখে পরবাসে॥
আর কাছে আসিব না
আর ভালবাসিব না
মিনতি লইয়া আর দাঁড়াব না পাশে॥"[১১]

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারী 'ইল্‌ম মা'রিফাত সম্পর্কে লিখেন-

"ফানা ফিশ্বায়েখ হবে যদি
ছব্‌ক কর নিরবধি
সকল দুঃখে কোমর বাঁধি থাক পীরের পায়॥
ফানা ফিল্লাহ হতে হলে
আপন বুদ্ধি দাওরে ছেড়ে
মোর্শেদ বাণী মালা করে রাখিও গলায়॥"[১২]

উপরের পংক্তিগুলো 'ইল্‌ম মা'রিফাত জগতের অতি উচ্চ পর্যায়ে হওয়ায় আমাদের অতি নগণ্য জ্ঞানে এ বিষয়ে আলোচনা করা খুবই কঠিন। তবে এতটুকু অনুধাবন করা গেল যে,

---

১০. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *তারানায়ে জান্নাত*, মানিকগঞ্জঃ সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১, পৃ. ২৩

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

'ফানা ফিশ্ শায়েখ' ও 'ফানা ফিল্লাহ' ইত্যাদি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে তাকে অবশ্যই তার মুর্শিদ বা পীরের প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা থাকা প্রয়োজন। 'ফানা ফিশ্বায়েখ অর্থে সালিক শায়িখে ফানা' ও 'ফানা ফিল্লাহ অর্থে সালিক মহান আল্লাহ'য় ফানা' বুঝায়।[১৩]

এ কিতাবে এমন কিছু গজল রয়েছে যা শুধু উচ্চ পর্যায়ের সালিকদের আধ্যাত্মিক বিষয়, সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে। যেমন- মাওলানা সাহেব ৩০ মে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে লিখেন-

"আশা ছিল নিরালাতে পাব তোমায়
নূরের বাহু মেলে তুমি জড়াবে গায়॥
তুমি শুধু হাসবে
আমায় ভালবাসবে
দেখব আমি জ্বলবে তুমি নূরের বিভায়॥
একাই শুধু হাসবে
একাই ভালবাসবে
একাই তুমি আমি হবে নিজ মহিমায়॥
আমি শুধু দেখবই
তাকিয়ে শুধু থাকবই
হারিয়ে নিবে আমার সকল তোমার হিয়ায়॥
আমি শুধু কাঁদবই
তোমায় শুধু সাধবই
আমি শুধু বিলিয়ে যাবই
তোমার রাঙ্গা ঐ দুটি পায়॥ "[১৪]

সারকথা

এ কিতাবটির পরতে পরতে মাওলানা সাহেবের 'মহাকবি' পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। এ কিতাব স্মরণ করিয়ে দেয়, 'মহাকাব্য শাহনামা'র' লেখক মহাকবি ফিরদৌস, 'গুলিস্তা'র' লেখক আল্লামা শেখ সা'দী (রহ.) এবং 'মসনবী শরীফের' লেখক মহাকবি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী (রহ.)-এর মত মুসলিম মহাকবিদের তাসাউফের অমর কীর্তির কথা।

নামকরণের সার্থকতা

যেভাবে আতরের দোকানে আতরের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, মাছের বাজারে মাছের গন্ধ পাওয়া যায়, ফুলের বাগানে ফুলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, জ্ঞানী মানুষের কাছে গেলে জ্ঞান

---

১৩. প্রধান খলিফা সূত্রেঃ ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব হতে প্রাপ্ত।

১৪. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *তারানায়ে জান্নাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আহরোণ করা যায়, ভদ্র মানুষের নিকট ভদ্রতা শেখা যায়, সংগীত শিল্পীর নিকট গেলে সুর শোনা যায়. আল্লাহর ওলীদের নিকট গেলে আল্লাহর কথা মনে হয় ঠিক একই ভাবে 'তারানায়ে জান্নাত বা বিহিশতী সুর' নামক কিতাবটি পাঠ করলে বা মাওলানা সাহেবের স্ব-সুরে শ্রবণ করলে নিজের অজান্তেই চোখের অশ্রুন্ন ধরে রাখা যায় না, জান্নাতী স্পর্শ অনুভূত হয়। তাই কিতাবটির নামকরণ 'তারানায়ে জান্নাত বা বিহিশতী সুর' যথার্থ এবং সার্থক হয়েছে।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

কিতাবটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি করেন কিতাবটির প্রকাশক, মাওলানা সাহেবের বড় সহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী। পরিকল্পনাটিতে, একটি নূর থেকে অসংখ্য নূর রশ্মি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, অসংখ্য রশ্মি থেকে অসংখ্য নূর বলতে তাসাওউফের নূর, মা'রিফাতের নূর, হুব্বে রাসূলের নূর, হুব্বুল্লাহ'র নূর, হুব্বে মুর্শিদের নূরকে বুঝানো হয়েছে। প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক প্রকাশকের পরিকল্পনায় প্রচ্ছদটি অংকন করেছেন।

৩. মহাস্বপ্ন

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) 'মহাস্বপ্ন' নামক গ্রন্থটির মাধ্যমে এক অনন্য মুসলিম বিজ্ঞানীর পরিচয় দিয়েছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তিকালের প্রায় ১৫শত বছর পর এ নামক কিতাবে একটি হাদিস শরীফের, "কবরে কৃপণ ব্যক্তির বুকে সাপে কামড়াবে" বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন, যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ দশ বছর নিরলস গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে অধ্যাপক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) স্যার বিজ্ঞানকে উপহার দিয়েছেন বিজ্ঞান ভিত্তিক এ মহাকিতাবটি। যা ইতিহাসে ইসলামের নাম উজ্জ্বল করে রাখবে। এই কিতাবে তিনি বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন একটি থিওরি[১৫] (Man will have never been vanishing, and one man divided into crore of crores atom men after death and they can listen and watch with live feelings) আবিস্কার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন ইসলামের মহা মনীষীদের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের রসায়নের জনক[১৬] জাবির ইবনে হাইয়ান। উল্লেখ্য, তার লিখিত 'আল-কিমিয়া' নামক কিতাব থেকে পরবর্তীতে রসায়নের (Chemistry) জন্ম, তিনিই প্রথম

---

১৫. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাস্বপ্ন*, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি আবিস্কার করেছিলেন। আল-বাত্তানী সেই ৮৯০ খ্রিস্টাব্দেই ত্রিকোণমিতির সাইন (sin), কোসাইনের (cos) সাথে ট্যানজেন্টের (tan) সম্পর্ক তিনিই প্রথম আবিস্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড = এক সৌর বছর প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, এবং টলেমীর বহু থিওরি সম্পূর্ণ ভূল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।[১৬] 'আল কানুন ফি আল তিব্ব', যা ছিল ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের একমাত্র পাঠ্য বই এর লিখক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আবু আলী ইবনে সিনার (৩৭০-৪২৮হি./৯৮০-১০৩৭ খ্রি.), মূসা আল খাওয়ারিযমী (১৬৪-২৩৬ হি./৭৮০-৮৫০ খ্রি.), আল কিন্দী (১৮৫-২৫৯হি./৮০১-৮৭৩ খ্রি.),

আল ফারাবীর (২৫৮-৩৪৯হি./৮৭২-৯৫০ খ্রি.) মর্যাদাপূর্ণ বিজয়ের কথা। উল্লেখ্য, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা সাহেব বলেছিলেন "মানুষের আঙ্গুলের একটু অংশ কেটে ফেললে ঐ কাটা অংশ থেকে অসংখ্য মানুষ তৈরি করা সম্ভব, যা ১০ বছর পর ক্লোন থিওরির রূপ নিল এবং ভেড়া (কলি) সৃষ্টি করা হল, মানুষ সৃষ্টির গবেষণা চলছে"।[১৭]

কিতাবটির শুরুতে মাওলানা সাহেব বলেন, "মানুষ আর পশু একই প্রাণী, তফাত হচ্ছে বিবেকে। তাই বলা হয়, Man is a rational animal পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট একজন মানুষকে যদি পশু বলা যায় সে ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু একটা পশুকে যদি মানুষ বলা যায় সে খুশী হয় না। কারণ সে জানে যে সে পশু। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানেনা যে সে মানুষ নয়। তাই সে যা নয় তা তাকে বললে সে ক্ষেপে যায়"।[১৮]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যা জানি তা মোটেই প্রকাশ করিনা এবং যা জানিনা তা প্রকাশের জন্য খুবই তোলপাড় করি। অন্ধ ঔৎসুক্য এমনই মারাত্মক নেশা যা মানুষকে চরম অধপতনে নিয়ে যেতে পারে তার জ্ঞানের অলক্ষ্যে। জ্ঞানের জন্য ঔৎসক্য থাকা ভাল। কিন্তু ভাল যখন বল্গাহীন হয় তখন মন্দতে যে সবচেয়ে মন্দ, তার চেয়েও মন্দ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং, সব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা ভাল নয়। যুক্তির স্তিমিত অবস্থায়ই বিশ্বাসের মৌলিক কারণের উৎস। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, Reason more where reason is possible but don't urgue at all where reason is not possible (যেখানে যুক্তি খাটে, বেশি করে যুক্তি করবে কিন্তু যেখানে যুক্তি খাটেনা সেখানে মোটেই যুক্তি করো না)। যে লোক বলে, যতই সে জ্ঞানী হোক, আমি যা বললাম এ ছাড়া আর জ্ঞান নেই- সে মূর্খ। যে বলে আমি জানিনা সে অনেক জেনেছে।"

---

১৬. Michael H. Hart , The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History, (New York: Hart Publishing Company, 1978), P. 127

১৭. প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল হক, "মহাস্বপ্নে মহা থিওরী", *মাসিক ভাটিনাও*, (মুহাম্মদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী সম্পা.) ঢাকা: সিদ্দিকীয়া গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, সংখ্যা- ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১৭

১৮. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাস্বপ্ন*, প্রগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক মাওলানা সাহেব শুরুতেই মানুষকে তার নিজের পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করে মহান আল্লাহপাকের দেয়া উপহার 'বিবেক' সম্পর্কে আমাদের বিবেকের বিবেকচক্ষু খুলে দিয়েছেন।

মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন[১৯]-

মরণ একটা দারুণ রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। মানুষ মরে যায় কোথায়? আসলে কি মানুষ সত্যিই মরে? নাকি আমাদের ধারণাটা যাকে আমরা মৃত ব্যক্তি বলি তার সম্বন্ধে পাল্টে যায়। আমরা ভাবি সে মরেছে। আসলে সে মরেনি। সে এখন একটা নিরব জীবনে আছে এটা অত্যন্ত বাস্তব জীবন, সে জীবন সুপ্ত জাগ্রত। আসলে আমরা মরে আছি। ওই এখন এইমাত্র জন্মগ্রহণ করল। চিরদিন আমরা শুনে আসছি, বলে আসছি অমুকে মরে গেল। এসো অমুকের মৃত্যুতে আমরা বাংলা, ভারত, রাশিয়া, এশিয়া, আমেরিকা, অ্যান্টার্কটিকা ইত্যাদির সভ্য মানুষেরা ৫ মিনিট নিরবতা অবলম্বন করে শ্রদ্ধা জানাই। অর্থাৎ জীবনে অন্ত ত পাঁচটা মিনিটের জন্যও মরণ বলে একটা মিথ্যা কথা স্বীকার করি। মরণকে মিথ্যা কথা বলছি শুনে অনেকে অন্য রকম ভাবতে পারে। আসলে মরণ বিশ্বাস করে কয়জন? মরণের কথা মনে হলে মনের কোণে যেন মনে হয় আমি মরব না কোনদিন। অমুক নারী বা পুরুষ মরবে আমি মরব না। এই যে অনবরত মরণ সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস এটাই বহু প্রতিভাবান মানুষের জীবনে অপমৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আপনি বলবেন, মরণ সম্বন্ধে এত চিন্তা করে লাভ কি? তাইতো বলছিলাম, কয়টা মানুষকে ভাবনা প্রবণ মানুষ মনে করা যায়।[২০]

কারণ, মরণ এমন জিনিস যা শুধু জীবনেই ঘটবে। মরণে ঘটবে না। একবার ঘটলে দু'বার ঘটবে না এবং যদি একবার মরণ হয়, তবে যা মরল একবারই মরল, যা যাবার একবারই গেলে দুনিয়া ছেড়ে, দ্বিতীয়বার আর কোনদিনও ফিরে আসবে না। যদি ভুল করে কিছু রেখে যাওয়া যায় নেবার জন্য আর ফিরে আসতে পারা যাবে না। দুনিয়ার মামলায় যদি নীচের কোর্টে মার খেয়ে যায়, কেউ ওপরের আপিলের কোর্ট পাবে। কিন্তু মরণের মামলায় কেউ যদি একবার মার খেয়ে যায় তবে আপিলের জন্য কোন কোর্ট-কাচারী আর থাকবে না। সুতরাং আপনি যখন আপনাকে একেবারেই ছেড়ে যাবেন, আপনি যা কোনদিনই ছিলেন না তাই হবেন এবং এ মহাসংকটময় সময় আপনার জীবনে আসবেই। আপনি বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন আপনাকে সামনে রেখেই আপনাকে বাদ দিয়ে লোক গণনা করা হবে। সে সমস্যা জীবনে একদিন আসবেই। আপনার বিবি বিধবা হবেই, সন্তানগণ এতিম হবেই, সেটাকে খুব হালকা সমস্যা মনে করা উচিত নয়।

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

পরমাণু মানুষ (Atomic human) সম্পর্কে এমেচার পরমাণু বিজ্ঞানী মাওলানা সাহেব বলেন, অনেকের মনেই এ প্রশ্নটা জাগে, মানুষ মরণের পরে কি হয়? হিন্দুরা পুড়িয়ে দেয়, মুসলমানরা বা খৃষ্টানরা মাটিতে গলিয়ে দেয়। অনেকেই অনেক রকম বিশ্বাস করে। কেউ বলে মানুষ মরার পরে শেষ হয়ে যায়, মাটিতে মিশে যায়, মরণের পূর্ব পর্যন্তই মানুষের জীবন। মরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন চিরদিনের মতই ইতিপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে দেখা যাক, আসলে মরণের পরে মানুষের জীবনে কি পরিণতি হয়! বিজ্ঞানের মতে, মানুষ বলতে কিছু নেই অসংখ্য পরমাণু দিয়ে একটা মানুষের মূর্তি সৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনবোধে পরমাণু নিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হয়।[২১]

পরমাণু (Atom) সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলেন, আগের দিনে পরমাণুই ছিল বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রোমোন্নতির সঙ্গে এ তত্ত্ব পাল্টে গেছে। এখন রাদারফোর্ড থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বোহরের তত্ত্বে পাওয়া যায়, একটা পরমাণুর ভেতরে রয়েছে আরও ক্ষুদ্রতম মূল কণিকা। প্রায় ১০০ (একশত) প্রকার মূল কণিকার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। তাদের তিনটি হচ্ছে স্থায়ী (Stable Element) আর বাকীগুলো হচ্ছে অস্থায়ী (Unstable Element)। স্থায়ী (Element) গুলো হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন; অস্থায়ীগুলোর মধ্যে পজিট্রন (Positron), নিউট্রিনো (Neutrino), এন্টিনিউট্রিনো (Anti-neutrion) ও মেসন (Meson) ইত্যাদি প্রধান। একটা পরমাণু (Atom)- এর ভেতর ইলেকট্রন প্রোটনগুলো ঘূর্ণীয়মান অবস্থায় একটা সৌর বিশ্বের নিয়ম পালন করে চলছে।"[২২]

একটা পরমাণু (Atom)- এর ভেতর ইলেকট্রন প্রোটনগুলো ঘূর্ণীয়মান অবস্থায় একটা সৌর বিশ্বের নিয়ম পালন করে চলছে। [চিত্র][২৩]

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল হক, "মহাস্বপ্নে মহা থিওরী", *মাসিক ভাটিনাও*, (মুহাম্মদ মিকদাদ সিদ্দিকী সম্পা.) ঢাকা: সিদ্দিকীয়া গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, সংখ্যা- ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

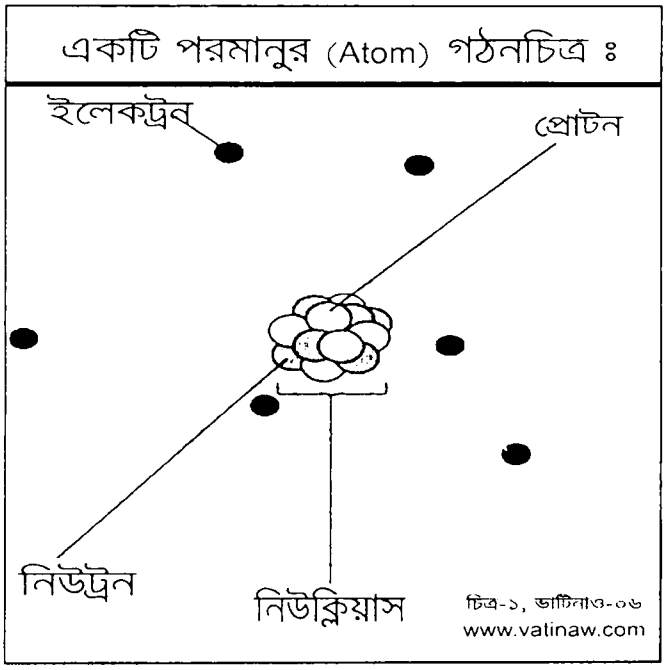

একটা ইলেক্ট্রন, প্রোটনের সঙ্গে এমন বজ্র বন্ধনীতে আটকে রয়েছে যে, যদি কোনক্রমে একটা ইলেকট্রনের বজ্র আটুনি থেকে একটা প্রোটনকে বিচ্যুত করা সম্ভব হয়, তাহলে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে তাতে আইনস্টাইন বলেন, "অবিভক্ত ভারতকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়া যাবে।"[২৪]

মানব দেহকোষ (Human Cell) সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন, "দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা বলেন ত্রিশ কোটি কোটি কোষ দিয়ে একটা মানুষের দেহ তৈরি হয়েছে। প্রতিটি কোষে রয়েছে যথাক্রমে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm), সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)। সাইটোপ্লাজমের ভেতরে রয়েছে নিউক্লিয়াস (Nucleus), নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের ভেতরে রয়েছে ক্রোমোজম (Chromosome) এবং ক্রোমোজমের ভেতরে জিন (Gene) রয়েছে, আর জিনগুলোর ভেতরে নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid) চলমান অবস্থায় বিরাজ করছে। এই নিউক্লিক এসিডই হচ্ছে মানুষের জীবনীশক্তির উৎস।[২৫]

---

২৪. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাস্বপ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

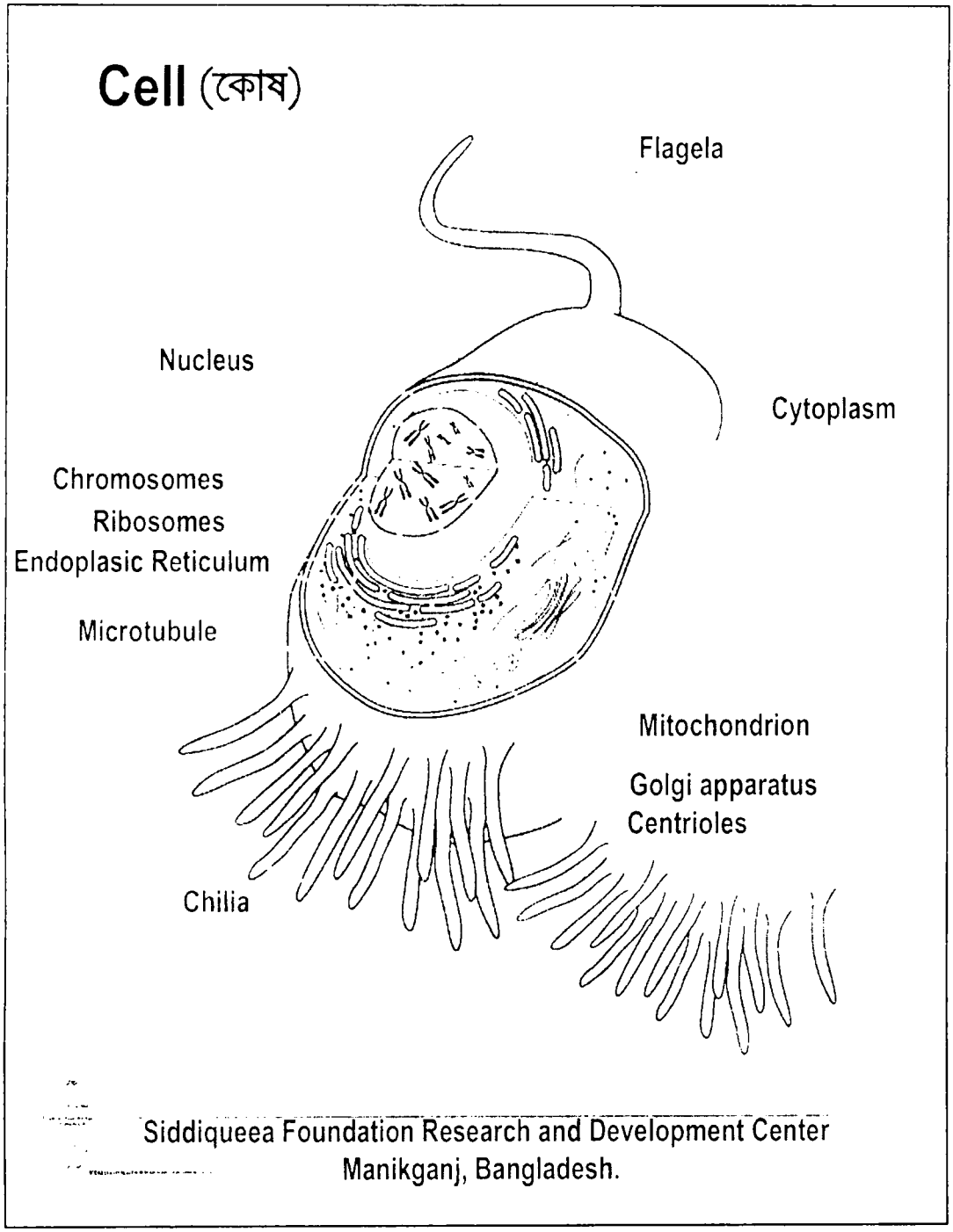

চিত্র[২৬] : দেহকোষ

২৬. *মাসিক ভাটিনাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

The law of conservation of Mass and Energy -র ব্যাখ্যায় মাওলানা সাহেব বলেন-

> "বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে- মানুষ কোন বস্তু সৃষ্টিও করতে পারে না আবার ধ্বংসও করতে পারেনা (The law of conservation of Mass and Energy)। মানুষ চেষ্টা দ্বারা বস্তুর রূপ বা আকার ইত্যাদি শুধু পরিবর্তন করতে পারে মাত্র। এ হিসেবে কোন বস্তুকে আগুনে পুড়লে বা পানিতে গলিয়ে দিলে এ বস্তু (Atom) কোনদিন কোন কালেই ধ্বংস হয় না, শুধু অন্যরূপে পরিবর্তিত হয় মাত্র। ঐ বস্তুর পরমাণুগুলো যে কোনরূপে রূপান্তরিত হোক না কেন চিরকাল তাজা থাকে। কোনদিন ধ্বংস হয় না।"[২৭]

মাওলানা সাহেব কর্তৃক আবিস্কৃত থিওরিটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা:[২৮]

১. হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে বরফ তৈরী হয়, অর্থাৎ বরফের ভিতরে উপরোক্ত দুটি অণু নির্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এখন বরফকে যদি তাপ দেয়া হয় তাহলে বরফের আন্তআনুবিক ক্ষমতা কমতে থাকে অর্থাৎ একটা অণু যে শক্তিতে আরেকটা অনুকে জড়িয়ে ধরে রাখে সেই শক্তি কমতে থাকে। তারপর তাপ বাড়াতে থাকলে অনুগুলো কাঁপতে থাকে। তারপর পানিতে পরিণত হয়ে যায়। এ অবস্থায় অনুগুলোর আন্তআনুবিক ক্ষমতা বরফের আন্তআনবিক ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম থাকে। তাই বরফ শক্ত এবং পানি নাড়া চাড়া করা যায়। কিন্তু পানির ভিতরের অণুর কোন পরিবর্তন হয় নি। সেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনই রয়েছে। শুধু অণুর ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। এখন পানিকে যাদি আবার তাপ দেয়া হয় তাহলে পূর্বের মত অণুগুলো কাপতে থাকে এবং আন্তআনুবিক ক্ষমতা আরো কমতে থাকে। অর্থাৎ একটা অণু আরেকটা অনুকে ধরে রাখতে পারে না, ধরে রাখে তবে বরফের মত শক্ত করে না। শক্তি খুবই কম হতে থাকে। এভাবে আরো তাপ বাড়ালে পানিটা বাতাসে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু ঐ বাতাসেও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনই থেকে

---

২৭. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), মহাস্বপ্ন, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ২১

২৮. প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল হক, "মহাস্বপ্নে মহা থিওরী", *মাসিক ভাটিনাও,* (মুহাম্মাদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী সম্পা.) ঢাকা: সিদ্দিকীয়া গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, সংখ্যা- ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

যায়। তার অর্থ হচ্ছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এক এক অবস্থায় এক এক শক্তিতে থাকে এবং এক এক পদার্থের নাম ধারণ করে।

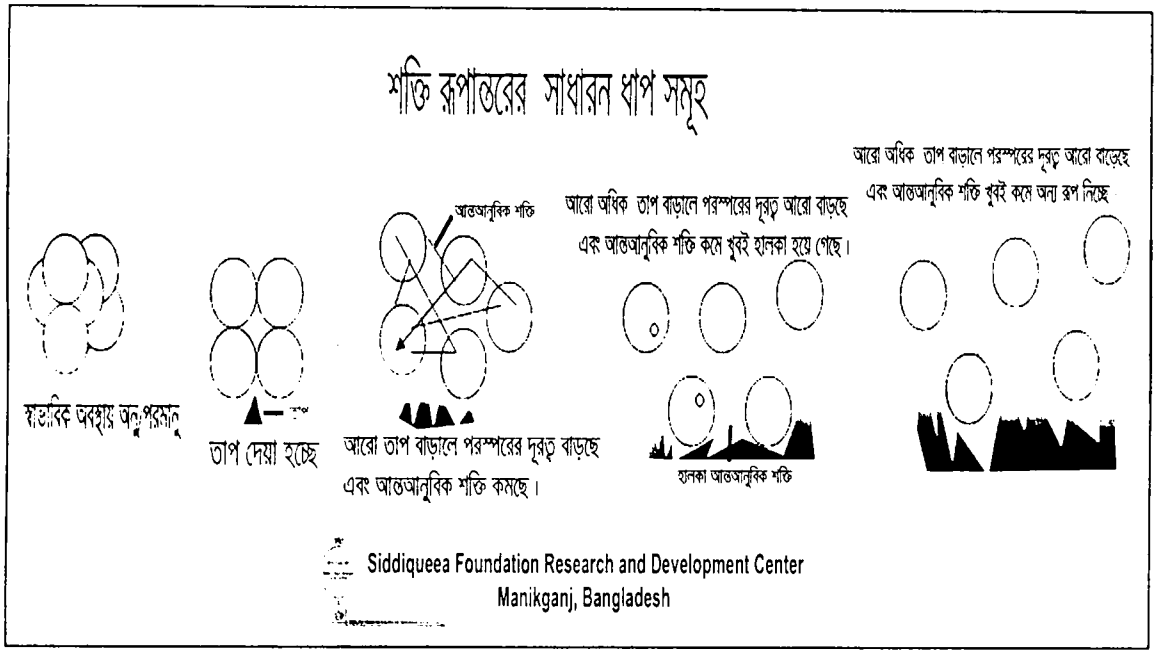

হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনই থাকে ও অক্সিজেন অক্সিজেনই থাকে, হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন নাইট্রোজেন হয়ে যায় না। শুধু বিভিন্নরূপ ধারণ করে মাত্র। প্রতিটি পরমাণুই একই ভাবে শুধু রূপান্তরিত হয় ঠিক মানব দেহের কোটি কোটি পরমাণু গুলোও অবস্থাভেদে রূপান্তরিত হয়ে থাকে মাত্র।[২৯]

২. লোহার অনু গুলোর আন্তআনবিক ক্ষমতা বরফের চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশী তাই লোহা এত শক্ত। লোহার অনুগুলো খুবই শক্ত করে এক অপরকে জড়িয়ে ধরে রাখে। কিন্তু লোহাকে যখন প্রচণ্ড তাপ দেয়া হয় তখন বরফের অনুগুলোর মত কাপতে থাকে এবং অনুগুলোর আন্তআনবিক ক্ষমতা কমতে থাকে । এভাবে একপর্যায়ে নরম হয়ে যায় এবং লোহার কালো রং ছেড়ে আগুনের লাল রং ধারন করে অর্থাৎ আন্তআনবিক ক্ষমতা খুবই কম থাকে, কিন্তু এ অবস্থাতেও লোহার অণুর কোন পরিবর্তন হয় না। শুধু রূপের বা গঠনের বা শক্তির বা অনুর ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। এভাবে তাপ আরো বড়ালে লোহা নামের কঠিন পর্দাথটি তরল পদার্থে পরিণত হয়। এবং একে তাপ দেয়া বন্ধ করে দিলে লোহা ধীরে ধীরে আবার কঠিন অবস্থায় ফিরে যাবে।[৩০]

---

২৯. *মাসিক ভাটিনাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

৩. এখন মানবদেহের এক একটি অঙ্গের অনুর আন্তআনবিক ক্ষমতা এক এক প্রকারের, অর্থাৎ পেশীর অণুর আন্তআনবিক ক্ষমতা হাড়ের চেয়ে অনেক কম তাই পেশী নরম আর হাড় শক্ত। আবার ফুসফসে বা জিহবার অণুগুলো আরো হালকা। মৃত্যুর পর এক এক অঙ্গের অণু এক এক অবস্থায় রূপান্তরিত হবে। কোনটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বাতাসে পরিণত হবে আবার কোনটা পানি আবার কোনটা মাটির সাথে থেকে মাটির রূপ ধারণ করবে তখন তাকে লোহার লাল রং ধারণ করার মত মাটি বলা যেতে পারে। কিন্ত ঐ মাটির সাথে মিশে যাওয়া অণুগুলো বরফ বা লোহার অণুর মত রূপ পরিবর্তন করে আছে মাত্র।[৩১]

বৈজ্ঞানিক মাওলানা সাহেব বলেন, মানুষকে মানুষ ভেবে যারা মানুষের মরণের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে মানুষ মরে যায়, শেষ হয়ে যায়, তারা হয়ত ভাবতে সময় পায়নি মানুষ আসলে কি?[৩২]

তিনি বলেন, মানুষ বলতে কোন কিছু নেই। কোটি কোটি এ্যাটমকে (Atom) একত্রে জড় করে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেহ বিজ্ঞানের মতে জীবকোষ বিভক্ত হতে হতে প্রথম কোষ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বা বায়ান্ন বার বিভক্ত হলেই প্রায় ত্রিশ কোটি কোটি কোষের অভিনব এবং অবিশ্বাস্য ভাবে মানুষ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। তার একটি হচ্ছে জীবকোষগুলো কেন বিভক্ত হয়? এবং প্রথম জীবকোষটি ত্রিশ কোটি কোটি হতে মাত্র পঞ্চাশ থেকে বায়ান্নবার বিভক্ত হয়। এটা কেমন করে সম্ভব? এবং এটাও খুবই আশ্চর্য বিষয় যে, গোটা মানব দেহটার এই যে পূর্ণ গঠন ও অবয়ব, পূর্ণ শরীরটার কোটি কোটি এ্যাটমগুলো কিভাবে পরস্পর সামঞ্জস্য রেখে দেহকে এত সুন্দরভাবে খাড়া করে চালিয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানের মতে প্রতিটি এ্যাটম তার নিজস্ব ক্ষমতায় ও শক্তিতে দেহে জীবন্ত থাকে। দেহ জীবন্ত থাকে বলে এ্যাটম জীবন্ত বা তাজা থাকে তা নয়। এবং বিজ্ঞানের এই গূঢ় কথাটি উপলব্ধি না হলে মানুষ সম্বন্ধে যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন, তার চিরদিনই একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকবে। কোন সমস্যার মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যদি কারও ভ্রান্তি থাকে তবে ঐ সমস্যার পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলোর কোনটাই শুদ্ধ হবে না।[৩৩]

মানব দেহের অণুগুলো জীবন্ত এবং জৈব শরীরের যত বিবর্তনই হোক না কেন দেহের অণুগুলো কোনকালেই ধ্বংস হয় না। এরা বিভিন্ন রূপান্তর গ্রহণ করে মাত্র। যারা মনে করে মানুষ মরে গেলে তার দেহটা পঁচে যায় বা আগুনে পুড়লে ছাই বা ভস্ম হয়ে যায়, তাদের এই ধারণাটা একটা অলিক ও সেকেলে ধারণা। মরার পরে মানবদেহ পুড়েই যাক বা গলেই যাক বা দুর্ঘটনার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক বা জীব-জন্তুতে ভক্ষণ করুক মানুষ

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩২. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাস্বপ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

কোনদিনই ধ্বংস হয় না। আসল ঘটনা হচ্ছে, অসংখ্য অণুকে একটা প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তির অচ্ছেদ্য বন্ধন দিয়ে জালকের মত জড়িয়ে দেহকে চলমান করে রাখা হয়েছে। অণুগুলো আপন শক্তিতে স্বকীয় সত্ত্বায় দেহে অস্তিত্বমান আছে। এই অদৃশ্য জীবনী শক্তিকে জীবাত্মা বলে ধারণা করা হয়েছে, যার কারণে দেহের ভেতর নিউক্লিক এসিড সক্রিয় থাকে, তাতে করে মানবদেহ সজীব থাকে এবং দেহের বিভিন্ন সিস্টেমগুলো কার্যক্ষম থাকে। যার ফলে মানুষ তার অনুভূতির জৈব বহিঃপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়। যেমন সুখানুভূতি বা বেদনাবোধে হেসে বা কেঁদে মুখ ভঙ্গিমায় ঠোঁট নেড়ে চেড়ে প্রকাশ করতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অঙ্গ নড়াচড়া করে জৈব অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে পারে। জীবাত্মা যখন নিরব হয় দেহের সকল অঙ্গের সকল অণুগুলোর তার সঙ্গে মরণ ঘটে না। তারা অবিকল তাজা থাকে এবং দেহের সর্বপ্রকার অনুভূতি বিরাজমান থাকে। যেমন- হাসি-কান্না, বোধ-বেদনা ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলো অবিকৃত অবস্থায় ঠিক থাকে। কিন্তু জীবাত্মা না থাকার কারণে ইন্দ্রিয়গুলো স্তিমিত অবস্থায় স্পন্দনহীভাবে থাকে। যেমন- অত্যন্ত দুর্বল রোগী দেখে, শোনে, মশা দংশন করলে অনুভব করে, নড়াচড়া করতে পারে না। চাঁদনী শুভ্রা যামিনী আর পাপিয়ার গান তাকে মাধুরিমা দেয়। বসন্তের দক্ষিণা মলয় তাকে স্বাপ্নিক করে তোলে কিন্তু সে কাউকে তার মনের কথা খুলে বলতে পারে না। তার বোবা মন শুধু অনুভূতিশীল কিন্তু অভিব্যক্তিহীন নির্বাক। মানুষের মরণের পরেও ঠিক এমনি ঘটনা ঘটবে। দেহের অসংখ্য অণুগুলো জীবাত্মার সান্নিধ্যে থাকাকালীন তাদের অজৈব শরীরে জৈব শক্তির একটা নিবৃত প্রবাহ সক্রিয় হয়ে থাকবে, যেমন- চুম্বকের সঙ্গে থাকতে থাকতে সাধারণ লোহাও চুম্বক শক্তিপ্রাপ্ত হয়, চুম্বকপ্রাপ্ত লোহার টুকরাটি যেখানেই নেয়া যাক, আসল চুম্বকের গুণাগুণ তার মধ্যে বিরাজমান থেকে যায় যদিও সে আসল চুম্বকের মত শক্তিশালী না থাকুক।[৩৪]

দেহ থেকে যখন জীবনীশক্তি বা চলচ্ছক্তি সরে যায়, মানুষকে কবরে নেয়া হয়, যখন মানুষটি কবরের ভেতরে নিরব হয়ে শুয়ে থাকে কিন্তু তার দেহে সম্পূর্ণ অনুভূতি শক্তি বিদ্যমান থাকে এবং এটা অত্যন্ত জটিলতর ভাবেই থাকে। যেভাবে চলমান অনুভূতি সর্ব অঙ্গে বা বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন ভাবে থাকে, ঠিক এভাবে কবরের মানুষের মধ্যে অনুভূতি থাকে না। প্রশ্ন হতে পারে, দেহ যখন পঁচে গলে যায় অথবা পুড়িয়ে দেয়া হয় তখন অনুভূতি কোথায় থাকে। কথাটা ভাববার মত। আমরা স্থুল জ্ঞান দিয়ে এবং স্থুল চক্ষু দিয়ে যা বুঝি বা দেখি তার বাইরেও অনেক অনেক বিষয় আছে যা স্থুলজ্ঞানে বা যুক্তিতে বা দৃষ্টিশক্তিতে ধরা পড়ে না। প্রেমানুভূতি, ভালবাসা, ব্যাধিপীড়ার যন্ত্রণা, ব্যর্থতার অভিক্ষেপ, সর্প দংশন জ্বালা, বিচ্ছেদ-বেদনা, প্রসব ব্যাথা ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় আছে যা কোনদিন জ্ঞানে বা যুক্তিতে বা দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না। দেখিনা-বুঝিনা-জ্ঞানে খাটে না বলে সব বিষয় বা স্বত্বাকে বা সত্যকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। সারা দুনিয়ায়

---

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

বিলকুল মানুষ যদি পুরুষ হয় এবং তার মধ্যে মাত্র একজন নারী থাকে এবং সে প্রসব ব্যথায় ভোগে, দুনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বা যে কোন নম্বরের জ্ঞানীলোক এই একটি প্রসব ব্যথা অনুভূতি জ্ঞান খাটিয়ে বা যুক্তি দিয়ে অনুধাবন করতে পারবে না এবং পারবে না বলে প্রসব ব্যাথাকে তো অস্বীকার করা যাবে না।[৩৫]

কথাটার সার হয় এই, সারা দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী-গুণীকে একজন নারীর নিকটে মাথা নত করে একটা সত্যকে মেনে নিতে হবে, সে যেমন করে ব্যথার কথা বলে, ঠিক তেমন করে মেনে নিতে হবে। কোন যুক্তিই চলবে না। কবরে মানুষ কেমন হয়, মরণ কি, মরণের পরে কেমন ঠেকে, প্রিয়জনহারা হয়ে চির কাঙ্গাল হলে, বেদনাতুর হৃদয়ে রোরুদ্যমান স্ত্রী কাফনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বেদনাশ্রু স্বামীর আর্ত দেহের উপর ঝরাতে থাকলে, স্নেহসিক্ত সন্তানরা এতিম হয়ে কাফন ধরে টানতে টানতে নিস্তব্ধ পিতার বুকে মাথা ঠুকলে, কেমন যে লাগে তা শুধু ঐ প্রসব ব্যাথাবিদ্ধা নারীর মত, ঐ বিদায়ী পথিকটিই অনুধাবন করতে পারবে। আর কেউ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারবে না।

অনেক অনেক সমস্যা আছে যা ঐ সমস্যায় না জড়ালে বোঝা যাবে না। যতদিন স্বাস্থ্য ভাল থাকে ব্যাধি পীড়ার যন্ত্রণা কোনদিন অনুমানে ধরা পড়বে না। যতদিন দাঁত থাকে দাঁত হারালে কি ঘটে তা অনুভব করা যায় না। এমনি যতদিন দেহে জীবন থাকে মরণের অভিজ্ঞতা বুঝে আসা সম্ভব নয়। মরণই একমাত্র মরণের অভিজ্ঞতা সম্যকভাবে দিতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে মরণের পরে দেহ যখন এলিয়ে যায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দেহের কোষগুলো কোটি কোটি ভাগে বিভক্ত হয়ে শশ্মানে ছাইয়ে পরিণত হয় বা কবরের মাটি শুকিয়ে ধূলিকণা হয়ে হাওয়ার সঙ্গে জীবদেহের পরমাণুগুলো মিশে তেপান্ত রের অন্তরালে হারিয়ে যায় অথবা পানিতে ডুবন্ত মানুষেকে মাছে খায় বা বিমান দুর্ঘটনায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জীবজন্তুর পেটে চলে যায় এমতাবস্থায় মানুষের অনুভূতি থাকার সিস্টেমইতো নেই।[৩৬]

আগেই বলা হয়েছে, মানুষ মরার পরে তার ইন্দ্রিয় অনুভূতি অর্থাৎ শ্রবণশক্তি, দর্শন শক্তি, অনুভব শক্তি ইত্যাদি কিভাবে যে বিদ্যমান থাকে তা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। মানুষের নাভীস্থলটি হচ্ছে মানবদেহের দানা বা বীজ স্বরূপ। প্রতিটি ফল-ফসলের একটা বীজ আছে। এবারের ফসল হারিয়ে গেলে আগামীবার তার বীজ থেকে আমরা এবারের হারানো গাছটি অবিকল আসলরূপে, আসল স্বত্ত্বাসহই ফেরত পাই। যেমন- একটা চাল কুমড়া গাছে ত্রিশটি কুমড়া ধরল। ত্রিশটা কুমড়া চাল থেকে আগামী বছর একটা করে চাল ভরা কুমড়া গাছ হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বীজগুলোর প্রত্যেকটি ভাংগলে দেখা যাবে খোসার ভেতরে একটি করে সাদা শাঁস আছে। বিশ্বের কোন শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও ঐ শাঁসের ভেতরে কুমড়ার বড় বড় ঢালা সবুজ পাতা দেখা যাবে না, গাছের

---

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

শিকড় দেখা যাবে না, কুমড়া দেখা যাবে না, ফুল দেখা যাবে না। তাহলে শুধু শাঁসের ভেতরে এত কিছু অতি গোপনে লুকিয়ে থাকতে পারল?[৩৭]

শুধু এ ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। পাথরকুঁচি গাছের শুধু একটা পাতার খণ্ডের ভেতরে সম্পূর্ণ আসল গাছটি লুকিয়ে থাকে। এই গাছের পাতা সিলেট থেকে তুলে নিয়ে আমেরিকার একটু ভেজা মাটিতে রেখে দিলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে ঐ পাতায় ভর করে সিলেটের পাথর কুঁচির পাতার কণা আমেরিকায় আসল গাছ হয়ে জেগেছে। "[৩৮]

'মহাস্বপ্ন' কিতাবটি মূলত দর্শন ও বিজ্ঞানের নির্যাস যার প্রতিটি বিষয় নিয়ে উচ্চতর বিজ্ঞানের গবেষকদের অফুরন্ত গবেষণার সুযোগ রয়েছে। আমাদের গবেষণায় কিতাবটিতে অগণিত থিওরি ও অনুসিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা এখানে শুধু মূল থিওরিটি, নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। ভবিষ্যতে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ পেলে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। দেশ ও দেশের বাহিরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিজ্ঞানের গবেষকদের মতে এ থিওরিটি আবিস্কারের ফলে মাওলানা সাহেব একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম একজন মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করবেন।

সারকথা

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ এখানে নেই কোন উন্নত ল্যাবরেটরী বা উন্নতপ্রযুক্তি। ইতিপূর্বে বেশ কিছু বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর আবিস্কৃত থিওরি দিয়ে বিদেশী বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছে এবং তাদের সাফল্য ও নাম বিশ্বে ছড়িয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি আবিস্কারের কথা বলবো; তা হলো রেডিও আবিস্কার। এ রেডিও গান শুনার যন্ত্র নয় এটি হচ্ছে একটি তরঙ্গ (Wave) যা বেতারের (wireless) ক্ষুদ্রতম অংশ। ঐ বিজ্ঞানী তার wireless telegraphy- র মাধমে ১৮৯৫ সালে বিশ্বে প্রথম বারের মত প্রায় ১ মাইল দূরে তার বাসা হতে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বিনাতারে (wireless) বৈদ্যুতিক তরঙ্গেও মাধ্যমে শব্দ আদান প্রদান করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে আজকে রেড়িও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellite) ইত্যাদি আবিস্কার সম্ভব হয়েছে। এমন কি দুরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্রও ঐ রেডিও থিওরির কারণেই হয়েছে। কিন্তু এ বিশ্বের অনেকেই জানে না যে রেডিও তরঙ্গের (Radio Wave) আবিস্কারক একজন বাংলাদেশী । সে বিক্রমপুরের কৃতি সন্তান আচার্য জগদিশ চন্দ্র বসু স্যার। দুঃখের বিষয় হল- ১৮৯৬ সালে বসু স্যারের সহপাঠি ইতালীর বিজ্ঞানী মার্কনী তার থেকে থিওরিটি শুনে wireless telegraphy -ও প্রথম পেটেন্ট দিয়ে দিলেন এবং রাতারাতি বৃটেনে বিজ্ঞনী

---

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মহলে ব্যপক পরিচিতি পেলেন। যাহোক বাংলাদেশবাসী কি জানত আচার্য জগদিশ চন্দ্র বসু স্যারের থিওরির ফলে আজ বিশ্বে এত কিছু আবিষ্কার হবে বা তার পরোপুরি স্বীকৃতি কি বাংলাদেশ পেয়েছে? আচার্য জগদিশ চন্দ্র বসু স্যার আবিষ্কার করেছেন- "গাছেরও প্রাণ আছে এবং অনুভতি আছে" তার আবিষ্কারের পূর্বে বিশ্ববাসী গাছকে জড় পর্দাথ ভাবত। এ কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে 'মহাস্বপ্ন' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে অধ্যাপক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) স্যার যে থিওরি আবিষ্কার করেছেন সেই থিওরি দিয়ে ভবিষ্যতে কি আবিস্কার করা হবে আজকে মানুষ তা অনুধাবন করতে পারছে না, ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডন, ইংল্যান্ড এর ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষক, প্রকৌশলী এম. আর. হক এর মতে, অদুর ভবিষ্যতেই থিওরিটির ফলে বাতাস থেকে মানুষের জিন সনাক্ত করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহপাক আমাদেরকে তওফিক দিন। আমীন ! উল্লেখ্য, 'মহাস্বপ্ন' থেকে কোন লিখা বা ভাব বা জ্ঞান কিতাবটির প্রকাশক অন্যতম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষক, হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব এর লিখিত অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা কঠোরভাবে আইনত দণ্ডনীয়।

নামকরণের সার্থকতা

পৃথিবীতে নতুন কোন থিওরি আবিস্কার করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। নিরলস গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব নতুন কিছু সৃষ্টি করা। পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞান সমান নয়। বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইন যখন সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব জুরিখে লেকচার দিতেন তখন তার ক্লাস ভরা ছাত্রদের মধ্যে মাত্র দুই জন তাঁর লেকচার অনুধাবন করনে পরতেন। বাকী ছাত্ররা তাৎক্ষণিক ভাবে বুঝতে অক্ষম ছিলেন। কারণ তাদের মস্তিস্ক হয়তো ঐ দুই জনের মত ক্রিয়াশীল ছিল না। তাদের কাছে অনেক কিছুরই কাল্পনিক বা রূপক বা স্বপ্নের মত মনে হতো। ঠিক একইভাবে আমরা মনে করি অধ্যাপক সিদ্দিকী সাহেব রচিত 'মহাস্বপ্ন' কিতাবের বিষয়াদি ও থিওরির থিম অতি উচ্চপর্যায়ের হওয়ার ফলে তৎকালীন সাধারণ মানুষ ও মানবিক বা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের জন্য এটি স্বপ্নের মতই ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর জিন তত্ত্ব, ক্লোনিং থিওরি, মাইক্রোবায়োলজি, উচ্চতর কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদির আবিস্কারের ফলে থিওরিটি গবেষকদের নিকট সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তাই নিঃসন্দেহে কিতাবটির নাম 'মহাস্বপ্ন' যথার্থ ও সার্থক হয়েছে বলে আমরা অবলোকন করি।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

এ কিতাবের সম্পূর্ণ প্রচ্ছদটি অধ্যাপক সিদ্দিকী সাহেব (রহ.)-এর স্ব-হস্তে রংতুলিতে অঙ্কিত নকশা। এখানে কিতাবের ভিতরের মূল থিওরিটি যথার্থ ও নির্ভুলতভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশে একটি কবর অংকন করেছেন। পরিবেশটি ভোরবেলা অথবা স্নিগ্ধ বিকেলবেলা বলে দৃষ্ট হয়। কবরের উপর বজ্রপাতের ন্যায় শাস্তি বা

Dhaka University Institutional Repository

শান্তির নূর উভয়কেই বুঝিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। আর কবরের ঠিক মাঝখানে থেকে কালো ধুয়ার মত কোটি কোটি পরমাণু মানুষকে বুঝিয়েছেন এ অসংখ্য পরমাণু মানুষ বাতাসে ছড়িয়ে পরছে। যা তাঁর আবিস্কৃত থিওরির মূল বিষয়। এ চিত্রকর্ম থেকে মাওলানা সাহেবের শিল্পী পরিচয় ফুটে উঠেছে। যা জানতে পেরে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারছি না। মহান আল্লাহপাক তাঁর ওলীকে অগণিত প্রতিভা দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন মাওলানা সহেবের বহু প্রতিভাই তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে । প্রচ্ছদটি কিতাবের প্রকাশক মাওলানা সাহেবের বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের হুকুমে প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক কম্পিউটার গ্রফিক্সে নিখুঁতভাবে হুবহু রূপান্তর করেছেন।

৪. জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আজ থেকে প্রায় ২৩ বছর পর্বে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা সাহেব চিকিৎসা বিজ্ঞান নিংড়ানো নির্যাস হিসেবে সুধী পাঠক মহলকে উপহার দিয়েছেন 'জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব' নামক কিতাবটি।

এ কিতাবটি গবেষণায় আমরা মাওলানা সাহেবকে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে অনুধাবন করেছি। বিজ্ঞানের অতি জটিল, নিরস, গাণিতিক বিষয়গুলোকে তিনি সাহিত্যের সুরভিতে সুধী পাঠক মহলের হৃদয়ে দোলা দিয়ে আল-কুরআনুল কারীমের নূর অবলোকন করিয়েছেন। যেমন মাওলানা সাহেব হৃৎপিণ্ডের পরিচয় ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কিতাবটির শুরুতেই বলেন-"এ মুহূর্তে আপনি কেমন করে বসে আছেন, কেমন করে এই বইখানি পড়ছেন, কথা বলছেন, তা নির্ভর করে একটা আশ্চর্য যন্ত্রের উপর। সেটা স্পন্দিত না হলে, চোখের পলকে আপনি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবেন। এই অবাক করা দুরূহ যন্ত্রটির নাম হচ্ছে হৃৎপিণ্ড "।[৩৯]

Law of Newton এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে মাওলানা সাহেব বলেন[৪৩], বিশ্ববিশ্রুত মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানী নিউটন আইন প্রকাশ করলেন, সে আইন সারা বিশ্ব চোখ বন্ধ করে মেনে নিল। তিনি বললেন, জড় পদার্থে গতি সৃষ্টি না করে দিলে সে গতি সম্পন্ন হয় না এবং যতক্ষণ গতি সৃষ্টি করানো থাকে ততক্ষণই এ জড় পদার্থ গতি সম্পন্ন থাকে। এ হচ্ছে নিউটনের দেয়া আইন (Law of Newton)। হৃৎপিণ্ড একটা মাংস খণ্ড অর্থাৎ জড় পদার্থ। হৃৎপিণ্ডটা সৃষ্টি হবার পর নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিল গতিহীনভাবে। এতে কোন স্পন্দন ছিল না, কোন সংকোচন বা সম্প্রসারণ ছিল না। ডান বা বাম অলিন্দ এবং নিলয়গুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ এক

---

৩৯. অধ্যাপক মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব*. মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

সময় এরা নড়ে উঠল, স্পন্দিত হতে লাগল এবং হৃদক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। জড় পদার্থকে চালিয়ে না দিলে চলে না, গতি সৃষ্টি করে না দিলে গতি সম্পন্ন হয় না – বিজ্ঞানীর এ আইনে বিশ্বাসী যুক্তিবাদীরা, নাস্তিকরাও এ আইন মেনে নেয়। এই হৃৎপিণ্ডটি মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত জীবন্ত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখছে। সর্বাঙ্গ এমনকি তার যুক্তি করার ক্ষমতাও যে যুগিয়ে দিচ্ছে- এই হৃৎপিণ্ডটা প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত নিস্ক্রিয় ছিল, ছিল গতিহীন, স্পন্দহীন, স্থবির। এটাকে প্রথম একটা ধাক্কা দিয়ে কে এতে গতি সৃষ্টি করে দিল ? বিজ্ঞানীরা বলেন, এটা আমরা জানিনে, এটা আমাদের বোধগম্য হয় না। হৃৎপিণ্ড কেন যে এমন করে নড়াচড়া করে, এর কারণ কেউ আজও খুঁজে বের করতে পারেনি।[৪৪]

হৃৎপিণ্ডের এই স্পন্দনের একটা কারণ খুঁজে পেতে গিয়ে আরও হতবাক হয়ে তারা মহাস্রষ্টাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা অনুসন্ধান করতে দিয়ে দেখেছে ভ্যাগাস (Vagus) নার্ভ নামে একটা নালী মাথার নিম্নভাগ থেকে নেমে মধ্যচ্ছদা পর্যন্ত এসে মিশেছে। এটা হৃৎপিণ্ডে গিয়ে মিশেছে। ভ্যাগাস কথার মানে ভবঘুরে (Vagabond)। তড়িতের মত প্রবাহ এর ভিতর দিয়ে এসে হৃৎপিণ্ডে অনবরত প্রেরণা (Impulse) দেয়, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড সক্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা শত চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারেনি এই প্রেরণা কোথা থেকে আসে এবং মস্তিষ্কের কোথায় এই প্রেরণা সৃষ্টিকারী মেশিন (Generating machine) । বিজ্ঞান বলে, প্রতিটি শক্তি (Energy) সৃষ্টির এক সৃষ্টিকারী মেশিন (Generating machine) আছে, যা থেকে শক্তির উৎস আসে। যেমন কাপ্তাই এর সৃষ্টিকারী মেশিন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে আসে, ডায়নামা থেকে শক্তি আসে। বিজ্ঞানীরা মাথা নত করে বলেছেন, ভ্যাগ্যাস নার্ভের প্রেরণার উৎস-শক্তি কোথায় তা নিশ্চয়ই অজানা এক শক্তির হাতে এবং এই শক্তিই হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন। [৪৫]

এমনিভাবে দেহতত্ত্ববিদগণ মানবদেহ জরীপ করতে গিয়ে অসংখ্য স্থানে মহাস্রষ্টা আল্লাহকে মেনে নিয়েছেন। যিনি হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন দিয়েছেন, যিনি প্রথম ধাক্কা দিয়ে হৃৎপিণ্ডতে স্টার্ট করিয়ে দিয়েছেন এবং যিনি ভ্যাগাস নার্ভে জীবন প্রবাহের প্রেরণা (ওসঢ়ঁষংব) ইনজেক্ট করে দিচ্ছেন, তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে জানিয়ে দিয়েছেন, "আল্লাহু নুরুস্সামাওয়াতে ওয়াল আরদ"[৪০] অর্থাৎ আসমান জমিনে যা কিছু প্রেরণা পায়, শক্তি পায়, হৃৎপিণ্ড তার চলশক্তি পায়, ভ্যাগ্যাস নার্ভ প্রবাহ পায়, জীবকোষ তার শক্তি পায় – এসবের জেনারেটর হচ্চি আমি, আমি মহা আলো, মহাতেজময় শক্তি। আমার মহাশক্তির মেশিন থেকে সবাই শক্তি (উহবৎমু) পায়। আমার আলো বিদ্যুতের প্রবাহের মত মস্তিষ্কে

---

৪০. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আল-কুরআন, ২৪ : ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

খেলে যায় অনবরত, তা থেকে ভ্যাগাস নার্ভ প্রবাহ পায়। সেই তড়িৎ প্রবাহ প্রতিনিয়ত হৃৎপিণ্ডকে উজ্জীবিত করে এবং তার স্পন্দন শক্তি যোগায়"।[৪১]

আল্লাহ অস্তিত্ব সম্পর্কে মাওলানা সাহেব কাব্যিক ভাষায় বলেন,

"নিশ্চয় আছেন একজন
যে অর্থে আমরা বুঝি,
যে অর্থে আমরা খুঁজি
হয়ত তিনি নন তেমন
নিশ্চয় আছেন একজন।"[৪২]

দেহবিজ্ঞান (Physiology) ও ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার (Anatomy) আলোকে মহাস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্বলিত মাওলানা সাহেবের 'জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব' নামক কিতাবের অনুরূপ কোন কিতাব উপমহাদেশে নেই বললেই চলে। কিতাবটির আলোচনায় আমরা অভিবুত হয়েছি।

সারকথা

মাওলানা সাহেব 'জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব' নামক কিতাবের মাধ্যমে জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন মহান আল্লাহপাক অতি দয়া করে মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের নির্যাস বের করে আল-কুরআনের আলোকে এ কিতাব খানা লিখেছেন। মানব দেহের কোথায় আল্লাহপাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে মানবদেহের বিভিন্ন জটিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্রম সাহিত্য রসে ব্যাখ্যার প্রয়াস পেয়েছেন।

নামকরণের সার্থকতা

কিতাবটিতে মাওলানা সাহেব জীবনের মূল চালিকাশক্তি কিভাবে দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখে, দেহের জটিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের কার্যক্রম, শক্তিপ্রাপ্তি, গতিপ্রাপ্তি, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিচালনা ইত্যাদি অতিব রহস্যময় বিষয়াদি আলোচনা, তত্ত্ব উদঘাটন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমন্বয়ে মহান আল্লাহ রাবুল আ'লামিনের ক্ষমতা, পরিচয় ও অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির নামকরণ 'জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব' যথার্থ এবং সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

---

৪১. অধ্যাপক মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রচ্ছদ পরিচিতি

কিতাবের নামটি অধ্যাপক সিদ্দিকী সাহেব (রহ.)-এর বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের একমাত্র সহেবজাদা এবং প্রধান খলিফা ও মাওলানা সাহেবের স্নেহধন্য নাতী মুহাম্মাদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী সাহেবের স্ব-হস্তে অঙ্কিত নকশা। প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটিও করেন তিনি। পরিকল্পনাটিতে তিনি ভ্যাগ্যাস নার্ভ ও মটর নার্ভের গতিশক্তির পাশে মানব দেহকোষের কার্যক্রম ফুটিয়ে তুলেছেন। ঠিক মাঝখানে তিনি ফুসফুস, লিভার, পাকস্থলি, ডিওডেনাম, ভিলাই গ্রন্থে আলোচিত ইত্যাদি অঙ্গপত্যঙ্গ সংযুক্ত করেছেন। ডান পাশে ব্যবচ্ছেদকৃত হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ নিলয়কে চিহ্নত করেছেন। চূড়ান্ত নকশা অংকনের পূর্বে কিতাবটির প্রকাশক ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব হৃৎপিণ্ডের লেফ্‌ট ভেনট্রিক্যাল এ আরবীতে মহান আল্লাহ নাম 'আলিফ লাম লাম হা' সংযোজন করেছেন। প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক কম্পিউটার গ্রফিক্সে প্রচ্ছদটি নিখুতভাবে অংকন করেন।

৫. মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মাওলানা সাহেব ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে কঠোর অনুশীলন ও অধ্যাত্মিক মহাসাধনার মাধ্যমে তাঁর পীর সাহেব হুযুরগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত দূর্লভ তথ্য, তত্ত্ব ও মা'রিফাতের জ্ঞান সমূহের ব্যবহারিক সাধনালব্ধ নির্যাসের নূরে রচনা করেন 'মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব' নামক ইল্‌ম তাসাউফ জগতের দীদারে ইলাহী পিপাসু সালেকগণের হৃদ খোরাক। উল্লেখ্য এ কিতাবটি চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীক্বার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সংক্ষিপ্তভাবে এ মা'রিফাত মহাসমুদ্রে ভেলা ভাসানোর প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

রাসূল প্রেমিক মাওলানা সাহেব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে কব্যিক ভাষায় প্রেম নিবেদন করে বলেন-

"যে না হলে স্বয়ং আদম হয়না নবী,
যে না হলে জ্বলতনা এ ধরার রবি।
রওজাটা যার খোদাই আছে তোর মাঝারে,
শুধুই মানুষ ভাবলি তারে কেমন করে।"[৪৩]

মাওলানা সাহেবের সাধনালব্ধ প্রেম হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে তাঁর স্বমহিমায় প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছে। যা ক্ষুদে মানুষের চিন্তাশক্তির অনেক উর্ধ্বে। তাই আমাদের পক্ষে এসকল উচ্চ পর্যায়ের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা খুবই দূরহ ব্যপার। যেমন

৪৩. মৌঃ মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী, *মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব'* ঢাকা: সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯, পৃ. ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন, মোরাকাবা মোশাহেদার আয়না মেলে ধরে দেখলে দেখা যাবে আল্লাহ আদম (আ.) কে আসলে কোন্ রূপে সৃষ্টি করেছিলেন।

কিতাবটিতে মাওলানা সাহেব আল্লাহর নূর, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নূর, ফিরিশতাদের নূর ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সালিক কোন নূর কিভাবে চিনবে এবং নূর দৃষ্টিগোচর হলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে দিকনির্শেনা দিয়েছেন।

কি কি কারণে সালিক তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না সে সম্পর্কে অতি সূক্ষ্মভাবে আলোকপাত করেনে। হক্কানী পীরের পরিচয় ও গুণাবলী লিখে দিয়েছেন যাতে মানুষ সঠিক পীর চিনে পীর ধরতে পারে।

সালিকদের বিভন্ন প্রকার ও বিভিন্ন অঙ্গের যিকর সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীক্বার মুরাক্বাবা মুশাহাদা ইত্যাদি অতি দূর্লভ সাধনার নিয়ম ও তাছির লিখে দিয়েছেন। সবক সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন, ১২৬ টি তরীক্বার মধ্যে এই তরীক্বার সবক অত্যন্ত গরম এবং ফৌজদারি ভাবাপন্ন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহর ফজলে তাছির হয় এবং সালিক কিছু দিনের ভিতরেই আল্লাহর মা'রিফাত জ্ঞান হাসিল করতে পারে।

'যিক্‌রে জলি' এবং 'অজদ হালের' দলিল সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন[৪৪],

১। যিক্‌রে জেহেরের তারিফ (বর্ণনা) কুরআন শরীফের ৯ম পারার সূরা আল আ'রাফের ২৩ তম রুকুর মধ্যে এই আয়াতে[৪৫]র মর্মে তাফসীরে জালালাইন শরীফের হাশিয়ার (টিকার) মধ্যে যিক্‌রে জেহের সম্পর্কে তার বর্ণনা এই রূপ করেছেন-

السر هوان يخف الصوت بحيث يسمعه المتكلم دون غيره وماعده الجهر لان تقول ذالك اصطلاح الفقهاء با لسر هو كما قالوا الجهر ما يسمعه البعيد'

অর্থাৎ খফি ঐ আওয়াজকে বলে যাহা নিজে নিজে শুনে, আর জেহের ঐ আওয়াজকে বলে যে আওয়াজ দূরবর্তী লোকেও শুনে যেমন আজান। যিক্‌রে জেহের সম্পর্কে আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি।

২। শরহে বেকারার প্রথম খণ্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায় যিক্‌রে জেহেরের বর্ণনা এই লিখেছেন-

' ادنى الجهر اسماع غيره ادنى المخافة اسماع نفسه هو الصحيح '

যিক্‌রে জেহেরের অতি অল্প আওয়াজ উহাকে বলে যে আওয়াজ অন্য লোকে শুনে। খফির আদনা (নিচুতম) আওয়াজ উহাকে বলে যাহা শুধুমাত্র নিজেই শুনে।

---

৪৪. মৌঃ মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী, *মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব'* ঢাকা: সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯, পৃ. ৭৩-৭৭

৪৫. وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (আল-কুরআন, ০৭ : ২০৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩। জালালাইনের কামালাইন তাফছীরের মধ্যে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাকের যিক্‌র আওয়াজ মত দূরবর্তী পৌঁছিবে ঐ স্থানের লতাপাতা রক্ষাদি শুকনো হোক অথবা জীবিত হোক তারা শুনবে এবং হাশরের দিন সাক্ষ্য দিবে যে, আয় পাক পরওয়ার দিগারে আলম তোমার এই বান্দা তোমার যিক্‌র করেছে আমরা নিজ কানে শুনেছি।

৪। দুররে মুখতারের ১ম খণ্ডে এইরূপ লিখেছেন-

فقال اهل العلم ان البحر افقل لانه اكثر عملا ولتعدى فائدته الى السامعين ويؤخذ قلب الذاكر فيجمع همه الى الفكر ويصرف سمعه اليه ويطرد النوم ويزيد النشاط الذكرالجهر فى المساجد مستحب'

নিশ্চয়ই যিক্‌রে জেহের অতি উত্তম, কেননা এই যিক্‌রে জেহের উত্তম একটি কাজ। যাহারা শুনতে থাকে তাদেরও ফায়দা হয়, আর যে করে তারও ক্বলব ঐ দিকে ঝুকে থাকে। আর ক্বলবের চিন্তাও ঐ যিক্‌রের দিকে থাকে আর কানও ঐ দিকে শুনতে থাকে আর ঘুম দূর হয়ে যায় আর দিল খুশীতে ভরে উঠে।

৫। জেহের শব্দের মানে তাফসীরে জালালাইন শরীফের ৯ম পারায় ২৩ রুকুর হাশিয়ার মধ্যে লিখেছেন-

' والجهر ما يسمعه البعيد '

অর্থাৎ জেহের ঐ আওয়াজকে বলে, যে আওয়াজ দূর হতে শুনা যায়। এ ছাড়া তাফছীরে হোছাইনির ৩৭২ পৃষ্ঠায়, 'কছদুচ্ছাবীল ইলা মাওলাল জাসিল' কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায়, তাফছীরে মাওজুনুল কোরানের ২৯২ পৃষ্ঠায়, জেহের শব্দের মানি বোলন্দ আওয়াজ বলে লিখেছেন।

৬। তাফসীরে 'রুহুল বয়ানে' প্রথম খণ্ডে ৪০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

' الذكر برفع الصوت جائزبل مستحب '

উচ্চস্বরে যিক্‌র করা জায়িজ বরং মুস্তাহাব। উক্ত তাফছীরের ৪৫২ পৃষ্ঠায় ছুরায়ে আনফালের মধ্যে লিখেছেন:

' فا الذكر برفع الصوت اشدتا سيراق تمع الخواطر طراح '

উচ্চস্বরে যিক্‌র করার মধ্যে এই উপকার যে, শক্ত দিলের মধ্যে অতিশয় তাছির হয়ে থাকে।

৭। ইমাম আ'যম হযরত আবূ হানীফা (রহ.)-এর কাওলে ফিক্‌হ-র প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিতাব 'মাজাহারীর' মধ্যে লিখেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

'الذكر برفع الصوت مستحب ليغتنم الناس ما ظهر الدين ووصول اثر الذكر الى السامعين فى الدورو البيوت والنحانات اورفق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل وطب ويبس سمع صوته'

অর্থাৎ উচ্চস্বরে যিক্‌র করা মুস্তাহাব ছওয়াব। কারণ, যে লোক দিগকে ইসলাম প্রচার করার জন্য নিশ্চিন্ত করেছেন, আর যাহারা ঐ যিক্‌র শুনেন তাহাদের মধ্যে ঐ যিক্‌রের তাছির পৌঁছে। হয়ত ঐ যিক্‌র যখন কোন বাড়ীতে বা গৃহের মধ্যেও করে অথবা কোন জঙ্গলের মধ্যেও করে, তখন যে সমুদয় সৃষ্ট জীব শুনবে ঐ যিক্‌রের সঙ্গে যিক্‌র করতে থাকবে, আর যে সমস্ত বৃক্ষ-লতাপাতায় শুনবে হাশরের দিন তারা সাক্ষ্য দিবে যে, ঐ ব্যক্তি যিক্‌র করেছে এবং আমরা শুনেছি।"

অজদ হালের দলিল সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন,

১। হিদায়া প্রথম খণ্ডে মধ্যে আছে-

فان ان فيها اوتا وه اوبكى فارتفع بكى ه فانا كان ذاكر من ذكر الجنة اولانار لم يقطعها لا به يدل على زياده الخشوع'

কোন মুমিনের দিলে নামাযের মধ্যে দোজখের আজাবের ভয় এসে অথবা বেহেস্তের শান্তি হৃদয়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে 'আল্লাহ' অথবা 'ওহু' শব্দ করে উঠে অথবা উচ্চস্বরে রোদন করতে থাকে তবুও তার নামাজ বাতিল হবে হবে না। বরং খুশুর সহিত নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

২। কাজিখান কিতাবের ৬৬ পৃষ্ঠায় আছে- ' ولو مشى فى صلواته مقدار صف واحد لم تفسد صلو ته ' (কেহ যদি নামাজের এক কাতার দূরবর্তী পর্যন্ত চলে যায় (অজদের হালে) তবুও তার নামাজ বাতিল হবে না)।

৩। ফতোয়ে আলমগীরি ১০৫ পৃষ্ঠায় আছে-

' قال اللهم وفقنى الحج واغفر لى لا تفسدو '

অর্থাৎ কেহ যদি এতদূরও বলেন যে, আয় আমার আল্লাহ তুমি আমাকে হজ্ব করবার তাওফিক দাও অথবা আমাকে মাফ কর তবুও নামাজ বাতিল হবে না।

৪। শামী কিতাবের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় আছে-

' قال اللهم انى اسئلك الجنة وأعوذبك من النار صرح به لا تفسدالصلوة '

অর্থাৎ কেহ যদি নামাজের মধ্যে শব্দ করে চিৎকার দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে বেহেশত চায় আর দোজখ হতে মুক্তির প্রার্থনা করে তবুও নামাজ বাতিল হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৫। কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

' واذا ذكر الله وجلت قلوبهم '

যখন তাদের সম্মুখে আল্লাহ তা'য়ালার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের ক্বলব উথলিয়ে উঠে (অর্থাৎ তাদের ক্বলব প্রকম্পিত হতে থাকে) মানুষের অন্তরাত্মা যখন কাঁপতে থাকে তখন মানুষের সকল দেহই কাঁপতে থাকে অর্থাৎ তখন অজদ হালের সৃষ্টি হয়।

৬। হযরত মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) 'মরজুল বাহরাইনে' লিখেছেন, 'গোলবা হাল, ছোকর ও অজদ' এই সব হাল সাহাবা কিরামদের মধ্যে ছিল, যেমন হযরত বিল্লাল (রা.) এই আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় (وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) বে এখতিয়ারী হাল হয়ে নাচছিল।

৭। বিদায় হজ্জের সময় যখন ' اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ' নাজিল হল তখন হযরত আবূ বক্বর সিদ্দীক (রা.) হাল হয়ে চিৎকার দিয়ে মাটিতে গড়া গড়ি দিয়ে পরে কাঁদিতে ছিলেন।

৮। হাদিস শরীফের অন্যত্র আছে ' من لا وجد له لا محبة له ' (সিররুল আসরার) যার অজদ হয় না (অর্থাৎ আল্লাহর কথা শুনে যার হাল হয় না) সে মৃত ব্যক্তি স্বরূপ, অর্থাৎ সে বেঁচে থাকতেও মৃত। যিক্‌রে জলি এবং অজদ হালের সংক্ষেপে কয়েকটি দলিল পেশ করা হল। বিস্তারিত জানার জন্য আমার হুযুর কিবলার কিতাব 'যিকরে জলি ও অজদ হালের অকাট্য দলিল' এবং 'মা'রিফাতের হক্ব' ভাল করে দেখে নেবার জন্য অনুরোধ করছি। তা ছাড়াও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবে যিক্‌রে জলি এবং অজদ হালের দলিল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সমালোচনা

এ কিতাব নিয়ে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বড় বড় আল্লাহর ওলী তথা গাযালী (রহ.)-এর মত মাওলানা সাহেবকেও তথাকথিত ফতুয়াবাজ গোঁড়া 'আলিমরা কাফির ফতোয়া দিয়েছিল। এদের এহেন কারণে আল্লাহর ওলী সাময়িকভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফতোয়াবাজদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার 'ইল্‌ম মা'রিফাতের জ্ঞান প্রকাশ করার দরকার কি? কারো কবরে কেউ যাবে না, যার যার কবরে সে সে যাবে। যার যার মা'রিফাত সে সে অর্জন করে নেক।" উল্লেখ্য, পরবর্তীতে ফতোয়াবাজরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে মাওলানা সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারকথা

সৃষ্টির শুরু থেকে 'ইল্‌ম মা'রিফাত যুগে যুগে সৃষ্টিকে তাঁর স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের যোগসূত্র হিসেবে স্বক্রিয় ভুমিকা রাখছে। আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে বর্ণিত আল্লাহর হুকুমকে ইবলিশ শয়তান হযরত আদম (আ.)-এর নাক দিয়ে দেহে প্রবেশ করে ক্বলবে প্রবেশ না করতে পেরে বেরে বের হয়ে আসা, হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকা তৈরী, হযরত মূসা (আ.)-এর আল্লাহর নূর দর্শন লাভ করে অজ্ঞান হয়ে পরা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী মহারাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বোরাক ও রফরফ নামক বাহনের মাধ্যমে মিরাজে গমন করা এবং পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের সাথে দেখা করা এবং মহাবিশ্বের মহাস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শনলাভ ও কথোপকথন ইল্‌ম মা'রিফাত ও 'ইলম তাসাউফের জ্বলন্ত প্রমাণ। মাওলানা সাহেবের 'মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব' কিতাবে উক্ত বিষয়গুলোই ঝংকৃত হয়েছে।

নামকরণের সার্থকতা

'মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব' নামক কিতাবটির পরতে পরতে ইল্‌ম মা'রিফাতের অতি উচ্চাঙ্গের সাধনালব্ধ জ্ঞানের নির্যাসের কালির সুরভিতে মাওলানা সাহেব গ্রন্থটি রচনা করেছেন। যার সুরভিতে লক্ষ লক্ষ আশিকিন, যাকিরিন, সালিকিন তাসাউফ জগতের কাম্য বস্তু লাভের প্রয়াস পেয়েছে। তাসাউফপন্থীদের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান লাভ এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান মাওলানা সহেবের প্রায় দেড় কোটি মুরিদের আল কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর আলোকে সুশৃংখল জীবন যাপন গভীরভাবে আবলোকন করলে মা'রিফাতের পরশ পাওয়া যাওয়ায় কিতাবটির নামকরণ 'মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব' যথার্থ এবং সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

মাওলানা সাহেবের বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব 'মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব' কিতাবের আদিরূপটি হুবহু রেখেছেন এবং কিতাবের পৃষ্ঠাগুলোও আদিরূপ অর্থাৎ নিউজপ্রিন্ট এ রেখেছেন। এটি চিশতিয়া সাবিরিয়া তরীক্বার সালিকগণের পাঠ্যপুস্তক হওয়ায় এতে অশেষ কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

৬. ধূম পিপাসা সর্বনাশা

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সমাজ থেকে মানুষের একটি কু-অভ্যাস বিদুরিত করার জন্য এ ছোট গ্রন্থটি রচনা করেন। মূল গ্রন্থটি মাত্র দশ পৃষ্ঠার হলেও যেকোন ধূমপায়ী এটি মাত্র একবার

Dhaka University Institutional Repository

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য। আমাদের গবেষণায় এমন অনেক তথ্যই দৃশ্যমান হয়েছে।

মানুষের অভ্যাস সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন-

> অভ্যাস দু'রকমের: কু-অভ্যাস এবং সু-অভ্যাস। অভ্যাস অভ্যাস থেকে জন্ম নেয় না। এটা সৃষ্টি হয় কয়েকটি কারণে। অভ্যাস তা সে সু-ই হোক আর কু-ই হোক মানুষের ভিতরে হঠাৎ করে একদিনে শিকড় গজিয়ে বসে না। এর সূত্রপাত হয় ধীরে ধীরে। লতার মত নিরবে বেয়ে ওঠার মত। কু-অভ্যাস সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে প্রধানত কয়েকটি - বংশগতভাবে, কু-সঙ্গে, কু-চিন্তায় এবং জ্ঞানের অজীর্ণতায় ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে আয়ত্ত্বাধীন করতে না পারায় ও পারিপার্শ্বিকতায়।[৪৬]

অভ্যাস সৃষ্টির পিছনে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তা মাওলানা সাহেবের এ লেখনীটি পাঠ না করলে এত সহজে অনুধাবন করা খুবই দূরহ হতো। ঠিক এমনিভাবেই তিনি ধূমপায়ীদের ধূমপিপাসার কু-অভ্যাসকে সু-অভ্যাসে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অভিজ্ঞ ধূমপায়ীদের নিকট কিছু শব্দ খুবই জনপ্রিয় যেমন : 'যমটান' ও 'সুখটান'। এ 'যমটান' ও 'সুখটান' এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মাওলানা সাহেব বলেন-

> "সোয়া টানে বিড়ি খাও
> দ্রুত বেগে গোরে যাও।"[৪৭]

ধূমপানের অপচয়ের আলোচনায় তিনি বলেন, ধূমপানে অনেক বড় বড় ক্ষতির মধ্যে আর্থিক ক্ষতিটাও কম নয়, প্রতিটি অপচয়কারীই শয়তানের ভাই। যে জিনিসে কোন উপকার নেই শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি, বুঝে শুনে তা করা একটা বিরাট বোকামী ছাড়া আরকি? লোকে বলে ধূমের পয়সা মানে সিগারেটের পয়সা নাকি ভূতে জোগায়। এমনি কিন্তু ভাত পায় না। বউয়ের পরনের কাপড় নেই। ধূমপানের বেলায় টন্‌টনে। প্রতিদিন ১৫টি সিগারেট পান করলে প্রতিমাসে ৪৫০ টি সিগারেট হয় এবং বছরে হয় ৫৪০০ টি। বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়লে অথবা মেজাজ চড়ে গেলে সিগারেট যে কয়টা যায় তারতো সীমাই থাকেনা। এভাবে ১২ বছরে সিগারেটের সংখ্যা দাড়ায় ৬৪,৮০০ টি এবং সস্তা দামের সিগারেটের মূল্য ধরলে কত হয় তা আমি ঠিক জানিনা। এভাবে পঞ্চাশ বছর সিগারেট পান না করলে একটা গরীব মানুষ এ পয়সা দিয়ে অনেক কিছুই করতে পারতো। ছোট ক্ষতিকে ছোট যে ভাবে, সে অনেক বড় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর ৫৪০০ বার যদি ফুসফুসকে আঘাত করা যায়, বেচারা কেমন করে ভাল থাকবে। ধূমপানে শুধু ধূমের উপকরণ যোগাতে যে পয়সা ক্ষতি হয় তা-ই না বরং যে

---

৪৬. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *ধুম পিপাসা সর্বনাশা*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ১৯

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

অসুখ সৃষ্টি হয় এবং তা চিকিৎসা করতে যে পয়সা লাগে এ খরচটাওতো ধূমপানে খরচের সঙ্গেই যোগ দিতে হবে। এছাড়া মুরুব্বির আড়ালে গিয়ে ধূমপান করতে যে সময় ব্যয় হয় সেটাও জীবনের অপচয় সময় বলে গণ্য করতে হয়। ধূমপায়ীদের সবচেয়ে বড় বিপদ হয় মুরুব্বির সঙ্গে কোথাও অবস্থানকালে মুরুব্বি সাহেব পথটা ছাড়েনও না ধূমটা পান করাও যায় না। কি বিপদই না হয়ে পড়ে। বিশেষ করে কোন নৌকায় বা যানে মুরুব্বির সন্নিকটবর্তী হয়ে বসলে ধূমপায়ীর কি যে বিপদ হয়। ওদিকে ধুমপান করতে না পারায় পেট ফুলে যায়। এদিকে মুরুব্বি তো চেয়ে থাকে তখন মনে হয় মুরুব্বিটা সরলেই বাঁচতাম বা কোথাও দৌড়ে পালিয়ে সিগারেটে একটা দম দিতে পারলে বাঁচতাম।"[৪৮]

সারকথা

মাওলানা সাহেব এ কিতাবের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন কি উপায়ে ধূমপান করলে কোন ক্ষতি হয়না এবং কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করা যায় তার একটি অব্যর্থ উপায় বলেছেন। ক্ষতি না হওয়ার উপায় শিখতে যেয়ে অনেক অভিজ্ঞ ধূমপায়ী ধূমপানের অভিশাপ থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করেছেন এমন অসংখ্য প্রমাণ গবেষণায় পাওয়া যায়।

নামকরণের সার্থকতা

মাওলানা সাহেব গ্রন্থটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধূমপিপাসাকে একটি কু-অভ্যাস হিসেবে প্রমাণ করেছেন এবং কিভাবে ধূমপান মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থিক নাশ অর্থাৎ সর্বনাশ করে তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তুলে ধরে ধূমপায়ীকে সে সর্বনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং কিতাবটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট সাদরে গৃহীত হওয়ায় এর নামকরণ 'ধূম পিপাসা সর্বনাশা' যথার্থ এবং সার্থক হয়েছে।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি করেন মাওলানা সাহেবের বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের একমাত্র সহেবজাদা এবং প্রধান খলিফা ও মাওলানা সাহেবের স্নেহধন্য নাতী মুহাম্মাদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী । পরিকল্পনাটিতে তিনি বেশ কয়েকটি সিগারেটের ভয়ঙ্কর আগুন থেকে নির্গত ধোয়া কিভাবে ধূমপায়ীর ফুসফুসকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে যা নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং বাম পাশে কিভাবে চারটি ফুসফুসের আটশত কোটি ছাকনি ব্যবহার করে ধূমপান করা যায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রচ্ছদটি মুহাম্মাদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী সাহেবের পরিকল্পনায় প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক অংকন করেছেন।

---

৪৮. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *ধুম পিপাসা সর্বনাশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

৭. মহা-ভাবনা

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে মহাবিশ্বের মহাস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ (The World Challenge) করে 'মহা ভাবনা' (A Philosophy of Astronomy) নামক কিতাবটি বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে বিজ্ঞানী মহলে নতুন ভাবনা সৃষ্টি করে নাস্তিকদের মাথা নত করার মাধ্যমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চির উন্নত মম শিরের প্রমাণ দিয়েছেন মাওলানা সাহেব।

এ কিতাবটিতে তিনি বিজ্ঞানের থিওরিসমূহকে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যবহার করেছেন। এখানে এমন অনেক জটিল থিওরি রয়েছে যার অনুসিদ্ধান্তগুলো বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষেই ব্যাখ্যা করা দূরহ ব্যপার। তাই আমাদের গবেষণা মাওলানা সাহেবের গবেষণা সক্ষম মস্তিষ্কের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যা একটি বিরল ঘটনা। আমরা এখানে মহাভাবনা কিতাবের সেই বিষয়গুলো নিয়ে স্বচিত্র আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

আমরা সত্যিই বিস্মিত হয়েছি মাওলানা সাহেব জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শন (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), মনোবিজ্ঞান (Psychology) , ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি জটিল ভাবনাগুলোকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে মহা ভাবনায় রূপান্তর করে মহাস্রষ্টার মহাক্ষমতা, বিশালতা ও অস্তিত্বের প্রামণ করেছেন। গবেষণায় আমরা জানতে পেরেছি দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, গবেষক ও প্রকৌশলীগণের নিকট আধুনিক জ্যোতিশস্ত্রের দূর্লভ তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে ব্যপকভাবে সমাদৃতি হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ মাসে ঢাকার মিরপুরে অধ্যাপক সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) বাংলাদেশ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়ার প্রায় ২০০ গবেষকের গবেষণায় যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে আল-হিক্মা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক চেয়ারম্যান আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সিকন্দর আলী ইব্রাহিমী কর্তৃক স্বর্ণপদক লাভ করেন।

মাওলানা সাহেব মহাভাবনা কিতাবের প্রথম অধ্যায় কবির ভাষায় বলেন-

"গভীর নিশীথে কে যেন ডাকিছে অনন্তের পথ হতে,
বিশালতা মাঝে হারিয়েছে কভু? থেকো না দাঁড়িয়ে পথে।
আপনারে এত জড়ায়ে রেখে, আপন হারিয়ে গেলে,
সংকীর্ণতায় আপনারে বেঁধে, কত ধন গেলে ফেলে।
এত কাছাকাছি কার কাছে র'লে, যে ছিল আপনজন,
একবার জেগে দেখিল না তারে, এত ছোট ছিল মন!
হারায়ে দেখ অনন্তের পথে, আপনারে ফিরে পাবে,
জীবন-প্রদীপ নিভে গেল, বল, কার কাছে ফিরে যাবে।"[৪৯]

---

৪৯. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাভাবনা*, মানিকগঞ্জঃ সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক মাওলানা সাহেব উপরের পংক্তিগুলোর মাধ্যমে ভাবনাভুলো মানুষকে মহাভাবনার ডাক দিয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "জ্ঞান জ্ঞান ঘ্যান ঘ্যান না করে ধ্যান করতে শিখো।"

কিতাবের শুরুতেই মানবজাতিকে তিনি গভীর ভাবনায় প্রবেশ করিয়ে বলেন[৫০], মহাসৃষ্টির তুলনায় মানুষ কতটুকু?

এ বিশ্বে মানুষই একমাত্র তার স্রষ্টাকে নিয়ে যত দুর্বোধ্য ভাবনা ভাবে। তাহলে প্রথমেই মানুষ কতটুকু, তার ভাবনাশক্তি কতটুকু, মানুষের আসল পরিচয় কি এবং তার ভাবনার সত্ত্বা মহাস্রষ্টার পরিচয় কি, তা অন্তত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য জানা দরকার।

মানুষ ছোট হোক বা বড় হোক, মহাজ্ঞানী হোক বা ক্ষুদ্র জ্ঞানী হোক, সে নিজেকে যা ভাবে বা নিজেকে যতটুকু যোগ্য মনে করে, সেকি আসলে তা-ই! মানুষের জ্ঞানের দৌড় এবং যোগ্যতার সীমার পরিমাপ জানতে হলে মহাবিশ্ব সম্মন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হয়। মহাবিশ্ব নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষের কোন অস্তিত্বই নেই। তাই প্রথমে সংক্ষিপ্ত ভাবে মহাবিশ্বের একটি আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞানের মতে আমাদের মাটির পৃথিবীর পরিধি বা বেড় হচ্ছে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) মাইল। এর ব্যাস ৮,০০০ (আট হাজার) মাইল এবং ওজন হচ্ছে ছয় এর পরে একুশটি শূন্য বসালে যা হয় তাই অর্থাৎ ৬×১০^{২১} বা ৬,০০০০০০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০ ('ছ' কোটি কোটি কোটি) টন। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। এর ব্যাস আট লক্ষ ছে'ষট্টি হাজার মাইল এবং এর ওজন পৃথিবীর ওজনের চেয়ে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ বেশী, সুর্যের চারদিকে রয়েছে ন'টি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। সূর্য তার ন'টি গ্রহ ও ৪৪টি উপগ্রহ নিয়ে সৌরজগত গঠন করেছে।[৫১]

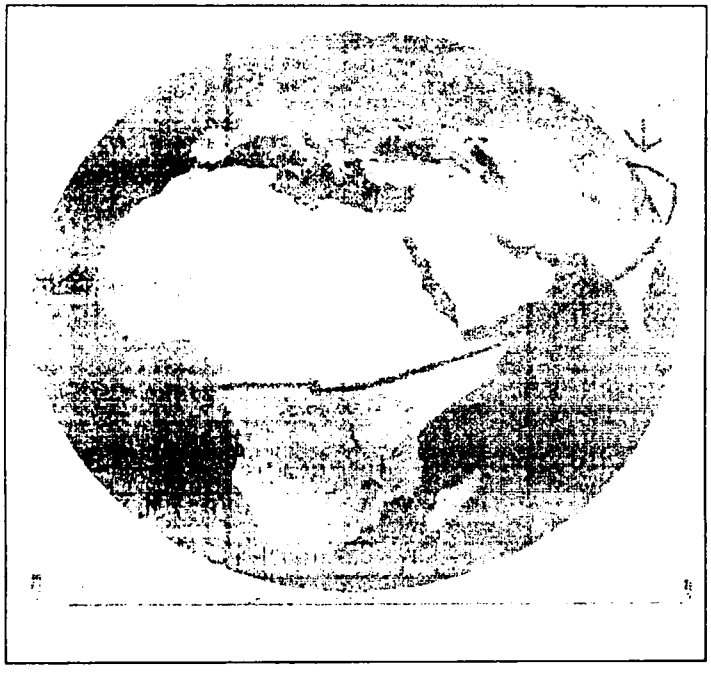

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৫১. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

সৌরজগতটি আবার একটি মহাজগতের ভেতর রয়েছে। এই মহাজগতটির নাম হচ্ছে ছায়াপথ (Milky Way)। তারাভরা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মেঘমালার ন্যায় কুয়াশাচ্ছন্ন একটা পথের মত দেখা যায়। একেই ছায়াপথ বা মিল্কি ওয়ে বলা হয়। ঐ যে মেঘের মত বা কুয়াশার মত দেখা যায়, ওগুলো আসলে মেঘ বা কুয়াশা নয়, ওগুলো হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্রের বিপুল সমাবেশ। কল্পনাতীত দূরত্বে রয়েছে বলে ঐ সব নক্ষত্র গুলোকে মেঘের মত মনে হয়। এই ছায়াপথটিকে একটি বিশ্ব বলা হয়েছে। এই বিশ্বটি এতই বিশাল যে কল্পনা করতেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে।

[চিত্র : ছায়াপথ][৫২]

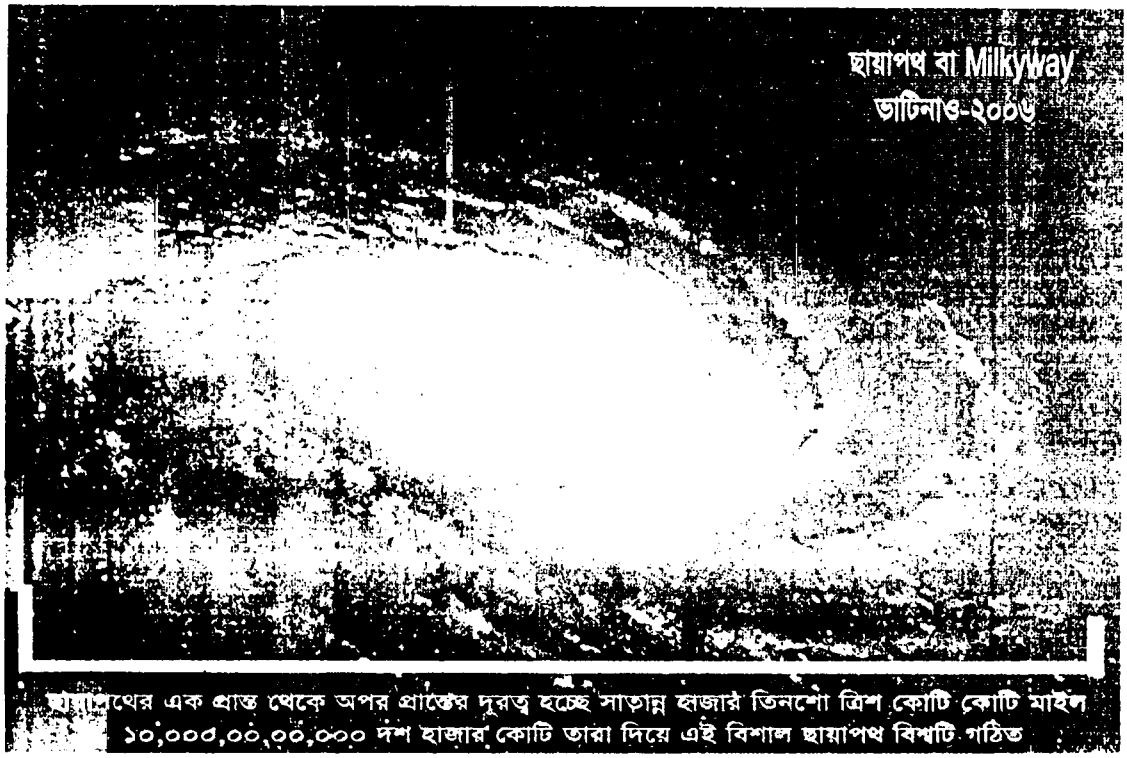

প্রায় ১০×১০[১১] বা ১০,০০০,০০,০০,০০০ দশ হাজার কোটি নক্ষত্র দিয়ে এই বিশাল ছায়াপথ বিশ্বটি গঠিত। এ ছায়াপথটি এতই বিশাল যে, এর একপাশ থেকে অন্য পাশের দূরত্ব হচ্ছে ৯,৭৫,০০০ (ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) আলোক বছর। আলোক বছর কাকে বলে? মহাবিশ্বের বিশাল দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য একক হিসাবে আলোক বছর বা আলোক বর্ষ বা লাইট ইয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আলো এক সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল পথ অতিক্রম করে। সহজ কথায়, এক বলতে এক সেকেন্ড সময় লাগে, এই এক বলতে যে সময়টুকু লাগে, তাতে আলো এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে। এই গতিতে আলো এক বছরে পাঁচ লক্ষ অষ্টয়াশি

৫২. মুহাম্মদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী সম্পা. *মাসিক ভাটিনাও*, "মরহুম মুর্শিদ কিবলার কিতাব মহা ভাবনা থেকে" প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

হাজার কোটি মাইল রাস্তা অতিক্রম করে। আলো এক বছরে যত মাইল রাস্তা অতিক্রম করে তাকে আলোক বছর (খরমযঃ ণবধৎ) বলা হয়। ছায়াপথের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছতে সময় লাগে ৯,৭৫,০০০ (ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) আলোক বছর। অর্থাৎ ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব হচ্ছে সাতান্ন হাজার তিনশো ত্রিশ কোটি কোটি মাইল, অংকে সংখ্যাটি কি রকম বিরাট দাঁড়ায় : ৫৭,৩,৩০,০০০০০০০,০০০০০০০ বা ৫৭.৩৩×১০[১৭]।

এই ছায়াপথটিকে একটি বিরাট বিশ্ব বলা হয়েছে। সূর্য তার গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে এই বিশাল ছায়াপথের ভেতরে আছে। সূর্য এই ছায়াপথের কেন্দ্র হতে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোক বছর দূরে রয়েছে। এই ছায়াপথটিকে আমাদের প্রতিবেশী বিশ্ব বলা হয়।

ছায়াপথ বিশ্বের বিশালতা বর্ণনায় মাওলানা সাহেব বলেন, প্রায় দশ হাজার কোটি, কোন কোন বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বিশ হাজার কোটি নক্ষত্র দিয়ে ছায়াপথটি গঠিত। ছায়াপথটির ভেতরে এত বড় বড় তারা রয়েছে যে, তাদের বিশালতার কথা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। আমাদের মাটির পৃথিবীর পরিধি বা বেড় হচ্ছে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) মাইল এবং ব্যাস হচ্ছে আট হাজার মাইল। সূর্য মাটির পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। একশো ত্রিশটি পৃথিবী পাশাপাশি জোড়া দিলে সূর্যের এক পাশ থেকে অপর পাশে পাড়ি দেয়া যায়। সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড় নক্ষত্র ছায়াপথে রয়েছে।[৫৩]

চিত্র : ১৩০ টি পৃথিবী।[৫৪]

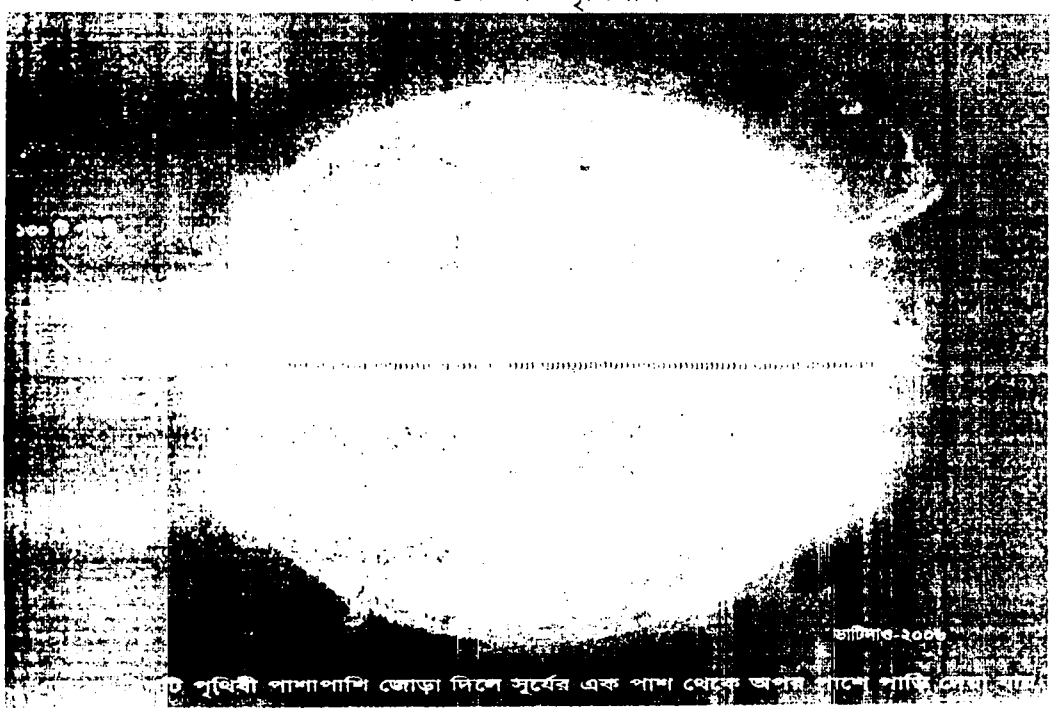

৫৩. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৫৪. মুহাম্মদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী সম্পা. *মাসিক ভাটিনাও*, "মরহুম মুর্শিদ কিবলার কিতাব মহা ভাবনা থেকে" প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

বেটেলজিওস বা আর্দ্রা নামে একটি নক্ষত্র রয়েছে যেটি আমাদের পৃথিবী থেকে একশো নব্বই আলোক বছর দূরে অবস্থিত এবং এর ব্যাস হচ্ছে ২১×১০^{৭} বা ২১,০০,০০,০০০ (একুশ কোটি) মাইল। কয়েক কোটি সূর্য এর ভিতরে পুরে রাখা যায়। অমিক্রনসিটি (Omicroncity) নামে একটি অতিকায় দানব নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার ভিতরে ৩,০০,০০,০০০ বা ৩×১০^{৭} (তিন কোটি) সূর্যকে ঢুকিয়ে রাখা যায়।[৫৫]

মহাপ্রচণ্ড গতি সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন, "কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছতে প্রায় তিন/চার হাজার কোটি আলোক বছর সময় লাগে। মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি গ্রহ নক্ষত্র প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে এবং মহাবিশ্বের মহাপ্রচণ্ড গতির সাথে তাল মিলিয়ে মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একই দিকে ছুটে চলেছে। কোন কোন নক্ষত্র প্রতি সেকেন্ডে চব্বিশ/পঁচিশ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। বিজ্ঞানীরা আরও অসংখ্য নীহারিকা বিশ্বের সন্ধান পেয়েছেন, যারা মহাপ্রচণ্ড বেগে এক অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। কোন কোন নীহারিকা বিশ্ব প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি এবং তার গতিবেগ আবিষ্কার করে হাব্‌ল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। সেটি হচ্ছে, কোয়াসারের (Quasar) লোহিত অপসারণ বেগ যা প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার চারশো মাইল অর্থাৎ এর গতি আলোর গতির কাছাকাছি।[৫৬]

বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ বলেছেন, প্রায় এক হাজার কোটি বছর যাবৎ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, মহাবিশ্ব প্রায় পাঁচশো কোটি বছর যাবৎ সৃষ্টি হয়েছে। এখন মোটামুটি হিসেব করে দেখা যাক, এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার চারশো মাইল প্রতি সেকেন্ডে যার চলার গতি হয়, পাঁচশো কোটি বছরে সে কত মাইল রাস্তা অতিক্রম করে? এভাবে এক হাজার কোটি বছরেইবা কত মাইল রাস্তা সে অতিক্রম করে![৫৭]

একটি অতি আশ্চর্য ঘটানা যা মহাবিশ্বে মহাসৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি ঘটে চলেছে। সে হচ্ছে মহাবিশ্বের কোটি কোটি নীহারিকা বিশ্ব, যার প্রত্যেকটার ভেতর প্রায় দশ হাজার থেকে বিশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। সৃষ্টির পর থেকেই এরা মহাপ্রচণ্ড গতিতে এক অজানা লক্ষ্যের দিকে বিরামহীনভাবে ছুটে চলেছে। বিজ্ঞানীরা ভেবে হতবাক হয়ে বলেন,

---

৫৫. মুহাম্মদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী সম্পা. *মাসিক ভাটিনাও*, "মরহুম মুর্শিদ কিবলার কিতাব মহা ভাবনা থেকে" প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৫৬. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৫৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মহাবিশ্ব এইসব কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে একদিকে শুধু ছুটেই চলেছে। আর কোন দিন ফিরে আসেনি।[৫৮]

সৃষ্টির পর থেকে ছুটে চলতে চলতে কত কোটি কোটি মাইল রাস্তা পার হয়ে গেছে এবং এরা কবে কোথায় কোন সীমানায় গিয়ে পৌঁছবে এবং মহাকাশের মহাশূন্যতায় কোনদিন পাড়ি জমাতে পারবে কি না আজও কোন বিজ্ঞানী সঠিক করে বলতে পারেননি। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেন, প্রতিটি নীহারিকা বিশ্বের মধ্যে যেমন একটি মহাকর্ষের টান (Gravitation) অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে একটি মহাবিকর্ষের ঠেলা (Cosmic Repulsion) অর্থাৎ প্রসারিত হওয়ার প্রভাবও রয়েছে। এভাবে আইনষ্টাইনের মতে মহাবিশ্ব শুধু একদিকে ছুটেই চলছে না, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সে প্রসারিতও হচ্ছে। এবার ভাবতেও মাথা ঝিম ধরে আসে যে, মহাকাশের অনন্ত শূন্যতা যে কত বড় ও কতই বিশাল এবং সীমাহীন তার পরিসর তা কিছুতেই কল্পনায় আনা যায় না। অনন্ত আকাশের বুকে এইসব নীহারিকা বিশ্বরা এবং তাদের গ্রহ-নক্ষত্র নিশীথ রাতের গৃহত্যাগী দরবেশের মত। যারা সংসার বিরাগী হয়ে ঘর থেকে এই যে বেরিয়ে যায় সমস্ত মোহমায়া পরিত্যাগ করে, কোনদিন আর ঘরে ফিরে আসে না, আমরণ বন থেকে বনান্তরে অজানা উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে বেড়ায়। আরও একটি কথা এই যে, এইসব মহানীহারিকা বিশ্বরা আয়তনে এত অতিকায় থাকা সত্ত্বেও একটির সাথে আর একটি ঘিঞ্চি হয়ে অবস্থান করছে না। একটা থেকে অন্য একটি নীহারিকা বিশ্ব কোন কোন ক্ষেত্রে দু'শ' থেকে আড়াই শ' কোটি আলোক বছর দূরে অবস্থান করছে।

একটি উদাহরণ দিলে মহাশূন্যে নীহারিকা বিশ্ব গুলোর অবস্থান সম্বন্ধে কিছু আঁচ করা যাবে। প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর। এই মহাসাগরটি প্রায় সাড়ে বার হাজার মাইল লম্বা, সাড়ে চার হাজার মাইল চওড়া এবং আট মাইল গভীর। এই মহাসাগরের দৈর্ঘ্যের দু'প্রান্তে দু'টো নৌকা রাখলে যে দূরত্বে অবস্থান করে, এই মহাশূন্য সাগরের বুকে নীহারিকা বা ছায়াপথগুলো ঐ নৌকার মত দূরত্বে অবস্থান করছে। এবার কল্পনা করে দেখুন, দশহাজার কোটি মতান্তরে বিশ হাজার কোটি নীহারিকা বিশ্ব, আর প্রত্যেকটি বিশ্বে রয়েছে আবার দশ হাজার কোটি অতিকায় নক্ষত্র, তারা অনন্ত মহাশূন্য সাগরের অতি নগণ্য জায়গা দখল করে অবস্থান করছে। মহাশূন্যে কত সীমাহীন জায়গা খালি পড়ে আছে। আগেই বলা হয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাসাগর। এই মহাসাগরটি বিশাল পানির মহাসমারোহে ভরে আছে। এই মহাসাগরের একপ্রান্তে একটা টিকটিকির ডিমের খোসাকে নৌকা মনে করে ভাসিয়ে দিলে এই মহা জলধির বুকে কতটুকু জায়গা জুড়ে ভাসতে থাকে? সমগ্র মহাসাগরের বিপুল আয়তন পানির তুলনায় এই ডিমের খোসাটি কতটুকু! একেবারেই নগণ্য।

---

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

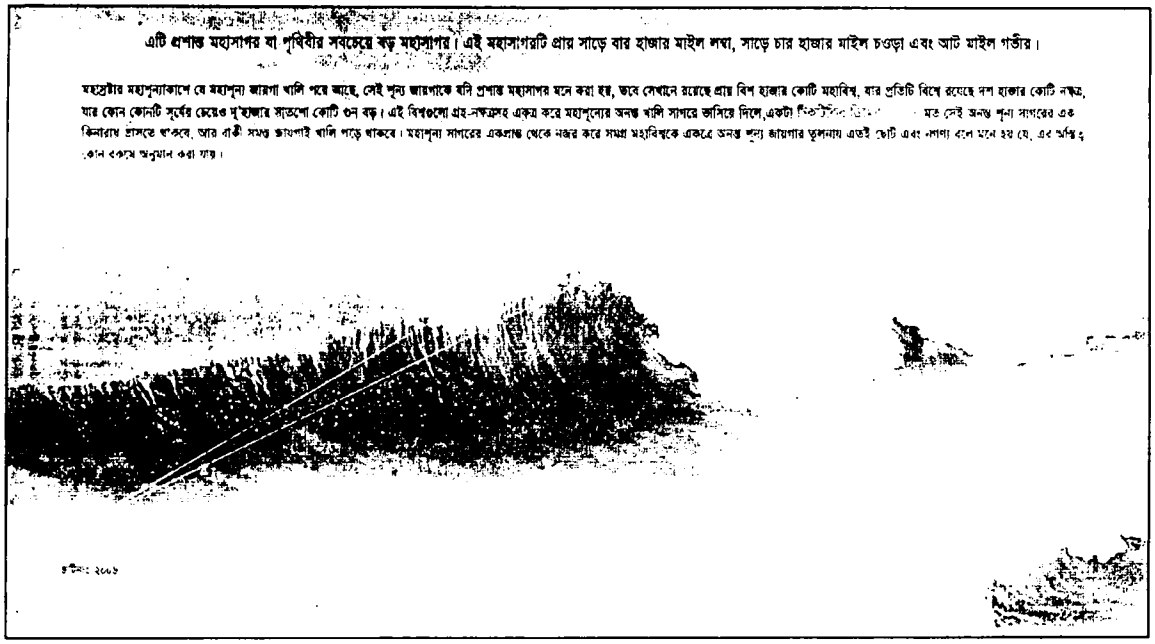

মহাস্রষ্টার মহাশূন্যাকাশে যে মহাশূন্য জায়গা খালি পরে আছে, সেই শূন্য জায়গাকে যদি প্রশান্ত মহাসাগর মনে করা হয়, তবে সেখানে রয়েছে দশ হাজার কোটিরও বেশী মহাবিশ্ব, যার প্রতিটি বিশ্বে রয়েছে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র, যার কোন কোনটি নক্ষত্র সূর্যের চেয়েও দু'হাজার সাতশো কোটি গুণ বড়। এই বিশ্বগুলো গ্রহ-নক্ষত্রসহ একত্র করে মহাশূন্যের অনন্ত খালি সাগরে ভাসিয়ে দিলে, একটা টিকটিকির ডিমের খোসার মতই সেই অনন্ত শূন্য সাগরের এক কিনারায় ভাসতে থাকবে, আর বাকী সমস্ত জায়গাই খালি পড়ে থাকবে। মহাশূন্যে সাগরের একপ্রান্ত থেকে নজর করে সমগ্র মহাবিশ্বকে একত্রে অনন্ত শূন্য জায়গার তুলনায় এতই ছোট এবং নগণ্য বলে মনে হয় যে, এর অস্তিত্ব কোন রকমে অনুমান করা যায়। আবার দশ হাজার কোটি নক্ষত্রভরা এক একটি নীহারিকা বিশ্ব থেকে নজর করলে অন্য একটি বিশ্বকে এতই ক্ষুদ্র মনে হয় যে, তার অস্তিত্ব কোন করমে ধরা পড়ে। আমাদের প্রতিবেশী বিশ্ব অর্থাৎ ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে দৃষ্টিপাত করলে সূর্যকে একটা সূঁচের মাথা পুড়িয়ে লাল করলে যেমন দেখা যায়, তেমন একটা সুক্ষ্ম আলোর বিন্দুর মত মনে হয়। ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে তাকালে সূর্যের কোন অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।"

মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষ কতটুকু মহাবিস্ময়! এ প্রসঙ্গে মাওলানা সাহেব বলেন-

> এই মহাবিশ্বের এবং মহাশূন্যকাশের বিশালতার তুলনায় মানুষ কতটুকু? মহাশূন্যের তুলনায় মহাবিশ্ব কতটুকু জায়গা দখল করে আছে? মহাবিশ্বের তুলনায় দুনিয়ার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড় সূর্যের কোন অস্তিত্বই নেই। সূর্যের তুলনায় তের লক্ষ গুণ ছোট পৃথিবী কতটুকু? এই একেবারেই নাই-র মত পৃথিবীর মধ্যে আবার কয়টি মহাদেশ, একটি মহাদেশে আবার কয়েকটি ক্ষুদে দেশ, তার মধ্যে আবার চীন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত। আবার ভারতবর্ষেরই অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বিভাগ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ইত্যাদি। এই বিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

আবার ক্ষুদ্র একটা শহর এই শহরে একটা বাড়ী, তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ঘর, তার মধ্যে একটা ক্ষুদে জীব মানুষ। এই মানুষের আরও ক্ষুদ্র একটা পিটপিটে মাথা, যে মাথাও আবার ভাবনায় চিন্তায় ইন্দ্রিয় চালনায় কতইনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। সেই মাথার এক কোণে একটুখানি মগজ, সেই মগজের এক অন্ধকার কোণে চিন্তাশক্তির সূক্ষ্মতম একটি কেন্দ্র, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন অনুমানই করা যায় না এবং দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা বলেছেন, "এই চিন্তাশক্তি কোথা থেকে যে আসে আমরা তা বলতে পারি না।[৫৯]

[চিত্র: মানুষ কতটুকু][৬০]

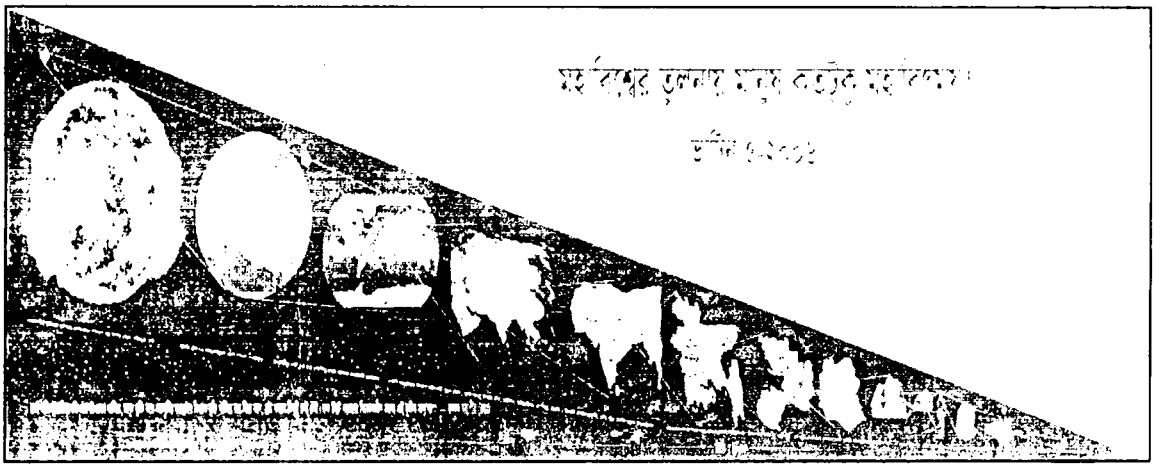

সেই অতি ক্ষুদে চিন্তাশক্তি প্রাণপণ বেগে খাটিয়ে, মানুষ যুক্তি করে মহাসৃষ্টির মহাস্রষ্টার বিপক্ষে যুক্তি খাটিয়ে রায় দিয়ে বলে, স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই। কত উদ্ভট বল্গহারা বিবেচনাহীন মন্তব্য এই কুটিল মানুষের!!

মহান আল্লাহ সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন[৬১], কে সেই মহা পরাক্রমশীল?

অনন্ত মহাশূন্য সাগরে মহাবিশ্বের দশ হাজার কোটি মহাবিশ্ব একত্র করে, একত্রে একটি ডিমের খোসার মত অনন্ত শূন্য সাগরের এক কোণায় ভেসে আছে। বাকী সমস্ত সাগরটাই শূন্য পড়ে আছে। এই মহাবিশ্ব এবং অনন্ত শূন্য জায়গা বিশ্বের কেউ সৃষ্টি করেছে বলে কেউ দাবি করে না। কেউ বলে না এই মহাবিশ্ব, আমার সম্পত্তি এবং এর উপর আমার একচ্ছত্র আধিপত্য এবং আমিই বা আমরা এই মহাবিশ্ব, অনন্ত শূন্য জায়গা সৃষ্টি করেছি। একমাত্র এক পরাক্রমশালী মহাশক্তি আছেন যিনি দাবি করে বলেছেন, "আল্লাযী লাহু মুলকুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ' (আল-কুর'আন)। এ মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছি আমি এবং এর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা আমার। তিনি আরও দাবি করে বলেছেন, *'লিল্লাহি মাফিছ ছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ'*।[৬২] আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে (দৃশ্য-অদৃশ্য) সবই আমার (আর কারও নয়)। তিনি আরও বলেছেন,

---

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৬০. *মাসিক ভাটিনাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৬১. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.), *মহাভাবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৬২. لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ (আল-কুর'আন, ৩১ : ২৫)

Dhaka University Institutional Repository

"ওয়াছিয়া কুরছিয়্যুহুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ"।[৬৩] একেবারে শেষে তিনি বলেছেন, অনন্ত শূন্যতা এবং দশ হাজার কোটি মহাবিশ্ব আমার কুরছির (বসার আসনের) নীচে চারটি পায়ার আবেষ্টনির ভেতরে আছে এবং আমার কুরছিটি (আসনটি) অসীম শূন্যতায় এবং মহাবিশ্বের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এসব কিছুর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁর মোটেই বেগ পেতে হয় না। তাই তিনি আরও বলেছেন, *"ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফাজুহুমা ওয়া হুয়াল আ'লীউল আজীম"*[৬৪]- এই মহাসৃষ্টি হেফাজত করতে আমার মোটেই বেগ পেতে হয় না অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনি উচ্চ, সুমহান এবং সবার উপরে বড় সর্বশক্তিমান।

উপরের আলোচনায় মহাভাবনা কিতাবের মূল বিষয়গুলোকে আমারা কিছু চিত্র সংযোজনের মাধ্যমে সূধী পাঠক মহলের নিকট তুলে ধরে মাওলানা সাহেবের দূরদৃষ্টির বিশালতা সর্ম্পকে অবহিত করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

স্বর্নপদক প্রদান

মাওলানা সাহেবকে স্বর্ণপদক প্রদান সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ সিকন্দর আলী ইব্রাহিমী সাহেব বলেন[৬৫], "মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত এই আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ যখন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তার পাণ্ডিত্বের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য উম্মোচন করে তখন আমরা তাকে বরণ করি বিশেষ সম্মানে। এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন বাংলাদেশের এক স্বনামধন্য মরদে মুজাহিদ মানিকগঞ্জের এক প্রতিভাবান মহাপুরুষ অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও গবেষক আধ্যাত্বিক মহাসাধক কুতুব-উল-আকতাব অধ্যাপক (অব) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহ.)।

তিনিই ভাবলেন-আমি কে, আমি কোথেকে এসেছি আর কোথায় যাব। কি উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যে উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমি কতটুকু করতে পেরেছি। পৃথিবীর এই চাঁদ সুরুজ গ্রহ, নক্ষত্র, বিশ্ব, মহাবিশ্ব কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব কার সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত কার সৃষ্টি, কেন সৃষ্টি, কিভাবে সৃষ্টি, কখন থেকে সৃষ্টি, কি প্রয়োজনে সৃষ্টি, এসব তাঁর চিন্তাভাবনা। তাঁর চিন্তা ভাবনা হল মহাবিশ্ব অসীম। এই অসীমের তুলনায় ক্ষুদ্র মানুষের কি এমন অস্তিত্বেইবা আছে। পৃথিবীর পরিধি হল ২৫,০০০ মাইল। আর সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। এর ব্যাস ৮,৬৬,০০০ মাইল। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। পৃথিবী থেকে সৌর জগতের গ্রহ

---

৬৩. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (আল-কুর'আন, ০২ : ২৫৫)

৬৪. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (আল-কুর'আন, ০২ : ২৫৫)

৬৫. ড. মুহাম্মদ সিকন্দর আলী ইব্রাহিমী, "স্বর্ণপদক প্রদান : একটি বিরণ সম্মান", *মাসিক ভাটিনাও*, প্রাগুক্ত, সংখ্যা- মে ২০০৬, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

নক্ষত্র আরও বহুগুণে বড় যা আমাদের ভাবনায় সীমানার বাইরে। এ সমস্ত সৌর জগতের প্রচণ্ড গতি এক মহা ব্যাপার।

এই মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষ কতটুকু জায়গা দখল করে আছে। আবার সূর্যের তুলনায় ১৩ লক্ষ গুণ ছোট পৃথিবীইবা কতটুকু । এই একেবারেই নাই এর মধ্যে আবার কয়েকটি মহাদেশ আবার এই মহাদেশের মধ্যে আছে কয়েকটি দেশ। চীন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত, সৌদি আরব, কত সমুদ্র নদী, কত পাহাড় পর্বত পৃথিবীর মধ্যে আছে কত এলাকা কত কিছু।

এসমস্ত এলাকায় যা আছে কত বাড়ীঘর আবার এ সমস্ত বাড়ীঘরেই বা আছে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ গাছপালা আর পাহাড় পর্বত আর মানুষ গরু জীব জন্তু। বিরাট বিশাল গাছপালা আবার মানুষের আছে হাত, পা, পেট, পিষ্ট, নাক , কান, গলা। এরকম আছে অনেক।

এই মস্তিকের মধ্যে আছে কোষ আরও কত কি? আবার এই জীব কোষ থেকে জীবন সরল আর যত কিছু তার বিচার বিশেষণ করলে এবং সব কিছু বিচার বিশেষণ করলে দেহতত্ত্বের যত কিছু কথা সমানে আসবে তা Analysis করলে যে কত কিছু সামনে আসবে তার কোন ইয়ত্তা পাওয়া যাবেনা। এসব বলতে গেলে আরও কত জগতের সন্ধান পাওয়া যাবে। তার কোন কুলকিনারা পাওয়া যাবে না। এইভাবে মহা বিশ্বের এই যে, কোটি কোটি গ্রহ, নক্ষত্র বা তারকা, ছায়াপথ আরও যত কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে তার কোন হিসাব নিকাশ মানুষের চিন্তাশক্তিরও বাইরে চলে যাবে। এইভাবে যে কোন সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হওয়ার পিছনে অবশ্য একটি পরিকল্পনা থাকবে। মহাবিশ্বের এক একটি পালসের সৃষ্টির পিছনে একটি অত্যন্ত উচ্চ মানের সুনিপুণ পরিকল্পনা রয়েছে। সমগ্র মহাবিশ্ব এক অতি প্রচণ্ড গতিতে অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলছে অনন্তের দিকে এই অনন্তের পথে কোটি কোটি বছর চলতে চলতে কেহ কারও সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় না। যদি যেত তাহলে সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শেষ হয়ে যেত।

মানুষ মনে করে মহাসৃষ্টির তুলনায় মানুষ একটি অত্যান্ত ক্ষুদ্রপ্রাণী। এত ক্ষুদ্র যে, সে তার ধারণাতেই আনতে পারেনা। কাজেই অত্যন্ত সীমিত এই প্রাণী বিশাল অসীম আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক ধারণাই আনতে পারেনা। মহাসৃষ্টির মধ্যে মানুষ আসলে রহস্যাবৃত আর্শ্চায্য সৃষ্টির মধ্যে এক সসীম জীব। সে তার সসীম জ্ঞান খাটিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে নানা বিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তত্ত্ব দিতে চেষ্টা করেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নে যদিও আমরা এ যাবৎ কিঞ্চিত অনুধাবন করতে পেরেছি তবুও আরও কতনা রহস্য অজানা,

Dhaka University Institutional Repository

অচেনা, রয়ে গেছে। মহা বিশ্ব থেকে যদি আমরা আমাদের ধারণকৃত ধরনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে সৃষ্টির অজস্র রহস্য এখানেও প্রতক্ষ্য করব।[৬৬]

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে বস্তু কণার গঠন আর এই কণার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বস্তু রাজি -পদার্থ। এই সবই বস্তুপুঞ্জের পরিকল্পিত সুনিপুণ ও সুসজ্জিত বিন্যাস মাত্র। হৃদপিণ্ড মানব দেহের কখণ্ড মাসংপিণ্ড যার গঠন ও কার্যাবলী দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই মাংস খণ্ডটি খুবই সংবেদনশীল স্থিতি স্থাপক কলাদ্বারা গঠিত যা মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার সংকোচন ও প্রসারণ নীতি ব্যবহার করে মানুষের জীবনধারা প্রবাহমান রাখে। এই সচলতাই জীবন, আর নির্জীবতায়ই মানুষ হয় প্রাণহীন জড়, তবে একটা আশ্চর্য বিষয় এই যে, মানুষের সৃষ্টি হওয়ার সময়ে হৃদপিণ্ড যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তা ছিল নির্জীব ও নিশ্চল। এই গোস্ত খণ্ড কখন চলতে শুরু করে, তা বিজ্ঞানীরা এখনও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। এসব জিনিষ জ্ঞান বা যুক্তিতে ধরা পড়বেনা। অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেক জিনিষ অর্জন করতে হবে যেমন সাপের কামড়ের জ্বালা বুঝাতে হবে সাপের কামড়ের কামড় খেয়ে । তেমনি প্রেমে পরে বিচ্ছেদ-বেদনা উপলব্ধি করতে হবে। এমনিভাবে আত্মাকে জাগ্রত করতে হলে, আর আলাকে বুঝতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সাধনা করে বুঝাতে হবে। কেহ যুক্তি-তর্ক দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে চাইলেও সাম্যক উপলব্ধি করতেও হয়ত পারবে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, যে নিজেকে শুদ্ধ করে নেয় সেই সফলকাম হয় আর নিজেকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।[৬৭]

কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথা-বার্তায় লিপ্ত নয়, যারা যকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভূক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার সর্ম্পকে হুশিয়ার থাকে। আর যারা তাদের নামাযসমূহের যথাযথ খবর রাখে। তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীলত ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

মানুষ জাহেরী ও মানুষ বাতেনী। জাহেরী মানুষ জাহেরী গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে আর বাতেনী গুণসম্পন্ন মানুষকে বিশেষ অনুশীলনের কতগুলো বিধি-বিধান অবলম্বনের মাধ্যমে

---

৬৬. ড. মুহাম্মদ সিকন্দার আলী ইব্রাহীমি, "স্বর্ণপদক প্রদান : একটি বিরল সম্মান", *মাসিক ভাটি নাও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৬৭. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (আল-কুরআন, ৯১ : ৯-১০)

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করে জাগ্রত করা যায় এবং জাহেরী মানুষকে বাতেনী মানুষ হতে আলাদা করা যায়। এটা হচ্ছে একটা থিওরি যা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা জানিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ, আমাকে যদি উপলব্ধি করতে চাও এবং আমার সঙ্গে নৈকট্য লাভ করতে চাও তাহলে আমার দেয়া নির্দেশ মেনে আমাকে ডাক। আমি একান্তভাবে তোমার নিকটেই আছি তা বুঝতে পারবে আর তোমার ডাকে সাড়া দিব। এই মর্মে তিনি আরও জানিয়েছেন- *ফাযকুরুনী আযকুরকুরকুম ওয়াশকুরুলী ওয়ালা তাকফিরুন* অর্থাৎ আমাকে তোমরা ডাক তাহলে আমিও তোমাদের ডাকে সাড়া দিব (ডাকের জবাব দেই)।[৬৮] অর্থাৎ আল্লাহর ডাকের সরাসরি উত্তর আসবে। এভাবে আল্লাহর সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করার কথাই বলা হয়েছে।

মানিকগঞ্জের এই বিরল মহামনীষীর আল্লাহ প্রদত্ত চিন্তাভাবনা প্রসূত জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বের এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের কথাই মনে করিয়ে দেয় তার রচিত 'মহাভাবনা'র সতরে সতরে। সারা জীবন ব্যাপী যে মহাগবেষণা এবং মহাচিন্তা করেছেন এবং যে চিন্তার ফসল তিনি রেখে গেছেন, আর আল্লাহর ওহদানেয়াত এর কথা যেভাবে তিনি তুলে ধরেছেন তার কোন নজীর এ দুনিয়ায় পাওয়া যাবে না। এই মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনার মাহাস্মৃতির নিদর্শন এবং যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা স্বরূপ এই আল্লাহর মহাওলীকে আল-হিক্‌মাহ্ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বর্নপদকের মহাসম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। এবং এর জন্য আল-হিকমা ফাউন্ডেশনও নিজেকে ধন্য মনে করে।"[৬৯]

মাওলানা সাহেবের 'মহাভাবনা' কিতাবের জ্ঞানকে সকলের নিকট খুব সহজে উপস্থাপনের জন্য মাওলানা সাহেবের বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব 'মহা ভাবনা প্রতিবিম্ব' (The Great Thought Reflects) আবিস্কার করেন।[৭০] যা কিতাবটির প্রথম অধ্যায়ের ব্যবহারিক উপস্থাপনা (Practical Presentation)। মহাভাবনা প্রতিবিম্বে নাসা (NASA) ও বিশ্বের বিভিন্ন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে মহাভাবনায় উল্লেখিত গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, ছায়পথ, নেবুলা, কোয়াসার, পালসার ইত্যাদির দূর্লভ ছবি সংগ্রহ করে মহাকাশের অবস্থান অনুযায়ী কৃত্রিম মহাকাশ তৈরী করেছেন। এ আবিষ্কারের ফলে মহাস্রষ্টার তুলনায় মানুষ কতটুকু তা খুব সহজে অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া গ্রহ নক্ষত্রের গতি ও অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। যা মহাকাশ ও পদার্থ বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণায় তথা এম.এসসি (বাই

---

৬৮. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (আল-কুরআন, ০২: ১৫১)

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৭০. ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী, *বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র*, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৪৩; মোঃ আযহারুল ইসলাম, *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, ঢাকা: সুপার অফসেট প্রিন্টার্স লি., ২০০৮, পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

রিসার্চ), পিএইচ.ডি. ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষকদের যথেষ্ঠ সহায়ক ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য মহাভাবনা প্রতিবিম্ব বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্ল্যানেটোরিয়াম। এর আগে ১৮৮৮ সালে বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রনমিক্যল এসোসিয়েশন ২ ফুট x ২ ফুট আকারের ক্ষুদ্র একটি প্ল্যানেটেরিয়াম তৈরী করেছিল। তারপর ২০০৪ সালের ৯ জুলাই মহাভাবনা প্রতিবিম্ব আবিস্কার করা হয় যা ১৭ ফুট x ১১ ফুট আয়তনের বিশাল প্ল্যানেটোরিয়াম। তারপর সরকারী ভাবে ২০০৪ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের তৃতীয় প্ল্যানেটোরিয়াম ভাসানী নভোথিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 'মহাভাবনা প্রতিবিম্ব' আবিষ্কারে তাঁর রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক, কৃত্রিম উপগ্রহ গবেষক, ইউনাইটেড আর্ন্তজাতিক বিশ্ববিদ্যালয়।

সারকথা

এ গ্রন্থে তিনি মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষ কতটুকু, মহাবিশ্বের অনেক অজানা দূর্লভ তথ্য, মানবদেহের বিস্ময়কর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যিক্‌র বা আধ্যাত্মিক মহাসাধনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। মাওলানা সাহেব জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শন (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy) , পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি জটিল ভাবনাগুলোকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে মহা ভাবনায় রূপান্তর করে মহাস্রষ্টার মহাক্ষমতা, বিশালতা ও অস্তিত্বের প্রামণ করেছেন। যা ইতিহাসে একটি বিরল রচনা।

নামকরণের সার্থকতা

বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়। তাই বিশেষ ভাবনাকে মহা ভাবনা বলতে হবে। 'ভাবনা' শব্দ দ্বারা চিন্তা, গবেষণা, বিজ্ঞান, আবিস্কার ইত্যাদি বিষয়কে বোঝানো যেতে পারে। গ্রন্থটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিশাস্ত্র, দর্শণ, দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানের আলোকে সাহিত্যরসে মহাভাবনা কিতাবটি রচনা করেন। এ কিতাবে মানবদেহের অতি ক্ষুদ্র কোষ, চক্ষু, মস্তিস্ক থেকে শুরু করে দেশ, মহাদেশ, মহাসমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সৌরজগত, ছায়াপথ, কোয়াসার, পালসার, মহাকাশ, আরশ, কুরসি ও মহাস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যুগান্তকারী মহাভাবনা করেছেন। তাঁর মহাভাবনা অনেক নাস্কিকের মস্তিস্কে ভাবনা ঝড় সৃষ্টি করিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এবং বিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর এ যুগকে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তাই 'ভাবনা' শব্দটির পূর্বে 'মহা' শব্দটি যুক্ত করা খুবই যুক্তিসংগত এবং আলোচ্য কিতাবটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট সাদরে গৃহীত হওয়ায় কিতাবটির নামকরণ 'মহা ভাবনা' যথার্থ এবং সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচ্ছদ পরিচিতি

'মহা ভাবনা' কিতাবটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি করেন স্বয়ং মাওলানা সাহেব। প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটিতে প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "প্রচ্ছদটিতে সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছায়াপথ ইত্যাদি থাকবে, প্রচ্ছদটি এমন হবে যেন কেউ দেখলেই মনে করে কি জানি কি, কি জানি কি, কি জানি কি এবং মানুষ যেন ভাবনায় পরে যায়।" মাওলানা সাহেবের এ দিকনির্দেশনানুযায়ী প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক ১৯টি প্রচ্ছদ অংকন করেন। ১৯টি প্রচ্ছদের মধ্য থেকে মাওলানা সাহেবের বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব ১টি প্রচ্ছদের মাঝখানে আন্টারিস নক্ষত্রটির সাথে সূর্যের তুলনা অংকন করে চূড়ান্ত করেন। প্রচ্ছদটিতে বিন্দুরূপী সূর্য থেকে দশ কোটিগুণ বড় আন্টারিস নক্ষত্রটি দেখানো হয়েছে। ঠিক মাঝখানে সুপারনেভার আলো ফুটে উঠেছে তার ঠিক উপরেই ছায়পথ দেখানো হয়েছে যেখানে প্রায় বিশ হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে। প্রচ্ছদটির ঠিক নিচে লক্কুক নক্ষত্রের অতিওজনের উপাদান সম্বলিত মাটি দেখানো হয়েছে।

৮. পীর ধরার অকাট্য দলিল

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৯৯২ইং সালে মাওলানা সাহেব 'পীর ধরার অকাট্য দলিল' কিতাবটি রচনা করেন। এটি তাঁর লিখিত সর্বশেষ কিতাব। আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে পীর ধরা বা বায়'আত হওয়ার প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমাজে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় এক শ্রেণীর আলিম পীর ধরাকে কুরআন সুন্নাহ বহির্ভূত বিষয় বলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং একজন অদর্শ শিক্ষক, উস্তাদ, হক্বানী আলিম তথা পীরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। যার ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছিল। সমাজের ঐ সমস্ত গোঁড়া আলিমদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে মাওলানা সাহেব 'পীর ধরার অকাট্য দলিল' নামক কিতাবটি সূধী পাঠকমহলকে উপহার দিয়েছেন।

পীর ধরার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন[৭১], "ক্বল্‌বটা যে এত বড় মহা বিশাল, যার আয়তন মানুষের ধারণাতীত তা বুঝতে হলে যুক্তি করে বোঝা যাবে না। নিজের বুদ্ধিতে নিজের বিবেক বিবেচনায়, পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে কিতাবের "ইল্‌ম দিয়ে, নাহু, ছরফ, বালাগাত, ফাছাহাত, মানতেক, ফালাসাফা আউড়িয়ে চিরজীবন হাদীসের এই মহাবাণী, ক্বল্‌ব আল্লাহ্‌র আরশ যতটুকু বুঝা গেছে, এখন সব ছেড়ে মুর্খ সেজে একজন চেতন পীরের কাছে গিয়ে, যাঁর জাহের বাতেন 'ইল্‌ম আছে, কিছুদিন চক্ষু বন্ধ করে

---

৭১. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রাহ.), *পীর ধরার অকাট্য দলিল*, (সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং), পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্বল্বের দিকে তাঁর নির্দেশ মত তাকিয়ে দেখুন কি দেখা যায়, সব কথায় লেখার মত নয়, বলার মতও নয়। আপনি আরো বড় হন আরও পণ্ডিত হন, আল্লাহর সংগে আরও সান্নিধ্য সৃষ্টি হোক এটিই কি কোন অসৎ বুদ্ধি হল? তাই মহাত্মারা বলেছেন, যা আছে তাই নিয়ে যে সন্তুষ্ট থাকে সে কোনদিন আর বড় হতে পারবে না। স্যার উইলিয়াম জেমস একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, প্রতিটি মানুষ তার ক্ষমতা যোগ্যতা এবং পরিবেশ পরিবর্তন না করে যা সে হতে পারতো তার মাত্র অর্ধেক সে হয়ে আছে। এই ক্ষমতায় এই শক্তিতেই যদি সে চেষ্টা করে সে বর্তমানের চেয়ে দিগুণ হতে পারে। যে ফাযিল পাশ করে বসে আছে সে কামিল পাশ করতে পারে। সে আরও চেষ্টা করলে বিজ্ঞ হতে পারে। প্রয়োজন শুধু যুক্তি ছেড়ে দিয়ে কথা কাটাকাটি ছেড়ে দিয়ে একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করা, সাধনা বা রিয়াজত করা।

ক্বলবে হুজুরী অর্জন সম্পর্কে মাওলানা সাহেব বলেন, আমার কথা পরখ করে দেখুন, এই বই ছেড়ে উঠে যান। একটি নিরালা জায়গায় বসুন। আমার কিতাবের শেষে আল্লাহ্কে লাভ করার সবক দেয়া আছে তা কিছুদিন একনিষ্ঠভাবে অভ্যাস করুন। শুধু আল-কুরআন শরীফ থেকে কয়েকটি কথা এবং দরূদ শরীফ যাতে কারুরই কোন মতভেদ নেই, এ দিয়েই এ সবক তৈরি হয়েছে। দেখবেন আপনি কি বুঝেন আপনিই টের পাবেন। তবে এটা কিভাবে করতে হবে তা একজন মানুষের নিকট থেকে, যিনি এটা অভ্যাস করেছেন, ভালভাবে জেনে নিন। যেন তেন করে করলে আমাকে দায়ী করতে পারবেন না। তারপর কিছুদিনের ভিতরেই টের পাবেন ইনশাআল্লাহ্, ক্বল্বটা এত বড় কেমন করে হল এবং এতে আল্লাহর অবস্থান কেমন করে সম্ভব এবং তখনই শুধু এ হাদীস শরীফ, ক্বল্ব হচ্ছে আল্লাহ্র আরশ, মন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং পরে সত্যতা উপলব্ধি করে ক্বলবে হুজুরী করতে পারা যাবে ইন্শাল্লাহ।[৭২]

আধ্যাত্মিক সাধনার সুরভিতে সিক্ত মাওলানা সাহেব কিতাবটিতে ক্বলব বা আল্লাহ ঘর সম্পর্কে গবেষণামূলক সাধনালব্ধ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। শুধু কিছু নির্ধারিত শরীয়াতের বিধান অনুশীলন ছাড়াও যে 'ইল্ম মা'রিফাত তথা তাসাওউফ চর্চা আল কুরআন ও সুন্নাহ একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান অংশ সে সম্পর্কে আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করে তাসওউফ জ্ঞান হীন আলিম সমাজের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন। ফলে আলিম সমাজে কিতাবটি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। যুক্তির কষ্টিপাথরের নিরিখে আল কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে পীরের ভূমিকায় তিনি বলেন, "কে না চায় মহা সৌভাগ্যের কারণ আল্লাহ্র দিদার! হাদিস শরীফে আছে জনাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফরমায়েছেন, 'লা সালাতা ইল্লা বিহুজুরিল ক্বালব।' (হুজুরী ক্বলব ছাড়া কোন নামাজই পূর্ণ

---

৭২. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রাহ.), *পীর ধরার অকাট্য দলিল*, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২খ্রি., পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

হয়না)।[৭৩] হাদিস শরীফে আরও আছে, 'আস্সালাতু মি' রাজুল মু'মিনিন।' (নামাজে মোমেনের মেরাজ হয় (আল্লাহ্‌র সঙ্গে দিদার হয়)।[৭৪]

প্রথম হাদিস শরীফে বলা হয়েছে হুজুরী ক্বল্‌ব ছাড়া নামাজ কামেল বা পূর্ণ হয় না। তাই যদি হয়, তবে প্রতিটি নামাজী ব্যক্তির চাই সে শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক হুজুরী ক্বল্‌ব কাকে বলে তা জানা এবং চেনা। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) বাণী অনুযায়ী অবশ্য কর্তব্য, কারণ ক্বল্‌বে হুজুরী যদি না হয় তবে নামাজ পড়াটই মিথ্যে হয়ে যায়।

এখন ক্বল্‌বের হুজুরী করতে হলে নিশ্চয়ই ক্বাল্‌ব চেনা দরকার এবং কিভাবে তাকে হুজুরী করতে হয় তা জানা দরকার। সর্বক্ষেত্রে এলেমের জাহেরী এবং গোয়ার্তুমী স্বভাব মানুষকে কখন যে পশু করে তোলে, তা তার এক গুঁয়েমী স্বভাবই এবং এলেমের ফখরই তাকে জানতে দেয় না। স্বয়ং রাসূলের (সা.) আদেশ জেনেও যারা এ হাদিস অনুযায়ী নামাজে দাঁড়াতে প্রয়োজন মনে করেনা, তারা নিজেরাই নবীর চেয়ে বেশী জানে বলে কাজ দ্বারা প্রমাণ করে চলে (নাউজুবিল্লা)।[৭৫]

কিতাব পড়ে ক্বল্‌বের হুজুরী কাকে বলে তা জানা এবং কামেল পীরের নিকট থেকে ক্বল্‌বের হুজুরী আসলেই কিভাবেই হয় তা জানা আসমান জমিন তফাৎ আছে। কেউ পাগল হলে ডাক্তার যদি বলে, গাধার দুধের মাখন নিয়ে এস, ঔষধ তৈরি করে দেব, মাথায় দিলে পাগল ভাল হয়ে যাবে। পাগলটা তখন ছুটবে গাধার দুধ আনতে। সে গাধা কোন দিন দেখেনি এবং কিভাবে তার দুধ বের করতে হয় তা জানেনা। মনে করা যাক, এক হাটে অজস্র পশু বাধা আছে, যেমন গাধা, গরু, ছাগল, জেব্রা, মহিষ, জিরাফ। সে এখন কোন্‌টি গাধা কোনটি জিরাফ কেমন করে ধরবে। নিশ্চয়ই একটি লোক ধরতে হবে গাধা চেনার জন্য। শুধু গাধা চিনলেই হবেনা, স্ত্রী গাধা এবং দুধ ওয়ালী গাধা চিনতে হবে। তা চিনলেই হবেনা বান দুয়াতে হবে নাকি ঠ্যাং দুয়াতে হবে তাও তার জেনে নিতে হবে। তারপর সে এ দুধ থেকে যে মাখন তুলতে জানে তার কাছে গিয়ে শিখতে হবে, তবেনা গাধার দুধের মাখন সে লাভ করতে পারবে। মানুষের দেহটাতেও ঠিক তেমনি অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাট রয়েছে, এতে দেহের ভিতরে রয়েছে, হৃদপিণ্ড সে এক বিরাট ব্যাপার। ফুসফুস সে এক মহা জটিল যন্ত্র, রয়েছে অন্ত্র, বৃক্ক, কশেরুকা, নিলয় ইত্যাদি। এগুলো এক একটি বড় বড় হাটের মত। অজস্র জিনিস রয়েছে এতে। দেহের ভিতর ঘোর অন্ধকার। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। এত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের হাটের মধ্যে ক্বালবটি কোথায় আছে অনেকেই তা জানে না। পাগল ভাল হতে যেমন গাধা চিনতে হয়,

---

৭৩. উদ্ধৃত- অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রাহ.), *পীর ধরার অকাট্য দলিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৭৪. প্রাগুক্ত

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

দুধের ঘর চিনতে হয়, মাখন তৈরি চিনতে হয় এবং এসব ক্ষেত্রেই একজন চিনিয়ে দেয়া লোকের দরকার হয়, ঠিক তেমনি ক্বলবে হুজুরীটাও মাখনের মত যা দিয়ে নামাজের ত্রুটি নষ্ট করে নামাজকে কামেল করতে হয়। দেহের অসংখ্য অঙ্গের ভিতরে ক্বলবটি যে চিনিয়ে গাধা দুয়ানের মত ক্বালব যে দুয়াতে শিখিয়ে দেয় তাকেই পীর বলে। যারা অন্য একজন চিননেওয়ালার নিকট থেকে চিনেছে তার কাছে গিয়ে চিনতে হয়। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, যে আমাকে জেনেছে তার পেছনে পেছনে ঘুরে সব জেনে নাও, একা একা চেষ্টা করে আমাকে নাগাল পাবে না।"[৭৬]

সারকথা

'পীর ধরার অকাট্য দলিল' কিতাবে মাওলানা সাহেব প্রমাণ করেছেন আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য পেতে হলে একজন হক্বানী পীর অবশ্যই ধরতে হবে। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্র ওলীরা সবাই পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে স্বচেষ্ট শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য এক অনন্য উপহার।

নামকরণের সার্থকতা

মাওলানা সাহেব গ্রন্থটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল কুরআন ও সুন্নাহর দালিলিক ভিত্তিতে পীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা এবং দলিল উস্থাপান অকাট্য হওয়া এবং কিতাবটি আলিম সমাজের নিকট সাদরে গৃহীত হওয়ায় এর নামকরণ 'পীর ধরার অকাট্য দলিল' এবং সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি করেন কিতাবটির প্রকাশক, মাওলানা সাহেবের বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব। পরিকল্পনাটিতে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযাহ থিমটি এনেছেন। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করাটি যেমন অকাট্য মহাসত্য ঠিক পীর ধরার বিষয়টিও আল কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে অকাট্য সত্য। প্রচ্ছদটির নিচে তিনি দুটি পথ দেখিছেন একটি কন্টকার্কিণ দূর্গম এবং শেষপ্রান্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠিকানা বুঝিয়েছেন এবং অন্য পথটি সুন্দর সোজাপথ এবং শেষ প্রান্তে আল্লাহ নামটি সংযোজন করি বুঝিয়েছেন পীর বা হক্বানী উস্তাদের তত্ত্বাবধানে থাকলে মানুষ খুব সহজে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

করে দুনিয়া থেকে হাসিমুখে বিদায় নিতে পরে। প্রচ্ছটি প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক প্রকাশকের পরিকল্পনায় অংকন করেছেন।

মাওলানা সাহেব কর্তৃক রচিত আটখানা কিতাবের পর্যালোচনায় আমরা অনুধাবন করেছি যে, তাঁর প্রতিটি কিতাব নিয়ে ব্যপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। যা আমাদের এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আমরা শুধু মূল বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি মাত্র। মাওলানা সাহেবের যুগান্তকারী লেখনী থেকে এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি কোন সাধারণ মাওলানা সাহেব ছিলেন না। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম একজন মুসলিম বিজ্ঞানী, হক্বানী 'আলিম ও উচ্চপর্যায়ের সূফীসাধক ছিলেন। যা অদূর ভবিষ্যতে আরো ব্যপকভাবে প্রস্ফুটিত হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট কায়েমানুবাক্যে এ কিতাবসমূহের বহুল প্রচার কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মহান আলাহর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। যার অসীম কৃপায় গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত হলো। এ নশ্বর পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন, যারা নিজেদের শ্রম-সাধনা দিয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধণ করে গিয়েছেন। এর ফলে তাঁরা মানুষের হৃদয়ে চির অমর হয়ে আছেন, থাকবেন আজীবন। যাঁদের কাছে পৃথিবী ও মানুষ ঋণী, যাদের অবদান শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; বরং ধর্ম-সমাজ, রাষ্ট্র তথা ব্যক্তির সামাজিক জীবনেও প্রতিফলিত। যাঁদের অপরিসীম জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভা ইসলামী শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে যুগ-সমস্যার সমাধান দিয়েছে এবং উন্মোচন করেছে ধর্মের নতুন সোনালী দিগন্ত। মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) তাঁদেরই একজন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ছিল যাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি ছিলেন ঐ শ্রেণীর মানুষ। যারা বিভিন্ন যুগে সেই যুগের চাহিদা উপযোগী করে মহান আলাহর অস্তিত্ব এবং ওয়াহদানিয়্যাত এর এমন সুক্ষ্ম সব পর্যায় উল্লেখ করেন, যার ফলে অনেক সংশয়বাদী মানুষ মহান স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে। জ্ঞানের পিঠে ভর করে যারা জ্ঞানী হয়েছেন তারাই একদিন ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে স্রষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকে। মাওলানা সাহেবের একটা প্রিয় কথা এর উদাহরণ। তিনি বলেন, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ক্রমাগতভাবে এমন উন্নতি করছে যে, এরপর মানুষ আর মানুষ থাকবে না, খালি জ্ঞানই হবে। যদি কেউ হেটে যায় মানুষ বলবে একটা জ্ঞান হেটে যায়। এত জ্ঞানী মানুষ হবে এরকম হতে হতে আলাহ রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করবে (নাউজুবিলাহ), করতে করতে আবার খুব যদি জ্ঞানী হয় তখন সে ফিরে আবার আলাহর কুদরতী পায়ে পরে কান্দা শুরু করবে।

তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হল তিনি তাঁর চিন্তা, গবেষণা, দর্শন, ধর্ম বিশ্বাস ও তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে সকল মানুষকে মহান আলাহর পাণে ধাবিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ রচনা 'মহাভাবনা' তে সাহিত্যের ছন্দে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন মহান আলাহর প্রতি-

"গভীর নিশীথে কে যেন ডাকিছে অনন্তের পথ হতে,
বিশালতা মাঝে হারিয়েছ কভু? থেকো না দাঁড়িয়ে পথে।
আপনারে এত জড়ায়ে রেখে, আপন হারিয়ে গেলে,
সংকীর্ণতায় আপনারে বেঁধে, কত ধন গেলে ফেলে।
এত কাছাকাছি কার কাছে র'লে, যে ছিল আপনজন,
একবার জেগে দেখিলে না তারে, এত ছোট ছিল মন!
হারায়ে দেখ অনন্তের পথে, আপনারে ফিরে পাবে,
জীবন-প্রদীপ নিভে গেল, বল, কার কাছে ফিরে যাবে।"

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইসলামকে পাঠ করেছেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ভর করে। মহান আলাহ্‌র বাণীকে তিনি বিশেষণ করার প্রয়োজনে কুরআন-হাদীস ফিক্‌হ, মুসলিম দর্শন এর পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বয় করেছেন। যার ফলে ইসলামী জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়েও বহু মানুষ মাওলানা মুহাম্মদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকীর (রহ.)-এর সাহচর্যে এসে সংশয়বাদীদের দল ত্যাগ করে, দীর্ঘ জীবনের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ছুড়ে ফেলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন অন্তরের মধ্যে আলাহর ভয় ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশু জীবনের সাথে মানুষের পার্থক্য করা সম্ভব নয়। ইসলামের এ লক্ষ্যকে সামনে নবী করীম (স.)-এর প্রদর্শিত পথে তিনি তাঁর সমগ্র চিন্তা-চেতনা, সংগ্রাম-সাধনা, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছিলেন।

তিনি তাঁর জীবনকে তাসাউফের একজন বাহকের কাছে সমপর্ণ করেছিলেন অতঃপর তার স্বীয় জীবনধারায় তাসাউফ ও সুলুকের দিকে অধিক মনোনিবেশ শায়খে কামিলের পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান থেকে নিজের সময় ও শক্তির বিরাট অংশ নিয়োগ ও এর পূর্ণতা বিধানে ব্যয় করেছেন। শরী'আত বিষয়ক পূর্ণ-শিক্ষা লাভ করে এবং তাসাউফের দর্শনকে সামনে রেখে পথভ্রষ্ট মানুষকে তিনি ইসলামের জরুরী ও মৌল বিষয়সমূহ অর্জনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করে আত্মভোলা মানুষকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করেছেন। সর্বোপরি অসংখ্য মানুষকে তিনি আমলের ময়দানে নামিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় তথা ফরজ দ্বীনি ইলম শিক্ষার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এ অগ্রযাত্রাকে ফলপ্রসূ করা এর ধারাবাহিকতাকে অভ্যাহত রাখবার জন্যে প্রত্যেক মাসে ওয়াজ মাহফিল এবং বছরে দুটি ইজতিমা পালনের নিয়ম নির্ধারণ করেছেন। সকল শ্রেণীর লোক যারা সালিকের খাতায় নাম লিখিয়েছেন, বার্ষিক ইজতিমায় তাদের চারদিন করে রেখে জরুরী তালিম প্রদান, আকীদা বিশ্বাস, নামায, অযু ইত্যাদি সংশোধনের জন্য তিনি নিজে ছায়ার মত লেগে থাকতেন। এ বিরাট কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি যত নিয়ম পদ্ধতি উপস্থাপন করতেন তা কখনোই আল-কুরআন ও আল-হাদীসের বাইরে নয়।

আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তির পরিচয়ের কষ্টিপাথর হল সুন্নতের অনুসরণ। আর যে ব্যক্তি সুন্নতের অনুসারী তিনিই আল্লাহর বন্ধু। সুতরাং মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) নিঃসন্দেহে সেই মর্যাদায় সমাসীন। তাঁর জীবন-দর্শনের মূল কথা হিসেবে যা প্রতীয়মান হয়, তা হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল (স.)-এর নির্দেশিত কর্মপন্থা অর্থাৎ সুন্নতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, আর তাসাউফের মূল লক্ষ্য, রিয়াযত ও মুজাহাদার মাধ্যমে পরিপক্ক জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হওয়া এবং মহান আল্লাহর প্রিয় পাত্রে পরিণত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

মহামনীষীগণের জীবন ও কর্ম আমাদের জীবন চলার পাথেয়। কিন্তু তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়ার যথার্থ-উপকরণ আমাদের সমাজে অপ্রতুল। মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর জীবন দর্শন ও তাসাউফ চর্চা সম্পর্কে আমাদের মুসলিম সমাজের সবাই যথার্থ অবগত নয়। বর্ণিত শিরোনামে বর্তমান প্রজন্মকে মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের চেষ্টা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এই অভিসন্দর্ভটি মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর বিশাল কর্মবহুল ও বৈচিত্রময় জীবনের উপর আরও একাধিক গবেষণার দ্বার খুলে দিবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মহান ওলীগণের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর ও তাঁর রাসূলের (স.) আনুগত্য করে আদর্শ মানুষ হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুর'আন

ঃ *আল-কুরআনুল করীম বাংলা তরজমা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮

আত-তিরমিযী, আবু ঈসা, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (আল-ইমাম) ঃ *আল-জামে' আত-তিরমিযী,* দেওবন্দ: মোখতার এন্ড কোম্পানি, (তা.বি.)

আন-নিশাপুরী, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (আল-ইমাম) ঃ *আস-সহীহ্,* বৈরুত: ইহইয়া আল-তুরাছ, ১৪১৫ হি.

সম্পাদনা পরিষদ ঃ *মুসলিম শরীফ,* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৩, খ. ৪

আন্-নাসাঈ, আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শুআইব (আল-ইমাম) ঃ *সুনানু নাসাঈ,* কায়রো: মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮২ খ্রি.

আবূ দাউদ, সুলায়মান ইব্নুল আশআস আস্সিজিস্তানী (আল-ইমাম) ঃ *সুনানু আবূ দাউদ,* বৈরুত: দারুল ফিক্র, ১৯৯৪

ঃ *আবু দাউদ শরীফ,* (অনু: ড. আ.ফ.ম আবূ বকর সিদ্দীক), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, খ.৪

আল-বুখারী, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (আল-ইমাম) ঃ *আস-সহীহ,* করাচী: কারখানা তিজারাতে কুতুব, ১৯৬১

সম্পাদনা পরিষদ ঃ *সহীহুল বুখারী,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ. ৪

আল-বায়যাবী, কাযী নাসির উদ্দিন ঃ *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল,* দেওবন্দ: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, (তা.বি.)

আল-আসকালানী, আহমাদ ইব্ন আলী ইবন হাজার ঃ *ফাতহুল বারী,* বৈরুত: দারুল মা'রিফা, তা.বি.

আহমাদ, ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল (আল-ইমাম) ঃ *আল-মুসনাদ,* কায়রো: মাতবা'আ আশ-শারকিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.

ইব্ন মাজাহ, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ আল-কাযবীনী (আল-ইমাম) ঃ *সুনানু ইবনে মাজাহ,* বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৩

(অনু: মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক ও অন্যান্য) ঃ *সুনানু ইবনে মাজাহ্,* , ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

তাবরীযী, ওয়ালী উদ্দীন, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (খতীব) ঃ *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, (তা.বি.)

আব্বাস আলী খান ঃ *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৪

আল্লামা আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বালাযুরী (র.) ঃ *ফুতূহুল বুলদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮

হাসান জামাল ঃ *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ১৯৬৭

আল্লামা আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বালাযুরী (র.) ঃ *ফুতুহুল বুলদান*, (সম্পা. সম্পাদনা পরিষদ), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ঃ *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০৮

আহমদ শরীফ ঃ *বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা*, (সংকলন ও সম্পাদনা: আবুল কাশেম ফজলুল হক ও মিজান রহমান), ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০০৯

আকবর আলি খান (অনু. আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া) ঃ *বাংলাদেশের সত্তরে অন্বেষা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪

কাজী জাফরুল ইসলাম ঃ *মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ১৯৯৯

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ঃ *ইতিহাস সন্ধান*, ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনি, ১৯৮৮

আব্বাস আলী খান ঃ *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪

আব্দুল জলিল ঃ *মধুযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা* ও বাঙ্গালী সমাজ, ঢাকা: তা.বি.

নীহার রঞ্জন রায় ঃ *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত) ঃ *বাংলার ধর্মজীবন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

ওয়াকিল আহমদ ঃ *উনিশত শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন ঃ *মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস, ঢাকা: তা.বি.*,

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ আজাহারুল ইসলাম (আজহার)	ঃ	*মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ: মানিকগঞ্জের লেখক-কবি-সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সংগঠন, ২০০৯
মোঃ আযহারুল ইসলাম	ঃ	*মানিকগঞ্জের শত মানিক*, মানিকগঞ্জ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৫
সম্পাদনা পরিষদ	ঃ	*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯
ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন	ঃ	*সূফীবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, ঢাকা:২০০১
মৌঃ মোঃ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী	ঃ	*মারেফাতের ভেদতত্ত্ব*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯
ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী	ঃ	*বায়'আত*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১খ্রি.
স্যার সৈয়দ আমীর আলী	ঃ	*দ্যা স্পিরিট আব ইসলাম* (অনু. ড. রশীদুল আলম), কলিকাতা: মিল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯১খ্রি.
সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভী	ঃ	*তাযকিয়াহ ওয়া ইহ্সান* (অনু. মুহাম্মাদ আবুল বাশার আখন্দ), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭খ্রি.
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম	ঃ	*হযরত শাহ মাখদুম রূপোশ (রহ.) -এর বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮
গাওছুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানী সাহেব (রহ.)	ঃ	*সিররুল আসরার*, (অনু. মাওলানা আবদুল জলিল (রহ.), ঢাকা : হক লাইব্রেরী, ১৯৮৬
সম্পাদনা পরিষদ	ঃ	*দৈনন্দিন জীবনের ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২
আল্লামা আল্লাহ ইয়ার খান (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)	ঃ	*ইসলামী তাসাউফের স্বরূপ*, ঢাকা: সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ২০০২
ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী	ঃ	*বিশ্ব তা'লিমে যিক্র*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮
মাও শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) (অনু.)	ঃ	*তা'লিমুদ্দিন*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী
মাওলানা নিসার উদ্দিন আহমদ (রহ.)	ঃ	*হাকীকাতু মারিফাতুর রব্বানীয়া*, ছারছীনা: দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, তা.বি

Dhaka University Institutional Repository

ড. রেনল্ড নিকলসন	ঃ	*মিস্টিক অব ইসলাম*, ক্যামব্রিজ; স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম*, (অনু. ড. রশীদুল আলম, কলকাতা: ১৯৯১
হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)	ঃ	*ওয়াযুত তাকওয়া*, ঢাকা : তা.বি.
সংকলন	ঃ	*আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খ্রি.
মাওলানা মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)	ঃ	*মারেফতের ভেদতত্ত্ব*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯
ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম ছিদ্দিকী	ঃ	*বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.
মুহাম্মদ শাহজাহান খান (সম্মপা.)	ঃ	*তাযকিরাতুল আওলিয়া*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৪
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)	ঃ	*বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৪
ড. মুহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী	ঃ	*জ্ঞানের স্পর্শমণি*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)	ঃ	*তারানায়ে জান্নাত*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)	ঃ	*মহাস্বপ্ন*, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬
অধ্যাপক মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)	ঃ	*জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮
মৌঃ মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী	ঃ	*মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব'* ঢাকা: সিদ্দিকীয়া প্রেস, ১৯৮৯
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)	ঃ	*ধুম পিপাসা সর্বনাশা*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)	ঃ	*মহাভাবনা*, মানিকগঞ্জ: সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মাদ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী	ঃ *বিশ্ব তা'লিমে যিক্‌র*, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.
মোঃ আযহারুল ইসলাম	ঃ *মানিকগঞ্জের গৌরবময় ইতিহাস*, ঢাকা: সুপার অফসেট প্রিন্টার্স লি., ২০০৮
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)	ঃ *পীর ধরার অকাট্য দলিল*, মানিকগঞ্জ : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২খ্রি.
A.J. Arberry	ঃ *Dho'l-Nun al-Mesri*, from Muslim Saints and Mystics, London: Routledge & Kegan Paul 1983
Michael H. Hart	ঃ The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History, New York: Hart Publishing Company, 1978
Dr. Muhammad Iqbal	ঃ *The Development of Metaphysics in Persia*, Lahore: Asharaf Press-7, 1965
Richard M. Eator	ঃ *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*
Jodunath Sarkar	ঃ *History of Bengal*. Vol. 11. Muslim Period,

বিশ্বকোষ ও পত্রিকা

সম্পাদনা পরিষদ	ঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৮৮
সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত)	ঃ *বাংলাপিডিয়া*, (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	ঃ *অগ্রপথিক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ পত্রিকা, জুলাই' ১৯৮৬
মুহাম্মদ মিক্‌দাদ সিদ্দিকী সম্পাদিত	ঃ *মাসিক ভাটি নাও*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র
মাও: মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	ঃ *আল-এসলাম*; ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন' ১৩২৬ সংখ্যা
শ্রী শ্রী কুমার কুন্ডু	ঃ *মানিকগঞ্জঃ ইতিকথা/ইতিহাস*, মানিকগঞ্জ সুহৃদ সম্মিলনী স্মরণিকা, ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান

ইব্‌ন মানযুর ঃ *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারুল ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৬

ভিনসতেক, ড. এ.বি ঃ *আল-মু'জামুল মুফাহারাস লি আলফাযিল হাদীসিন নাববী*, লিডেন: মাকতাবা ব্রীল, ১৯৩৬ খ্রি.

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত) ঃ *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০ খ্রি.

John Esposito ঃ *The Oxford Dictionary of Islam*, Oxford University Press 2003

Web ঃ *http://www.banglapedia.org/httpdocs/...*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহঃ) -এর স্মৃতি থেকে

যুবক বয়সে মাওলানা

ঈদের নামাজের সাজে মাওলানা

বক্তৃতারত মাওলানা

মাহফিলে মুনাজাত করছেন মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাওলানা

মানিকগঞ্জ বাসীর পক্ষ থেকে পদক প্রদান

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর পাশে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ

'মহা-ভাবনা' গ্রন্থের জন্য স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে মাওলানাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা, গ্রন্থের উপর বক্তব্য রাখছেন মোঃ আশরাফ হোসেন, জেলা ও দায়রা জজ, নোয়াখালী।

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণপদক গ্রহণ

১৭ এপ্রিল '৯৯ জাতীয় প্রেসক্লাবে 'মহাভাবনা' র প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন
The new Nation, April 19, 1999

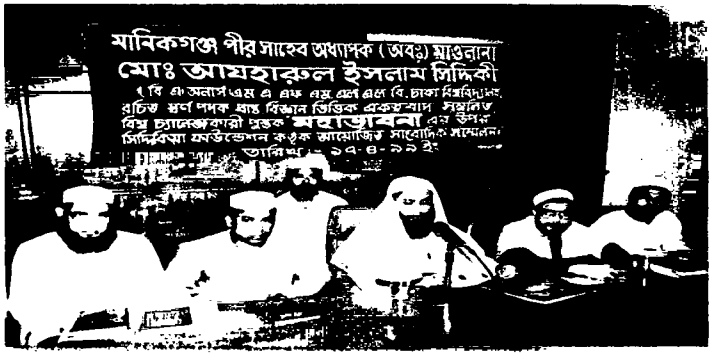

A press conference on 'Maha Vabna' a book written by Peer Al-haj prof. Azharul Islam Siddique in Manikgonj was held at National Press Club on Saturday.
Organised by Siddiquia Foundation, Moulana Mujibur Rahman Khan discussed on the book.

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে মাওলানাকে লালগালিচা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহঃ) -এর দৈনন্দিন ব্যবহৃত আসবাবপত্র

Dhaka University Institutional Repository

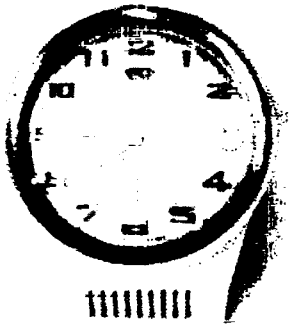

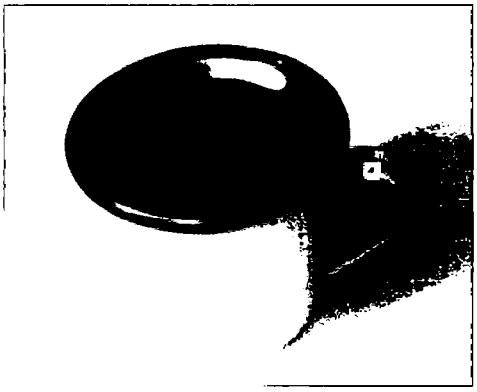

Dhaka University Institutional Repository

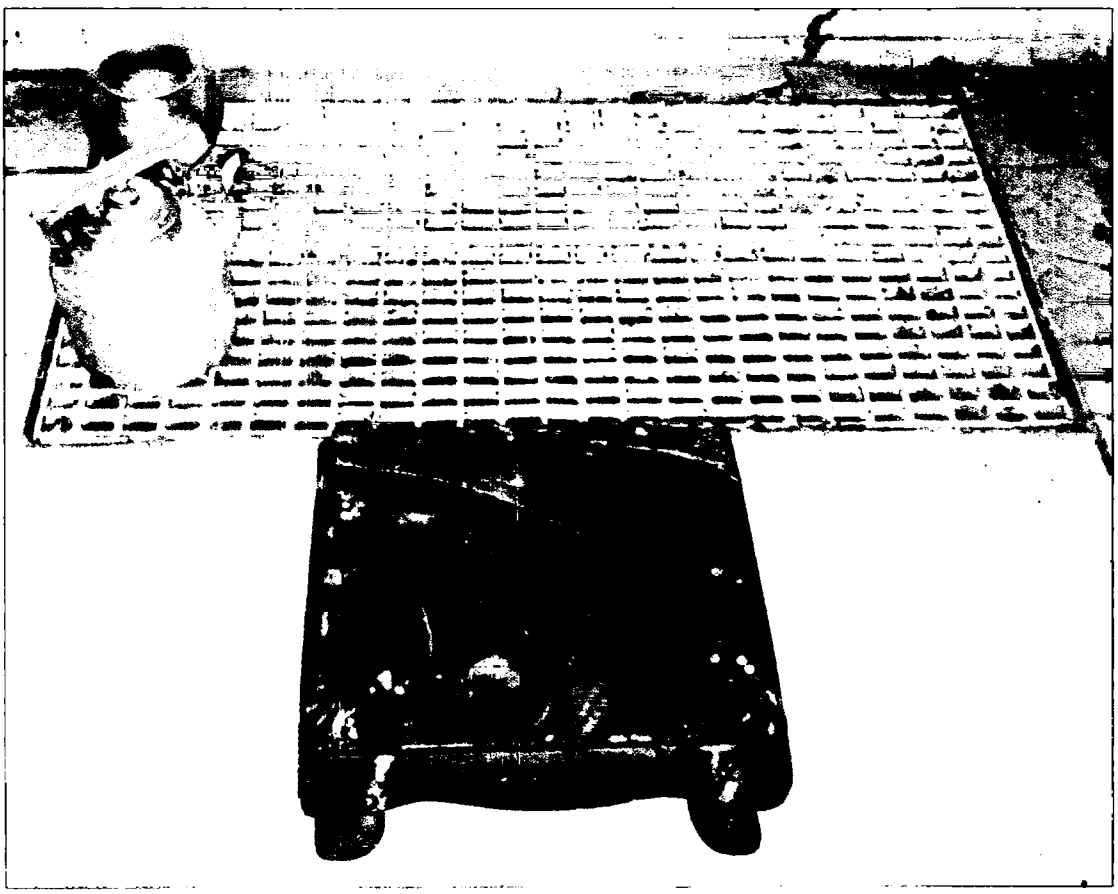

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর ব্যবহৃত একটি আলমিরা ও ওযু খানা

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর প্রাপ্ত স্বীকৃতি ও পুরস্কার

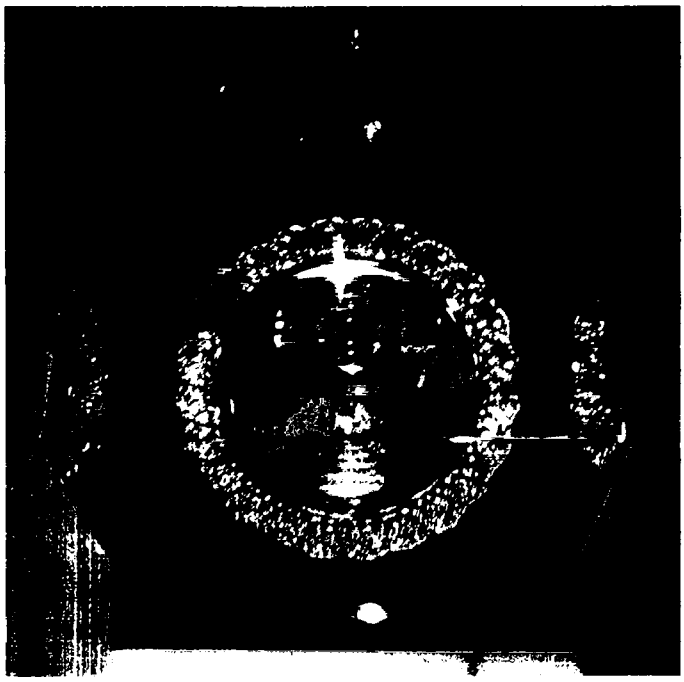

আল-হিকমাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণপদক

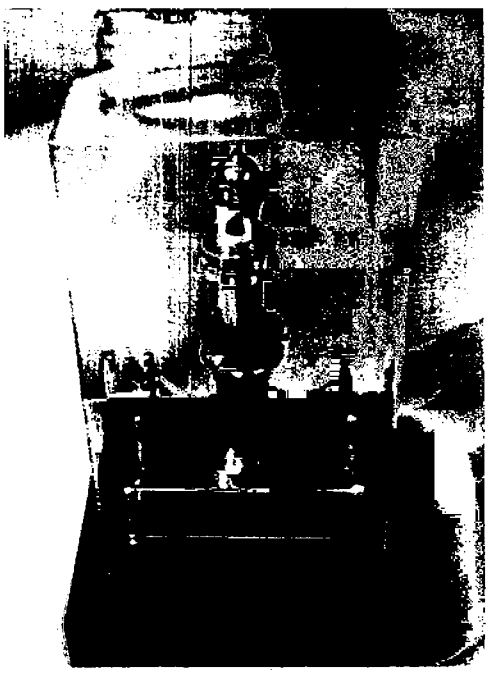

মানিকগঞ্জ পৌরসভা চেয়ারম্যান (বর্তমানে মেয়র) কর্তৃক প্রদত্ত ক্রেস্ট

Dhaka University Institutional Repository

পদকপ্রাপ্তির পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ

মানিকগঞ্জের পীর সাহেবকে তাঁর 'মহা ভাবনা' গ্রন্থের জন্য স্বর্ণ পদক প্রদান

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ গত ১৩ই মার্চ আল-হিকমা ফাউন্ডেশনের ৬ দিনব্যপী দ্বাদশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প '৯৯ইং - এর প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মানিকগঞ্জের পীর সাহেব অধ্যাপক মাওলানা মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী বিএ (অনার্স) এম,এ,এফ,এম -এলএল,বি (ঢাকা বিঃ) সাহেবকে আল হিকমা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁর লিখিত যুগান্তকারী কিতাব 'মহাভাবনা'র স্বীকৃতি স্বরূপ স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই শতাধিক প্রফেসর উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ডঃ মোঃ শাহান উদ্দিন চৌধুরী (আমেরিকা), ডঃ মোঃ ফাজলী ইলাহী, ডঃ আঃ ছোবহান, ডঃ ইসমাইল হোসেন, ডঃ মঞ্জুরুল ইসলাম সিদ্দিকী ও ডঃ মজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে আল হিকমা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ ইব্রাহিমী তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম মানিকগঞ্জের পীর সাহেবকে তাঁর লিখিত 'মহা ভাবনা' এ যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা বিধায় তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হল। তিনি আরো বলেন, বইটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের একটি দলিল হিসেবে প্রমাণিত হয়। মুন্সীগঞ্জ জেলার এডিশন্যাল জজ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, এই বইটি সারা বিশ্বের নাস্তিকদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে। এমনকি বইটির দ্বারা কোরআন-হাদিসের আলোকে সারা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে হুজুর কেবলার আগমন উপলক্ষে ঢাকার মিরপুর ১১ নং বাসষ্ট্যান্ড হতে কালশী রোড দিয়ে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। হুজুরকে স্বর্ণপদক প্রদানের পর মুসল্লিদের নিয়ে তিনি মোনাজাত করেন। মোনাজাতে কান্নার করুণ সুর ভেসে ওঠে এবং উপস্থিত সকলে হুজুরের কাছে বায়াত গ্রহণ করেন। অতপর তিনি বিদায় নেন।

সংগ্রহে - বাঞ্ছারামপুর থানা সিদ্দিকীয়া মুজাহিদ কমিটি, বি-বাড়ীয়া

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে এপ্রিল, ১৯৯৯

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের সাংবাদিক সম্মেলন

মানিকগঞ্জের পীর সাহেব মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রণীত "মহাভাবনা" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়া গত শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ হইতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা মজিবুর রহমান খান সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এই গ্রন্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির বিশালতা নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের সচিব ইমরান আহমেদ, সহ-সভাপতি এন এম আতাউর রহমান, ডঃ এরফান মিয়া, হাফেজ মোঃ আব্দুস সবুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইনকিলাব

২৬শে এপ্রিল ১৯৯৯

"মহাভাবনা" গ্রন্থের উপর আলোকপাত

প্রেসবিজ্ঞপ্তি ঃ মানিকগঞ্জ এর পীর সাহেব মাওলানা অধ্যাপক আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রণীত "মহাভাবনা" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সম্প্রতি জাতীয় প্রেস ক্লাবে সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা মজিবুর রহমান খান বলেন, এই গ্রন্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহা সৃষ্টির বিশালতা, সৃষ্টির কলাকৌশল এবং সেই সৃষ্টির তুলনায় মানুষ কতটুকু তা আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টিকে না জানলে স্রষ্টাকে জানা যায় না। তিনি বলেন, যারা আল্লাহ নবী রাসূল(সঃ), কোরআন, হাদীস, কবর, ও হাসর বিশ্বাস করেন না অথবা বিশ্বাস করলেও আল্লাহ যে বান্দার ডাকে সাড়া দেন ও কথা বলেন, এ কথা যারা বিশ্বাস করেন না, তারা এই "মহা-ভাবনা" গ্রন্থ পড়লে মহা সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

দৈনিক দিনকাল

১৮ই এপ্রিল ১৯৯৯

সৃষ্টিকে না জানলে স্রষ্টাকে জানা যায় না

স্টাফ রিপোর্ট ঃ

মানিকগঞ্জের পীর সাহেব মাওলানা আলহাজ্ব অধ্যাপক আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রণীত "মহা-ভাবনা" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের সভাপতি মানিকগঞ্জের পীর সাহেবের জামাতা মাওলানা মজিবুর রহমান খান বলেন, এই গ্রন্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহা সৃষ্টির বিশালতা, সৃষ্টির কলাকৌশল এবং সেই সৃষ্টির তুলনায় মানুষ কতটুকু তা আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টিকে না জানলে স্রষ্টাকে জানা যায় না। তিনি বলেন, যারা আল্লাহ নবী রাসুল (সঃ), কোরআন, হাদীস, কবর ও হাসর বিশ্বাস করেন না তারা এই "মহা ভাবনা" গ্রন্থপড়লে মহা সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। সম্মেলনে ফাউন্ডেশনের অনেক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনতা

১৮ই এপ্রিল, ১৯৯৯

মানিকগঞ্জের পীর সাহেব আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী রচিত "মহাভাবনা" কিতাবের উপর সাংবাদিক সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্ট ঃ

মানিকগঞ্জের পীর সাহেব অধ্যাপক (অবঃ) মাওলানা মোঃ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী রচিত "মাহা-ভাবনা" র উপর গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হযরত মাওলানা আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান খান সভাপতি সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন। সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মানিকগঞ্জের পীর সাহেব অধ্যাপক (অবঃ) আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী জ্যোতিষ বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত মহাকাশ বিষয়ক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে তাঁর রচিত "মহাভাবনা" কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন।

বিঃ দ্রঃ

দৈনিক খবর

১৯শে এপ্রিল,১৯৯৯

দৈনিক সংগ্রাম

২০শে এপ্রিল, ১৯৯৯ এবং আরও বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় স্বর্ণপদক অনুষ্ঠান ও সাংবাদিক সম্মেলনের খবরটি প্রকাশিত হয়।

এখানে উল্লেখ করতে না পারায় আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর নিজ হস্তে লেখা গ্রন্থের অনুলিপি

(পীর ধরার অকাট্য দলিল)

● অনেকে প্রশ্ন করে পীর ধরা দরকার কি
ও প্রমাণ ও জবাব।

অনেকে প্রশ্ন করে পীর ধরা দরকার কি? কোরআন শরীফ এবং হাদিস শরীফেই সেই সবই আছে। তাহলে পীরের কথা কোরআন শরীফে এবং হাদিস শরীফে কোথাও নেই।

একথার আসলে দুষিতে শুনতে ঠিকই শোনা যায়। কিন্তু এ কথার অনেকেই বলেন, অনেক অনেক বলাতেন আলেম উলামায় ও বলেন যে কোরআন হাদিসে কোথাও পীরের নাম উল্লেখ নেই তবু তারা এবং লক্ষ লক্ষ লোক কেন পীর ধরে চলে আসছে। সুতরাং এই কথার একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

পীর কাকে বলে, এর আসল অর্থ কি? পীর এই শব্দের আসল ফার্সী শব্দ। যার মানে উস্তাদ বা শিক্ষক।

পীর অর্থ বাংলায় শিক্ষক, আরবীতে উস্তাদ বা উস্তাজ বা মুয়াল্লিম, ইংরেজীতে টিচার (Teacher)

(১)

Dhaka University Institutional Repository

র প্রয়োজন।

কোরআন হাদীছে কোরআনের পীর শব্দ নেই।
তবে পীর ধরা লাগবে কেন।
পীরেরা অজ্ঞান অর্থে মিথ্যা কিতাবের মন-গড়া-
পীরের অজ্ঞান অর্থে পীরের [illegible]
র প্রমাণ করেন দুই অর্থে পীরের [illegible]
[illegible] হয়, অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণ করেন-
না [illegible] [illegible] [illegible] মন-গড়া-
র [illegible] মন- দেখায় দেন।

৩

আসলে কোরআন হাদীছে কোরআন পীর
ধরা, কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু কোরআন-
ধরা, কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু কোরআন-
হাদীসে মন-আসে পড়ে অর্থ হয় পীর মন-
উপায় ধরা। এ [illegible] [illegible] হয় প্রমাণ
[illegible] [illegible] [illegible] আমি উল্লেখ করে
দুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং মুখ্য-ভাবে
[illegible] [illegible] [illegible] সমাধান [illegible]
[illegible] বিশ্লেষণ করেছি।
সমাধান হবে আশা করি।

(২)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

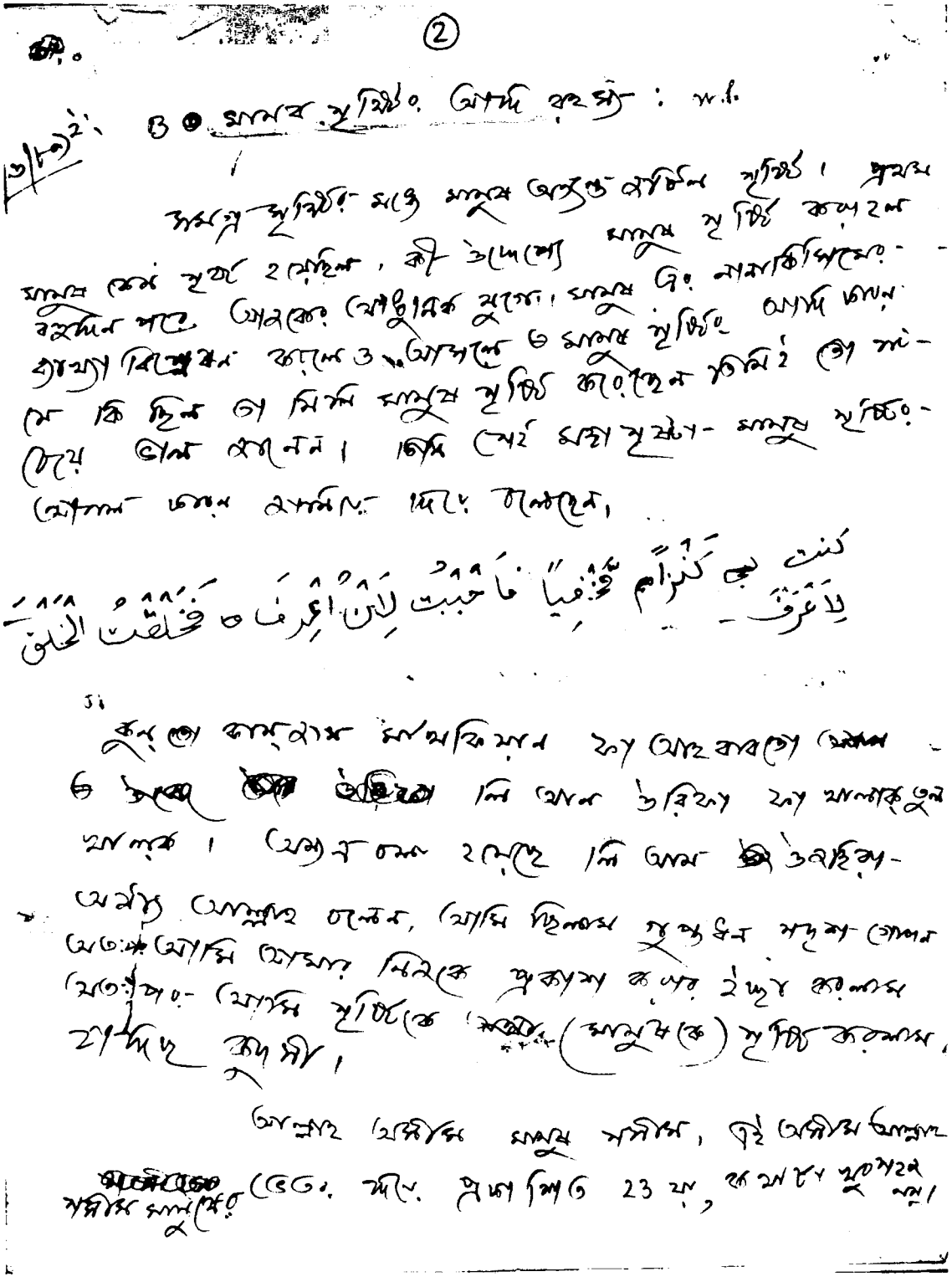

২২০

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) কে দেয়া হাফেজ্জী হুজুরের একটি চিঠি

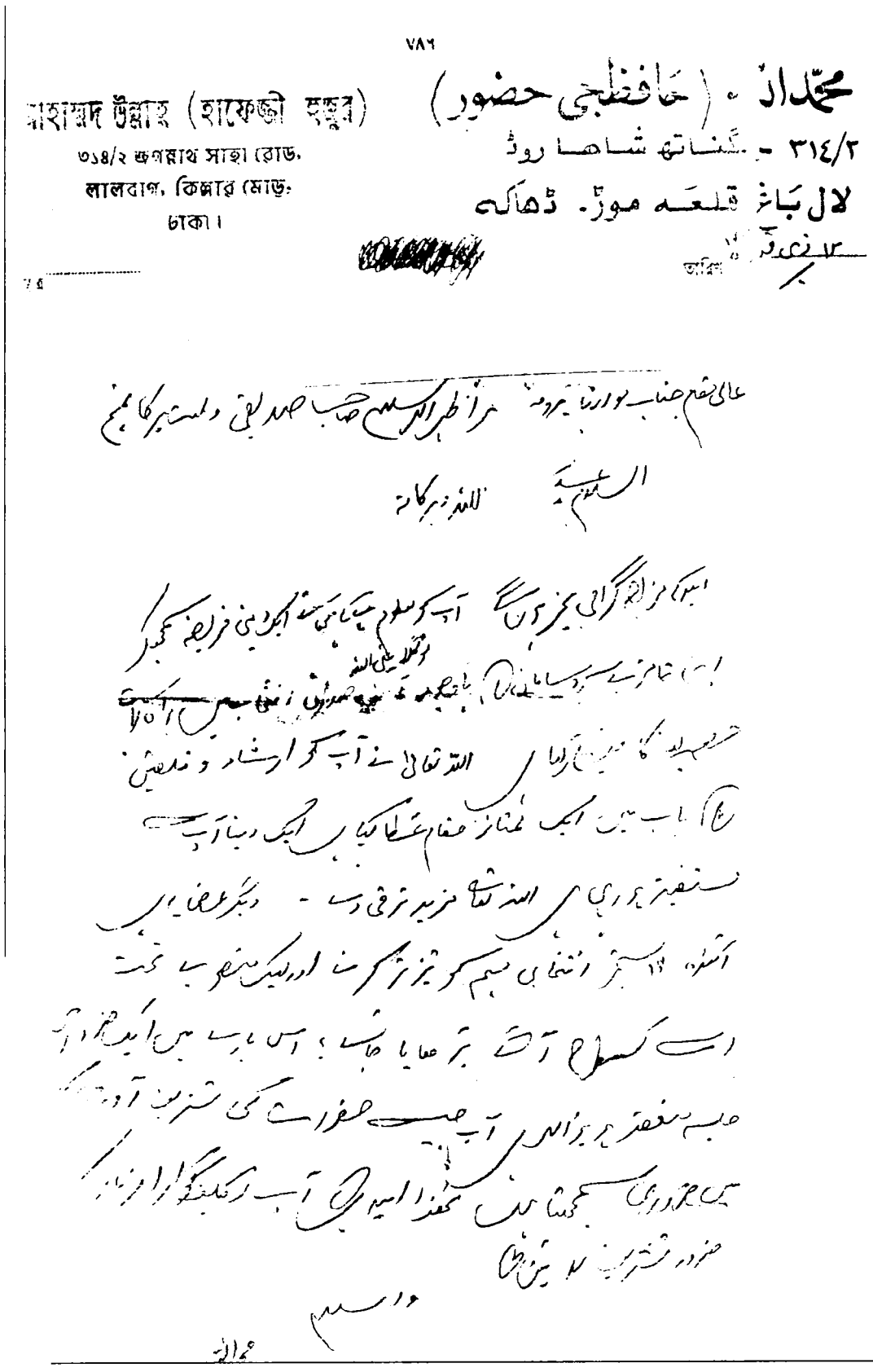

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) কে দেয়া হাফেজ্জী হুজুরের একটি চিঠির অনুবাদ

বরাবর,

জনাব মাওলানা প্রফেসর আযহারুল ইসলাম সাহেব সিদ্দিকী (দা:বা:)
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আশাকরি ভাল আছেন। আপনি জানেন যে, আমি ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে আমার সকল প্রকার বাহ্যিক সহায়-সম্বলহীনতা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহর উপরে ভরসা করে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সরাসরি অংশ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইরশাদ ও তালকীন তথা পীর-মুরিদীর পথে এক বিশেষ স্থান দান করেছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এক শ্রেণীর মানুষ আপনার দারা উপকৃত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এ লাইনে আরো উন্নতি দান করুন।

দ্বিতীয়ত, আমার আরয হচ্ছে নির্বাচনী প্রোগামকে কি করে একটি কর্মসূচীর মাধ্যমে বেগবন করা যায় এ মর্মে আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় আমি আপনার মত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। সুতরাং আশাকরি আপনি কষ্ট স্বীকার করে অবশ্যই তাশরীফ আনবেন।

ওয়াস সালাম
মুহাম্মাদুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) কর্তৃক লিখিত কিতাবসমূহের প্রচ্ছদ

(বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা)

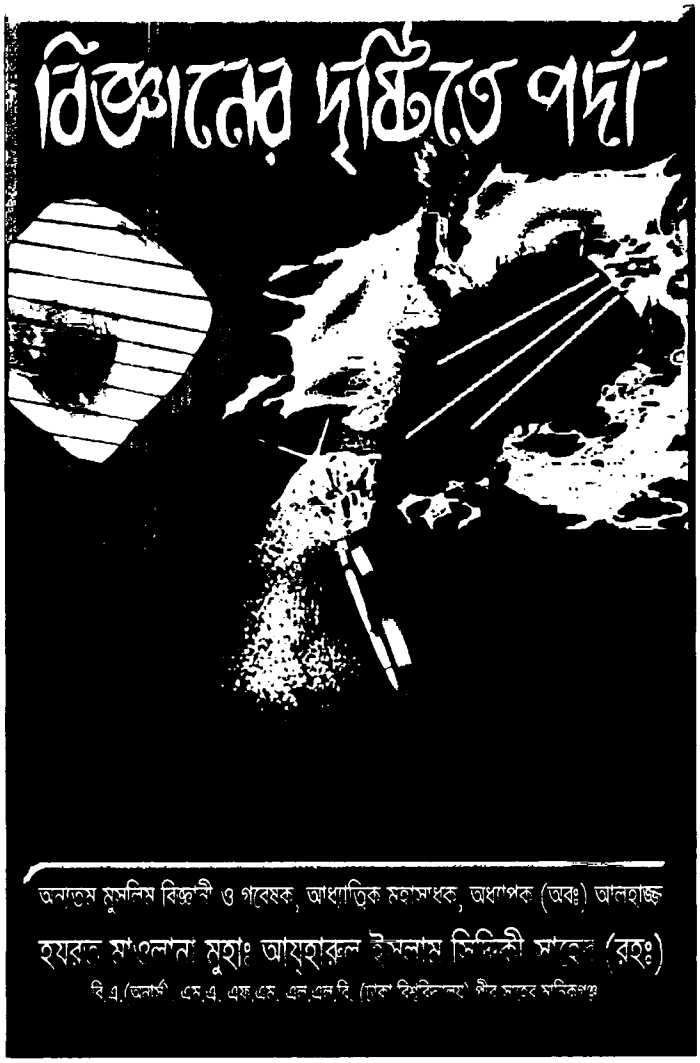

Dhaka University Institutional Repository

(তারানায়ে জান্নাত)

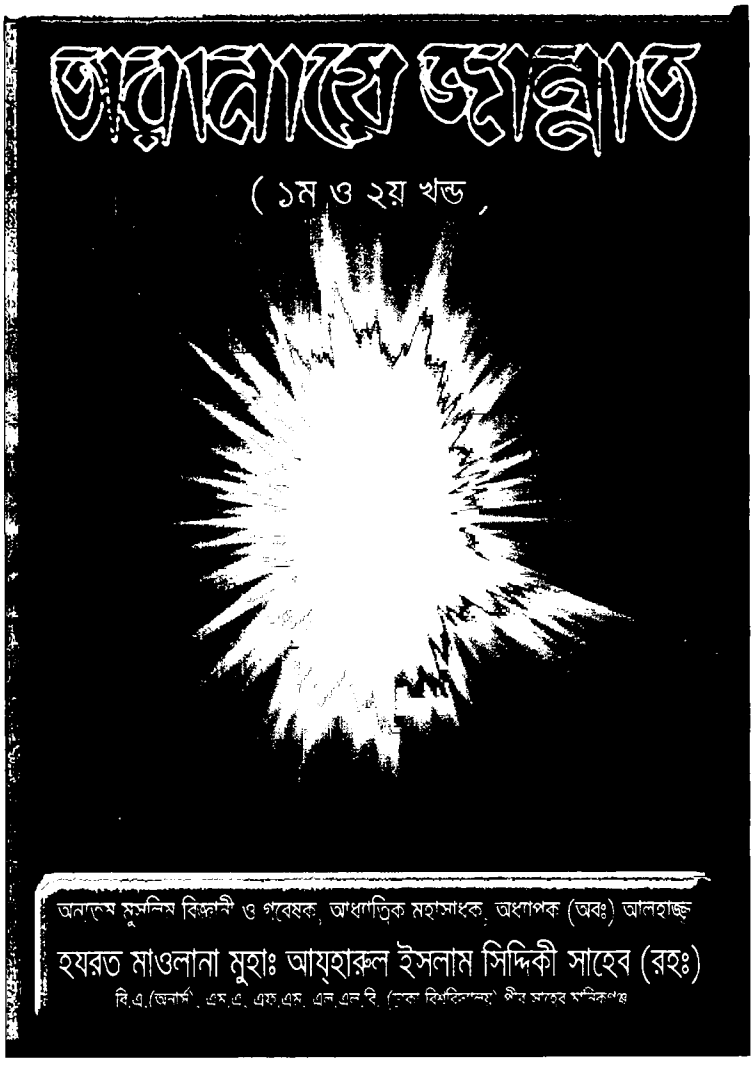

Dhaka University Institutional Repository

(মহাস্বপ্ন)

Dhaka University Institutional Repository

(জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব)

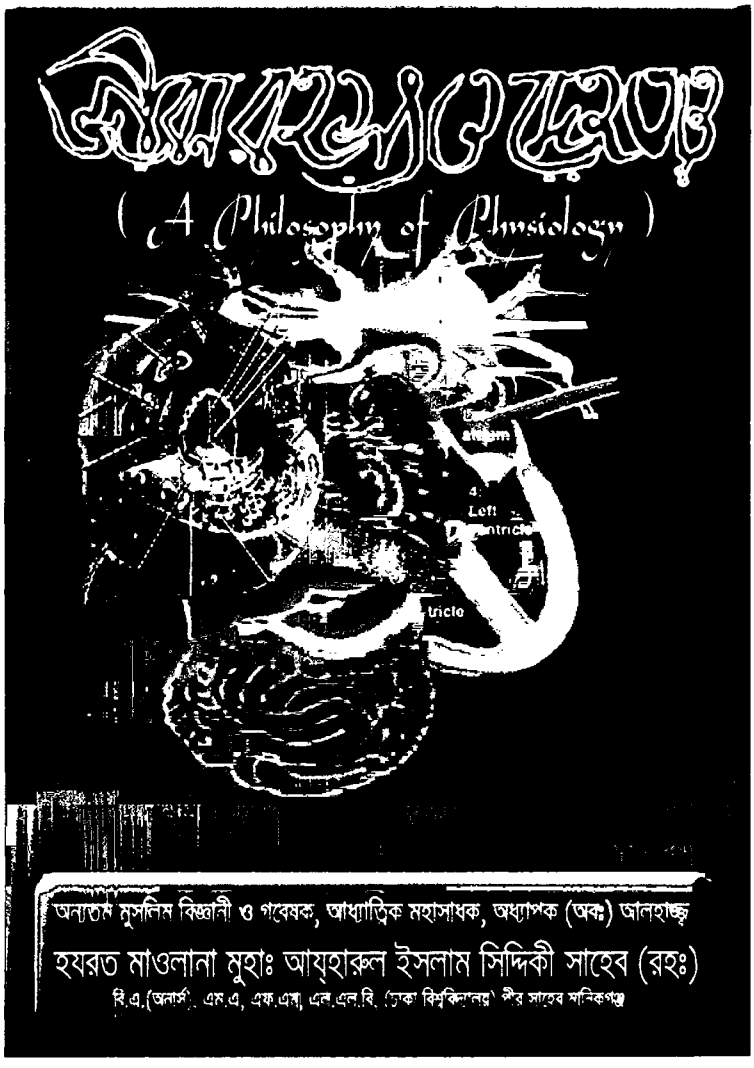

Dhaka University Institutional Repository

(মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব)

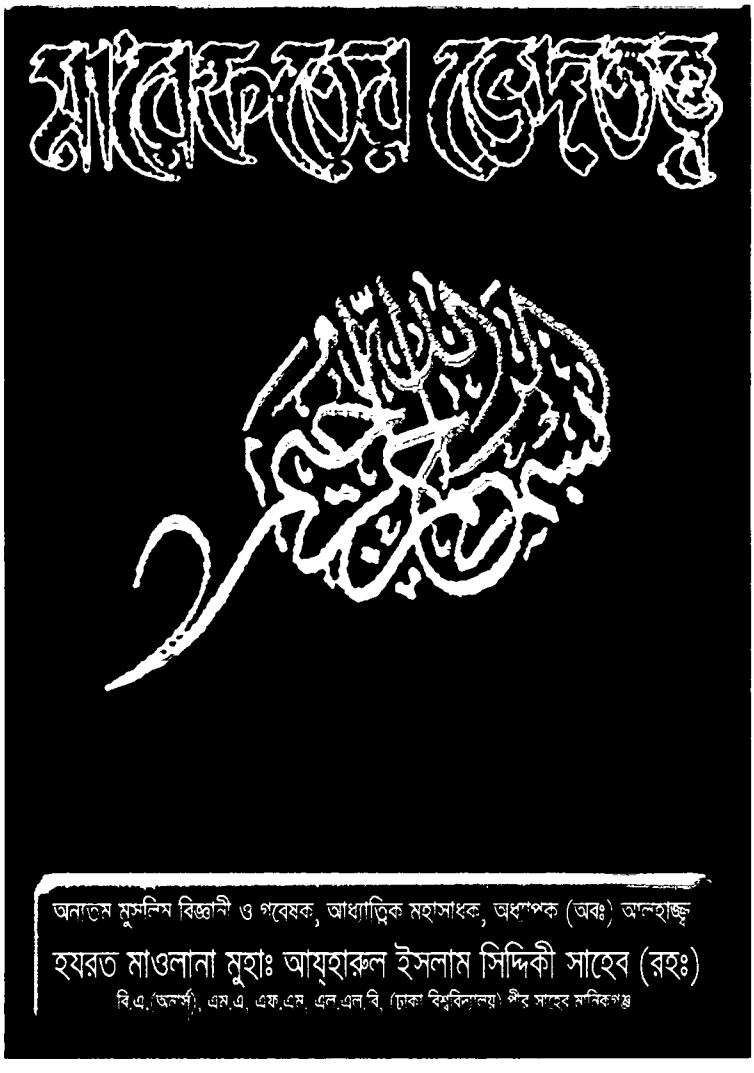

Dhaka University Institutional Repository

(ধুম পিপাসা সর্বনাশা)

Dhaka University Institutional Repository

(মহা ভাবনা)

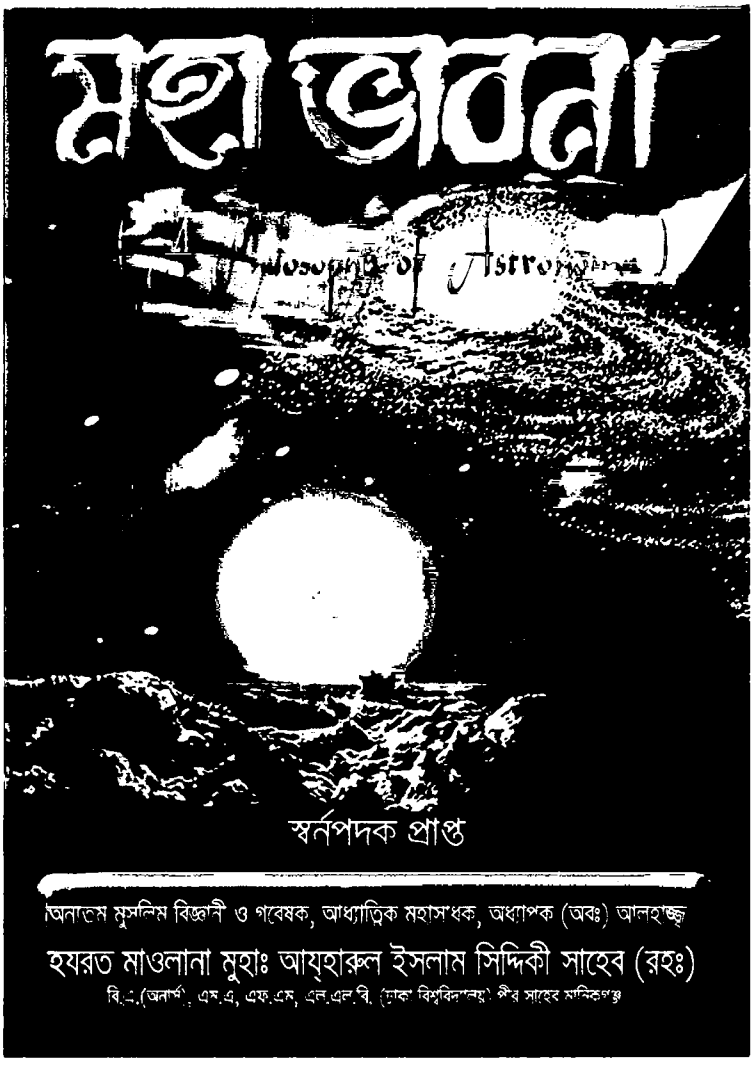

Dhaka University Institutional Repository

(পীর ধরার অকাট্য দলিল)

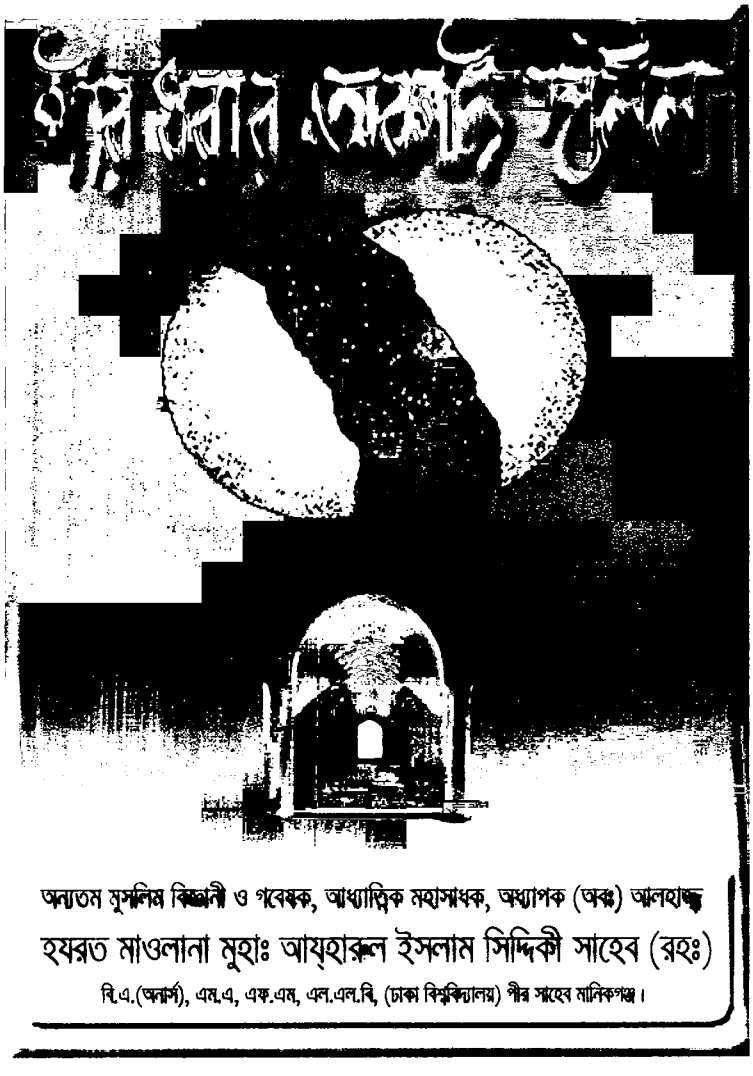

Dhaka University Institutional Repository

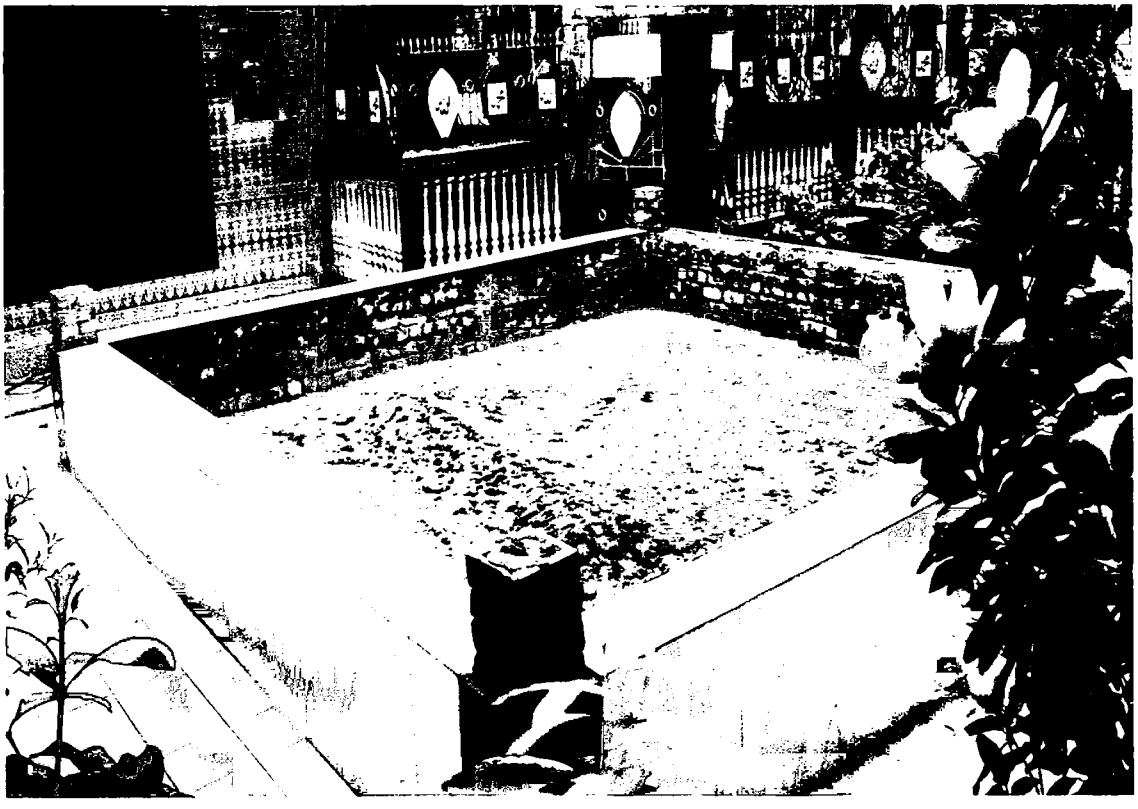

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.)-এর মাযার শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রহ.) এর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান

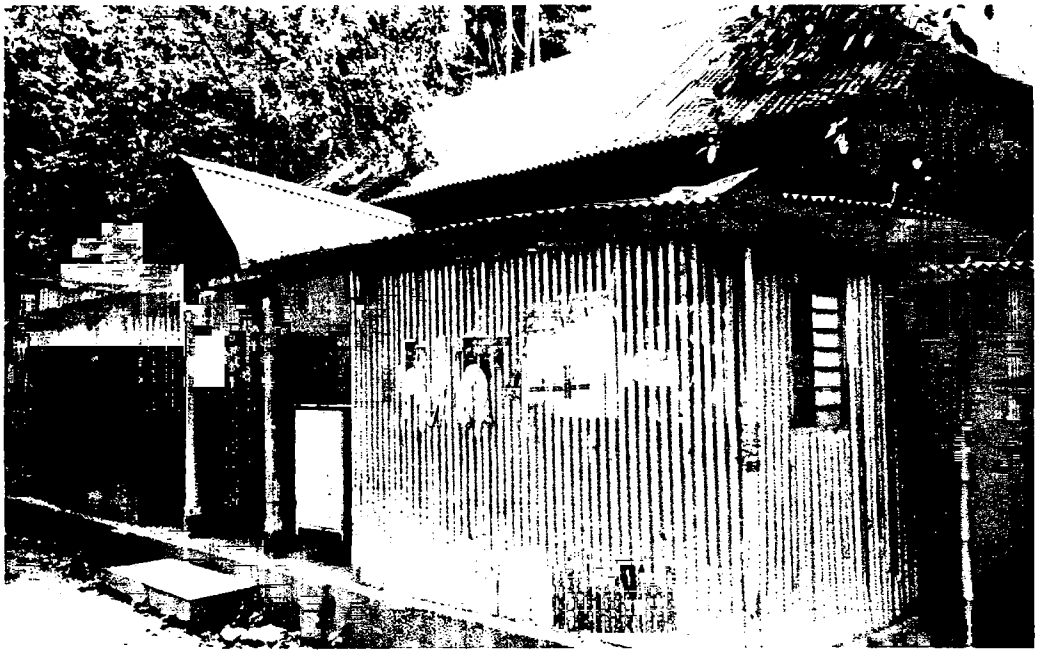

পুরাতন মাদ্রাসা ভবন

বর্তমান মাদ্রাসা ভবনের একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান মাদ্রাসা ভবনের সম্মুখের একাংশ

বর্তমান মাদ্রাসা ভবনের একাংশ (এর সামনের অংশে মসজিদ)

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের অভ্যন্তরীন অংশ